পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

(নব পর্য্যায়)

রাণী শ্রীনিরুপমা দেবী সম্পাদিত।

সহঃ সম্পাদক—শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

ষষ্ঠ বর্ষ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

১৩২৯ সনের জ্যৈষ্ঠ—কার্ত্তিক।

কোচবিহার।

কোচবিহার সাহিত্য-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

কোচবিহার ষ্টেট্ প্রেসে

শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা, বার আনা।

পরিচারিকা।

ষষ্ঠ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড।

১৩২৯ সনের জ্যৈষ্ঠ—কার্ত্তিক।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

—:০:—

বিষয়। লেখক ও লেখিকা। পত্রাঙ্ক।

পরিচারিকা—সূচী

বিষয়।	লেখক ও লেখিকা।	পত্রাঙ্ক।

(নব পর্য্যায়)

'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৬ষ্ঠ বর্ষ। , ১৩২৯ সাল। { ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

প্রসাধন।

—:•:—

দিয়েছ যে সুখ পরম মধুর

দিব প্রতিদান কিবা তার?

লেপেছি ললাটে চারু চন্দন

সে যে তব প্রেম-উপহার।

দিতেছ যে দুখ বেদনা-নিবিড়

তারো ছাড়িব না ব্যবহার,

আঁকিব আঁখিতে কালো কজ্জল

নব প্রসাধন-উপচার।

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

অবাক্।

—:*:—

(৬)

আরও একটু উঁকি ঝুঁকি দিয়া, গৃহের আসবাব-পত্রগুলা কে-কেমন সুশৃঙ্খল-বিশৃঙ্খল হইয়া আছে, সেদিকটার তদারকে হিসাবী-দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া বেগম যখন নিশ্চিত বুঝিল বাস্তবিক গৃহকর্ত্রীটির অনেক জিনিসই গৃহে নাই, তখন পরম নিশ্চিন্ত হইয়া, চট্‌ পট্‌ ঘরে ঢুকিয়া,—বিনা দ্বিধায় সোফিয়ার ঘুমন্ত শিশুর জামা সরাইয়া পাঁজরে হাত দিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিতে বসিল। কিন্তু পরক্ষণেই হঠাৎ পরম গম্ভীর হইয়া,—নিঝুঁম নিদ্রামগ্ন সোফিয়ার নিশ্চিন্ত নিদ্রাটার প্রতি লেশমাত্র করুণা না দেখাইয়া—সহসা এক থাবড়ায় তাহার মুখের রুমালটা উড়াইয়া দিয়া—সুগম্ভীর মুখে প্রশ্ন করিল "জীয়ন্ত না মরন্ত ?"

সোফিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "বাবা! এতক্ষণ ধরে হাসি চেপে রাখা,—এ কি আমার সয়! তুই কি নিঠুর বেগম ? আর একটু হলেই আমার দম আট্‌কে মেরে ফেলতিস্ আর কি ?—" আলু থালু চুলগুলা জড়াইতে জড়াইতে সোফিয়া উঠিয়া বসিল। সুনীতির দিকে চাহিয়া বলিল "বসো ভাই বসো। তোমাকে বেগমের! কবল থেকে উদ্ধার করে আনবার জন্যেই আমার এত দুর্গতি—বুঝ্‌লে ভাই! 'ভাল-মুখে' ডাক্‌লে তো ও পোড়ার-বাঁদরকে পাওয়া যেত না এখানে,—কাজেই............।"

বেগম অতিশয় গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিল "তুমি তা হলে পুরোদস্তুরই জীয়ন্ত আছ ?—"

নমস্কার করিয়া নিকটস্থ চেয়ারের উপর বসিয়া-পড়িয়া সুনীতি হাসমুখে বলিল "শুধু জীয়ন্ত কেন? পুরোপুরি জল-জীয়ন্ত হয়েই আছেন!—বলুন-না সোফিয়া-দি, যে তোকে শুদ্ধ জল-সই করে ফেল্‌তেই সুপ্রস্তুত হয়ে আছি!—

সুনীতির কাঁধে বেগম একটা ছোট খাট রকমের কুনুইয়ের ধাক্কা হানিয়া বলিল "তুই থাম থাম উনি। 'একে হুতাশন বিশ্বদাহক্ষম'—তুই আর "তাহাতে ইন্ধন তাহাতে বাতাস"টি

যোগাস নে ! এখুনি এমন আগুনটি জ্বলে উঠ্‌বে যে,—"ধাইয়া যাইয়া ছুঁইবে আকাশ !"—চুপ বল্‌ছি, আগে সোফিকে একটু ধম্‌কে নিতে দে ।"

বেগম আর একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া,—সোফিয়ার ঠিক সামনাসামনি স্থাপন করিয়া বেশ ভবাযুক্ত হইয়া বসিল। সুগম্ভীর মুখে বলিল "আচ্ছা নাননায়া ঠাকরুণ, আমায় ডাক্‌লি ডাক্‌লি,—ছেলেটার জ্বর হয়েছে বলে ডাক্‌লি কেন ? তোর বিকার হয়েছে বলে ডাক্‌তে পারিস্ নি?—একেবারেই খানিকটা Strychnine এনে মুখে গুঁজে দিয়ে ভব যন্ত্রণাটা তোর একদম মোচন করে দিতুম !—"

হাসিয়া সুনীতি বলিল "আহা হা ! কি করুণাময়ী দেবী গা !—দুনীয়া শুদ্ধ মানুষের ভব-যন্ত্রণার ব্যথায় উনি যে একেবারে মুমূর্ষু হয়ে উঠেছেন ! —তাই বেগম, তোর নিজের—"

এক ঠেলায় সুনীতিকে থামাইয়া বেগম সহসা অতি মাত্রায় ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আর শুনেছিস সোফি,—তোকে খবরটা বল্‌তেই ভুলে গেছি !—আমাদের 'ইয়ে'...... এবার মারা গেল হঠাৎ—।"

সোফিয়া ও সুনীতি দুজনেই একযোগে বিচলিত হইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল "কে কে ?"—

"ঐ যে রে'—কি নামটা তার ভুলে যাচ্ছি, সেই আমাদের সঙ্গে পড়ত, কি নাম···দাঁড়া দাঁড়া ভুলে যাচ্ছি।—নামের প্রথম অক্ষরটা কি দাঁড়া, দাঁড়া,—মনে পড়ছে না, হাঁ, হাঁ—সু···সু...হাঁ—সুনীতি রায় ! সুনীতি রায়ই বটে !—মনে আছে সোফি সে মেয়েটি কে ? আহা বেচারী বড্ড ভাল মানুষ ছল, আমি তাকে খুব ভাল বাসতুম ! আহা নিছক ভাল মানুষ। সেই জন্যেই বেচারী এত তাড়াতাড়ি অকালে মারা পড়্‌ল ! অতটা ভাল মানুষ না হলে, বেচারী দুনীয়ায় আরও কিছুদিন বোধহয় টিকে থাক্‌তে পার্‌ত !—"

ক্ষিপ্র কৌশলে, অম্লান বদনে, বেগম এমনি অবাধচ্ছন্দে কথাগুলি বলিয়া গেল যে সোফিয়ার সাধ্য কি ধরে,—তার মাঝে কোথায় কি কারচুপি রহিয়াছে ! কিন্তু সুনীতি বেচারীর মুখ লাল হইয়া উঠিল ! সলজ্জ ভাবে বেগমের পাশে কুনুইয়ের গুঁতা হানিয়া বলিল "যাও ! কি বাঁদ্‌রামো কর ! —"

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দারুণ-বিস্ময় ভরে বেগম বলিল "এর নাম বাঁদ্রামো ?—মানুষের মৃত্যু সংবাদ !—যে দুঃসংবাদ শুনে পথের পথিকও হা হুতাশ করে কেঁদে যায়, তুমি কি না সে খবর শুনে, বে-গুজর বলে দিলে বাঁদ্রামো ? তোদের হৃদয় হীনতা দেখে সত্যি আমার চোখে জল আসে ! উঃ, কি পাষণ্ড গো সব ! এদের দুঃখে দেখ্‌ছি,—কাঁদতে কাঁদতেই আমার সমস্ত জীবনটা কেটে যাবে,—নিজের দুঃখে কাঁদবার সময় আর কখনো পাচ্ছি নে, হা আল্লা !—"

বেগম চোখে কাপড় দিয়া রীতিমত কান্নার অভিনয় সুরু করিয়া দিল। সুনীতি ব্যঙ্গভরে হাসিয়া বলিল "আমি শুদ্ধু তোমার সঙ্গে শোকোচ্ছ্বাসে যোগ দিয়ে, এক ঝলক্ কেঁদে নেব না কি ?—"

অশ্রুজলহীন চোখ দুটা প্রাণপণে রগ্‌ড়াইয়া, যেন কতই হতাশ কাতর ভাবে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি তুলিয়া, বেগম উদাস ভাবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া অতিশয় করুণ কণ্ঠে আওড়াইল :—"যার ব্যথা সেই জানে, জানে না পরে !—...

"Her voice did quiver as we parted
Yet knew I not that heart was broken
From which it came, and I departed
Heeding not the words then spoken"

কপট কান্নার সুরে সুনীতি বলিল "আ মরি মরি, কি শোচনীয় মনস্তাপ ! পরবর্ত্তী দেড় লাইন অগত্যা আমিই শেষ করতে বাধ্য :—

"Misery—O Misery
This world is all to wide for thee."

আহা ! কবি Shelleyর জয় জয়কার হোক্ !—"

"উচ্ছন্ন যাক তোর জয় জয়কার ! আমার মুখের গ্রাস কবিতাটা কেড়ে নিয়ে ঐ যে মনের সুখে কপ্‌চালে......ওর পরিণাম টের পাবে সোণার চাঁদ এর পরে ! অদূর ভবিষ্যতের স্মরে—"

বিচলিত হইয়া সুনীতি বলিল "আঃ, বেগম—"

বেগম তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়া বলিল "এর বেলা 'আঃ, উঃ' করলে চল্‌বে কেন শুনি? এরি মধ্যে হয়েছে কি? এর পর সেই Life is dutyর অঙ্ক, গর্ভাঙ্কগুলির জন্য গোড়া সবুর কর, তারপর বুঝ্‌তে পার্‌বে সোণার চাঁদ! যখন প্রতি পদেই—"নাক ফোঁড়া বলদের মত টান পড় যে থেকে থেকে!"—

কথাটা শেষ করিয়া প্রত্যুত্তরের জন্য সুনীতিকে কিছুমাত্র অবকাশ না দিয়াই বেগম হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, সোফিয়ার দিকে চাহিয়া বলিল "তুই নিতান্তই হাঁদা গাধার মত যে রকম ভাবে হাঁ করে চেয়ে আছিস্, তাতে বড্ড রাগ হচ্ছে!—স্পষ্টই বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তোর মগজটা একদম আলকাৎরা-পোরা! কথাটা হচ্ছে কি জানিস? আমাদের সুনীতিটা আত্মঘাতী হয়ে মরেছে! তোর সামনে যে বসে আছে,—সে হচ্ছে তার নকল প্রেতাত্মা—মিসিস্ দুর্নীতি গুপ্তা, অর্থাৎ মিষ্টার গুপ্ত নামক এক ব্যক্তির স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত—একটা অন্তঃসার শূন্য, অপদার্থ মাত্র! অর্থাৎ, আরও স্পষ্ট করে বলছি, উনি এবার তোমাদেরই ক্ষুরে মাথা মুড়ুতে চলেছেন,—অর্থাৎ কি না বিয়ে কর্‌তে চলেছেন!"

দুই বান্ধবীর তর্ক দ্বন্দ্বের গোলকধাঁধায় পড়িয়া—সোফিয়া বেচারী এতক্ষণ বাস্তবিকই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়া ছিল! এবার রহস্যটা বুদ্ধিগম্য হইবামাত্র আনন্দে—উৎফুল্ল মুখে বলিল "বাবা, তাই ভাল! সুনীতির বিয়ে? থুয়ের! থয়ের!—আমি এতক্ষণ চক্‌চকিয়ে গেছলুম যে, আর কোনও সুনীতি বুঝি সত্যিই ছিল,—সে বেচারা বুঝি সত্যি...আচ্ছা বেগম, তোর মুখে মুখে এত কটু কাটব্য যোগায় কি করে?

"এই তোদের পাঁচজনের 'রকম-সকমের' কল্যাণে! বলি, দুলা ভাইয়ের আলমারির চাবিগুলা কোথা?—"

"কেন, একবার কেতাবের পিণ্ডি ঘাঁটতে হবে? দ্যাখ্‌ বেগম, অত অ'ছুয়েপনায় কাজ নেই!—কেতাব এর পর দেখিস, এখন আমায় একটু গান শোনা।" দাসী নিকটেই ছিল, সোফিয়া তাহাকে হার্ম্মোনিয়াম আনিতে আদেশ দিল।

দাসী বাজনা আনিয়া সামনে রাখিল। সোফিয়ার দিকে সেটা ঠেলিয়া দিয়া বেগম বলিল "তুমিই পয়লা নম্বরে সুরু কর,—'ওগো, এমন দুপুরে তুমি কোথা?—" দোস্‌রা নম্বরে

সুনীতি সুরু করবে "সখি সে কি তা জানে? আমি যে কাতরা তারি বিরহ বাণে—" আর তেসরা নম্বরে—"

সুনীতি মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া জবাব দিল তুমি সুরু করবে "ফুটবল সম হেন, সারা প্রাণ ধায় যেন, নিতান্ত অচেনা কোন চরণ পানে।—"

"ননসেন্স!"—টপাটপ্ বাজনার চাবি টিপিয়া বেলো করিয়া বেগম সোজসুজি গানের সুরে গা হয়া উঠিল "একান্ত আপত্তি, বোধ—করি ও গানে!"

হাসিয়া সুনীতি বলিল "শুনুন সোফিয়া-দি শুনুন। বেগমের দর্পচূর্ণ করবার জন্যে আসুন আমরা এবার আড়ে-হাতে লেগে যাই!—ওটা নিতান্তই দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠেছে!—"

সোফিয়া করুণ কণ্ঠে বলিল "সত্যি ভাই, ওর চিমটেনের জ্বালায় আমাদের আর ভদ্রস্থ নেই! আমার তো সময় সময় দেশ ছেড়েই যেন পালাতে ইচ্ছে করে! গিন্নি,—আমাদের গেরস্থালী-জীবন সম্বন্ধে এমন বক্তিমা পদে পদে ঝাড়েন—যেন উনি নিজে কতই দুশো পাঁচ শো বিয়ে করেছেন, আর কতই দু দশহাজার ছেলের মা হয়ে কত গিন্নিপনাই শিখে এসেছে!—আমি হেন মানুষকেও থেকে থেকে যেন থ' বানিয়ে দেয় বাপু!—"

সুনীতি মাথা নাড়িয়া হাসি মুখে বলিল কিছু নয় কিছু নয়! ঈশের মূল যোগাড় করুন, তা হলেই দশমূল সিদ্ধ হয়ে যাবে।"—

বেগম হাত মুখ নাড়িয়া ব্যঙ্গ সুরে বলিল "ওগো আমার সনাতন ঠানদিদি ঠাকুরুণ,—থামো না একটু!—হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্‌ব কি? তোমার বিয়ের প্রীতি উপহারের উপসংহারটা কি এইখানেই সোফির সামনে বাগেশ্রী সুরে প্রচার করে দেব?"

শঙ্কিত হইয়া সুনীতি বলিল "না ভাই না, ও সব কি অন্যায় ঠাট্টা! দেখুন দেখি সোফিয়া-দি, এ সব উপদ্রব আরম্ভ করলে,—"

শরণাগত রক্ষায় পরম উদার সোফিয়া, তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হইয়া ধমক দিয়া বলিল "যাঃ, বেগম, থাম! ও সব কি অসভ্যতা?

আহা-হা! ওঁরা যা কিছু করছেন, সবই ন্যায়সঙ্গত, সবই সভ্যতা সম্মত! আর বেগমের বেলায় সবই দোষ!—সবই অন্যায়, সবই অভদ্রতা!—সোফি, আর সুনীতি

ঠাকুরুণ, তোমাদের যুগলমূর্ত্তির অপূর্ব্ব সুন্দর বিচার শক্তির ক্ষুরে কোটী কোটী সালাম্ !—……তোমরা রোজ রোজ বিয়ে কর, দিন-দুবেলা বিয়ে কর, উচ্ছন্নে যাও, জাহান্নামে যাও, গোল্লায় যাও, নিপাত যাও,—আমি আর তোমাদের কিচ্ছুটি বল্‌ব না ! তা সে তোমরা মরো আর তরো !—এই জন্মের মত আড়ি !—"

চিবুকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ঠেকাইয়া বেগম সত্য সত্যই অভিমান ভরে আড়ি করিয়া দিল !—

সোফিয়া নিশ্চিন্ত মুখে বলিল "যাক্ বাঁচা গেল !—এবার নিশ্চিন্দি হয়ে একটু গান শোনা আমাদের……দ্যাখো, উঠ্‌বে যদি, তা হলে আলমারির চাবিটা পাওয়ার দফা—ঐ পর্য্যন্তই হবে !—"

কঠিন সমস্যা ! বেগম উঠিতে উদ্যত হইয়াছিল,—সোফিয়ার শাসন-তর্জ্জনে, একটু দমিয়া গিয়া—ইতস্তত: করিয়া আবার বসিল। সুনীতি মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে সুরু দিয়া অতিশয় কোমল ভাবে বলিল "আড়িটা সবাইকার সঙ্গেই কথা চলে, কিন্তু গান শোনাতে কাউকেই বাধা নেই।"

মুখ ভার করিয়া বেগম বলিল "একেই আমার মন বিগ্‌ড়ে গেছে, তার ওপর যদি এই রকম হাড় জ্বালানে টীকা টিপ্পনী চলে, তা হলে আলমারির চাবির লোভ ছেড়ে আমাকে মানে মানে বিদায় নিতে হবে।"

ব্যতিব্যস্ত হইয়া সোফিয়া বলিল "না না বেগম, রাগ করিস নি, লক্ষ্মিটি বস। ঐ টেবিলের ওপর চাবির রিং রয়েছে,—একটা গান—অন্ততঃ একটি গান গেয়ে তুই যত পারিস্ রাগ করে লাইব্রেরী ঘরে চলে যা। সুনীতি তারপর বসে বসে আমায় গান শোনাবে। আর আমরা তোকে কিছু বলব না।"

বেগম হার্ম্মোনিয়ামটা ঘুরাইয়া লইয়া দুজনের দিক হইতে মুখ আড়াল করিয়া বসিল। তারপর খানিকক্ষণ বাজনা বাজাইয়া সুর ঠিক করিয়া লইয়া গান সুরু করিল :—

"থাম্ না, এবার থাম্ না,
ওরে ও পিছনের টান।
থামা এবার ব্যর্থ ক্ষোভে
ওই অভিশাপ দান।"

সুনীতি মাঝখান হইতে বলিয়া উঠিল "গানটা অতিশয় আপত্তি-জনক। নিতান্ত যেন ব্যক্তিগত বলে ঠেকছে।—"

বেগম সে কথায় ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া নিজের মনেই গাহিয়া চলিল :—

"বাঁধ্‌তে কতই কর্‌লি তো ছল—
ছুট্‌লি পিছে—ফল্‌লো কি ফল ?
যতই ছুটিস্‌, মন সমানেই হয় যে আগুয়ান্‌।—"

সুনীতি বাধা দিয়া আবার বলিল "কিন্তু সকলেরই একটা শেষ সীমা আছে। পেছনে যারা তাড়া করে ছুটে আস্‌ছে তারা হয় তো একদিন চরম সীমায় পৌঁছেই নাগাল ধর্‌তে সক্ষম হবে।—কারণ চরমসীমার পর আর একগুঁয়ে ঝোঁকে সটান সোজা চল্‌বার পথ নাই, তখন বাধ্য হবেই round দিতে হবে, যে হেতু মাকড়্‌সার জাল পদার্থটি কতকগুলি বিচিত্র কোণ বিশিষ্ট হলেও, মানচিত্রে আঁকা, পৃথিবীর 'একপিঠের' মতই প্রায়—গো—লা—কার! কি বলুন সোফিয়া-দি ?"

সোফিয়া মনে মনে অবশ্য যথেষ্টই খুশী-বোধ করিল কিন্তু সাহস করিয়া, প্রকাশ্যে কোন পরিহাস করিতে পারিল না। কারণ সে নিশ্চয় জানিত, এ সময় বেগমকে খোঁচা দিয়া রাগাইলে, সোফিয়ার গান শুনিবার ঐ বড় সখের নেশাটা—'বেবাক্‌ বরবাদ্‌' হইয়া যাইবে! বেগম গানটা অসমাপ্ত রাখিয়াই অন্তর্হিত হইবে!—কাযেই শঙ্কিত চিত্তে ইতস্ততঃ করিয়া,—আড়ে আড়ে চাহিয়া, বেগমের অলক্ষ্যে চোখ টিপিয়া সুনীতিকে একটু সমর্থন-সূচক ইশারা জানাইল মাত্র।"

কিন্তু অলক্ষ্যের চেষ্টাটা, হঠাৎ বেগমের লক্ষ্য গোচর হইল!—উদাসভাবেই চোখ বুজিয়া,—সে নিঃশব্দে একটু উদাস হাস্য করিল। যেন, এই ছইটা বর্ব্বরের উপর সে যে রাগ করিয়াছে,—ইহাই যথেষ্ট অনুগ্রহ! অতঃপর, এ দু'টাকে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষার চক্ষে দেখে!

বাজনার উপর ঝুঁকিয়া নির্ব্বাকভাবে খানিকটা বাজাইয়া সুর ঠিক করিয়া লইয়া, বেগম আবার গাহিল :—

'বিষের বিষে রাঙিয়ে ছুরি
অথমে 'দলি বুক,
চম্‌কে লাগে,—দম্‌কা খুশী
ঝম্‌কে তোলে মুখ!

হাসন্ যত কুর্ণিশ শত
মূর্খ,—ওরে বুঝ্‌নি নাত
অসীম সুদূর টান্‌ছে যারে
বাঁধবে কে তার প্রাণ
মরণ ফাঁশির মাঝেই বসি, হাস্‌ছে যে তার প্রাণ।'

গান শেষ হইবামাত্রই বেগম তড়াক্ করিয়া উঠিয়া,—টেবিলের উপর হইতে চাবি তুলিয়া লইয়া,—কোন দিকে না চাহিয়া সটান্ পাশের ঘরে চলিয়া গেল। সুনীতির এবং সোফিয়ার দু'শো সরস-বিদ্রূপপূর্ণ সরোষ অভিযোগ, তাহার গমনপথে এতটুকুও বাধার সৃষ্টি করিতে পারিল না!

(৭)

লাইব্রেরী ঘরে ঢুকিয়া বেগম প্রথমেই বইভরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঁচের আলমারীগুলার কাছে গিয়া, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে বইগুলির নাম পড়িতে সুরু দিল। তার পর বাছিয়া খুঁজিয়া খান-বার-চৌদ্দ মনের মত বই বাহির করিয়া লইয়া আলমারি বন্ধ করিয়া দিল। সোফিয়ার দৈনিক হিসাবের খাতাখানা খুঁজিয়া তারই এক পাতায় ধার করা বইগুলির নাম লিখিয়া রাখিয়া যাইবার জন্য,—লাইব্রেরীর সেক্রেটোরয়েট্ টেবিলটির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু টেবিলটির উপরকার নথি পত্র আইনের বই, ইংরেজী বাংলা কবিতা ও উপন্যাস বইগুলি যে রকম হুড়ামুড়ি সূচক শৃঙ্খলার সহিত পরস্পরের ঘাড় চাপিয়া পড়িয়া আছে দেখিল,—তাহাতে বেগমের রাগও হইল, দুঃখও হইল!—এবং বোধকরি দুঃখের আতিশয্যে ঐ অকর্ম্মণ্য আড্ডাবাজ সোফিয়া-গৃহিনীর পিঠে ঘা কতক দিতেও ইচ্ছা হইল! অন্ততঃ পক্ষে সেইখানে দাঁড়াইয়া, পাড়াশুদ্ধ লোককে শুনাইয়া চীৎকার করিয়া সোফিয়ার গৃহিনীপণার উদ্দেশে গোটাকতক মধুর বচন শুনাইয়া দিবার ইচ্ছা হইল—অত্যন্তই!

কিন্তু গম্ভীর মেজাজে রাগ যখন করাই হইয়াছে তখন হাল্কা মেজাজে নামিয়া—অতটা হিতৈষীপণা দেখানো অতীব গর্হিত দুষ্কার্য্য !—কাযেই মনের দুঃখ মনেই রাখিতে হইল। নিজেই টেবিলটা গুছাইয়া ফেলিতে সুরু দিল।

টেবিল পরিষ্কার করিতে করিতে গৃহকর্ত্তার পুরাণো বন্ধুদের চিঠি হইতে আরম্ভ করিয়া নূতনতম মক্কেলদের পর্য্যন্ত রকমারি চিঠি গোছা গোছা আবিষ্কৃত হইয়া পড়িল। বেগম দু একখানা পোষ্টকার্ড উল্টাইয়া দেখিল, খামের চিঠিগুলা যেমন ছিল তেমনিই রাখিয়া দিল। খুলিয়া দেখিল না।

খুচরা কাগজ যে কত বাহির হইল, তার সংখ্যা নাই। কোনও মানাবর বন্ধু পাঁচ শত নম্বরের সিগারেট পাঁচ গ্রোস পাঠাইবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছেন, কোন বন্ধু দু হপ্তা পূর্ব্বের তারিখে একদা রাত্রি ভোজনের নিমন্ত্রণ জানাইয়াছেন, কোনও তৃতীয় পক্ষ এক টুকরা বালির কাগজে এক হপ্তা পূর্ব্বের তারিখে সংবাদ দাগিয়া দিয়াছেন তিনি সেদিন নাকি প্রাতঃকালে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন ; অতঃপর কোন দিন কোন সময়ে তিনি আসিলে মাননীয় উকীল মহাশয়ের শুভ দর্শন লাভ করিবেন, জানিতে ইচ্ছুক। ইত্যাদি ইত্যাদি।—

সেই সব বাছা বাছা অমূল্য তথ্যপূর্ণ কাগজগুলিতে একটা নীল সিল্কের ফিতায় বাঁধিয়া বেগম সাবধানে এক পাশে রাখিল। বাকী চিঠিগুলা যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিতে গিয়া দেখিল সেখানে খবরের কাগজ জড়ানো পিচ্‌বোর্ডের মত একটা বস্তু রহিয়াছে। কাগজটা টানিতেই একটা ফটোগ্রাফ ও একখানা চিঠি বাহির হইয়া পড়িল।

ছবিখানা তুলিয়া লইয়া বেগম দেখিল একটি তরুণ বয়স্ক পুরুষের মূর্ত্তি। গাম্ভীর্য্য ও মহত্বপূর্ণ, উন্নত ভাবব্যঞ্জক, সুশ্রী সুন্দর আকৃতি। কোন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, সন্দেহ নাই। কিন্তু লোকটির সশস্ত্র সুন্দর পরিচ্ছদ পারিপাট্যের বাহার দেখিয়া বেগম না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। দিব্য সৌখীন পম্পস্ পায়ে, তার উপর ফিন্ ফিনে কালাপাড় ধুতির লম্বা কোঁচার ফুল লুটাইয়া পড়িয়াছে, গায়ে খুব সৌখীন ধরণের লম্বা ঢিলা পাঞ্জাবী। তার উপর মূল্যবান কাশ্মিরী শাল, সুন্দর কায়দার সহিত আগুলফ-লম্বিত ধরণে ঝুলাইয়া, গায়ে জড়াইয়া,—ভদ্রলোক এক বনের ধারে একটা পাথরের ঢিবির

উপর বসিয়া মনের সুখে, তন্ময়-চিত্তের দৃষ্টিতে নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার বাঁ হাতের কব্জির আধখানা পর্য্যন্ত শালের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া নিতান্তই অনিচ্ছায় যেন একটুখানি মুখ বাড়াইয়া,—বাঁ কাঁধের উপর ধরা বন্দুকটার ভার বহন করিতেছে। ডান হাত মহাশয়টি ততখানি চক্ষুলজ্জা স্বীকারের প্রয়োজন যেন সম্পূর্ণই অগ্রাহ্য করিয়া নিতান্তই নির্ভীক ভাবে শালের আড়ালে নিশ্চিহ্ন রূপে গা-ঢাকা দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মুষ্টির আশ্রয় ধৃত একখানা কোষবদ্ধ কুক্রীর অগ্রভাগ শালের ফাঁক হইতে একটু-একটু দেখা যাইতেছে!—

ছবির নীচে পরিষ্কার বাংলা অক্ষরে লেখা রহিয়াছে:—"তোমাদের স্নেহের—ব্যবহারিক কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত,—নির্জ্জলা আইডিয়াল-মূর্ত্তি—"

বেগম কৌতুক-স্মিত মুখে, নিজ মনেই অস্ফুটস্বরে বলিল "এটা তা হলে কোনো ঠাট্টাবাজ বন্ধুর দুষ্টু কীর্ত্তি!—ভদ্দর লোকের চিঠিখানা তা হলে পড়তে হোল।—"

প্রসন্ন হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টিতে ফটোখানা আর একবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া, বেগম সেটা রাখিয়া দিল। চিঠির ভাঁজ খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল:—

Bankura.
14-10-1904.

My dear Bhaijee.

Don't be angry with me please—মাপ করো, সাদা বাংলায়ই লিখ্‌ছি,—রাগ কোর না। প্রসন্ন চিত্তে নিরপেক্ষ-বিচারকের দৃষ্টি নিয়ে ছবিখানার দিকে তাকাও।—বিচার কর্‌তো ভাই,—এই 'কেজো-মানুষের' সৌখীন সাজন-গোজনটা, নির্ব্বিঘ্নে ছবি তোলাবার পক্ষে যতই মনোজ্ঞ-সুন্দর হোক, কিন্তু জঙ্গলে ঢুকে বাঘ ভাল্লুক দলের বন্ধুদের সঙ্গে, কুক্রী বন্দুকের সাহায্যে দস্তুরমত তাল ঠোকাঠুকি কর্‌বার সময়,—এই সখের কুর্ত্তি-কোঁচা, লট্‌পটে শাল (যাঁরা কেজো মানুষের হাত পা গুলিকে কাযের পথে আগেই ঝট্‌পটে বাঁধার ধাক্কায়,—ধীর, স্থির, নিসাড় করে দিতে পরমপটু)—এঁদের, সোহাগ-সংলগ্নতা আমায় কোন পথে নিয়ে যাবে? আমায় কোন সাফল্যের পথ দেখাবে?—

দাঁড়াও, থাম! তোমার নিস্‌পিসে হাতখানা একটু সংযত কর; আমার কাণের দিকে ওকে নির্ব্বিচারে বাড়ার আগে,—বিচার করে আমায় একটু পরামর্শ দাও,—(কারণ, আইনজ্ঞ,—উকীল মানুষ তুমি ভাই!) এ অবস্থায় কোন পথে চল্‌ব? Backward না Forward?

হাঁ, বল্‌তে ভুলে যাচ্ছি। পদমর্য্যাদা-রক্ষক হচ্ছেন আবার, 'ননীর-গোপাল চেহারার' সৌখীন পম্পজুতো!—ওঁদের স্বভাব-ধর্ম্ম আশা করি তোমার কাছে অবিদিত নেই। যতক্ষণ মানুষ চলে মেজাজ,—কড়ভরত চালে পথ চল্‌বে, ওঁরা ততক্ষণই grateful মেজাজে তার পদমর্য্যাদা রক্ষা করবেন। কিন্তু হঠাৎ যদি পথে, কোনও নরখাদকের সামনে পড়,—এবং অকালে নরদেহটা ধ্বংস করতে অনিচ্ছুক হয়ে, একটু পাশ কাটাবার চেষ্টা দেখ,—এবং সে চেষ্টার পথে যদি—"বড় গাছ" "ছোট ফল" ওলা পগার-খানা, বা "লাল ফুল, ছোট পাতা" সমেত কাঁটাবনের ঝোপঝাড়, লাফ্ মেরে ডিঙিয়ে যাবার তাগিদ পড়ে,—তবে আত্ম-রক্ষার চেষ্টায় যে মুহূর্ত্তে সেই লাফ্‌টি ঝেড়েছো,—ওঁরাও তদ্দণ্ডে—বিনা বিচারে Without any word—একদম, পদচ্যুত! তখন যতই কেন—"ungrateful thing" বলে রোষ কষায়িত লোচনে ওঁদের দিকে সকরুণ দৃষ্টিপাত কর না কেন, ওঁদের নির্ব্বিকার ঔদাসীন্যের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।—

এখন, শক্ত কাযের পথে এগোবার পক্ষে এই সব সৌখীন সাজ সজ্জা কতখানি সাহায্যদায়ক একবার ভেবে চিন্তে জবাব দাও।—

মনে কোর না ভাইজী, তোমাদের কারুর ব্যক্তিগত চরিত্রের ওপর কটাক্ষপাত করেই আমি একথা বল্‌ছি, মোটেই তা মনে কোর না। তোমরা আমার ভবিষ্যৎকে আজ যে পথে চালাতে চাইছ, সে পথের আব্‌হাওয়ার গুণে, আমার মত অক্ষম শক্তি পথিকদের জীবনে যে কি উন্নতি লাভ, সুসম্ভব হয়ে ওঠে তারই একটা অসম্পূর্ণ নক্সা,—ফটোগ্রাফার বন্ধুটির সাহায্যে তোমার প্রণিধানযোগ্য করে পাঠাচ্ছি মাত্র। এ রকম বদ্‌খৎ ফ্যাশানের ছবি তুল্‌তে বন্ধুটির বিবেকে অবশ্য অত্যন্ত আঘাত লেগেছিল, কিন্তু আমি তাকে বিশেষ করেই বুঝিয়ে দিলুম যে বিবেকে আঘাত বা নিঃশেষে তার মুণ্ডপাত করা, বেশী বড় কথা নয়। কিন্তু আমার গুরুজন বিশেষের আদর্শানুযায়ী (idea আর বল্‌ছি নে!) খাঁটি

Practical man হতে গেলে আমার যেরূপ রূপান্তর প্রাপ্তি অনিবার্য্য,—সে রূপটাকে পূর্ব্বাহ্নে সমঝে নিয়ে, স্নায়ুগুলোকে একটু ধাতসহ করে নিতে দাও।—কারণ অনভ্যাসের ফোঁটা হঠাৎ একদিন কপালে চড়ে বস্‌লে, কপাল বেচারীর পক্ষে বিলক্ষণ বিপদের সম্ভাবনা! সংবাদ শুনে বন্ধুটি অত্যন্তই বিমর্ষ হয়ে গেলেন। অনেক তর্কবিতর্কের পর জানিয়ে দিলেন।—ছবিখানা আমি যেন সাধারণে প্রকাশ না করি। সেটা করলে, এ পৃথিবীর অনেকেই মানহানির দাবীতে আমার নামে নালিশ সুরু করবে। কারণ এ ছবিখানা আমার নিজের চেহারার,—একান্ত নিজস্ব ব্যঙ্গ-চিত্র মাত্র হলেও,—এর নাকি এমন একটা মারাত্মক রকমের, আধ্যাত্মিক ভাব আছে, যে তার সঙ্গে এ পৃথিবীর অনেকেরই নাকি, আভ্যান্তরিক-জীবন অর্থাৎ অপ্রকাশ্য জীবন ব্যাপারের বিশেষ সাদৃশ্য আছে! সুতরাং তাঁরা নিশ্চয়ই মনে করবেন যে আমি অশরীরি-প্রাণী হয়ে, হাওয়ায় উড়ে গিয়েই কোন গতিকে তাঁদের গোপন কাহিনী চুরি করে এনে বেদরদে নিজের নামে চালাচ্ছি! অতএব আমার সে বে-আদবির দণ্ডটা কি হতে পারে সে। তোমার কাছে বলাই বাহুল্য!

বন্ধুর খবর শুনে আমিও কম বিমর্ষ হলুম না, কিন্তু আশ্চর্য্য হলুম তার চেয়েও বেশী! যাই হোক্ বন্ধুর পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে শেষে সাজসজ্জার অনেক অংশকে ক্ষুণ্ণ করে, ছেঁটে বাদ দিয়ে এই অসম্পূর্ণ মূর্ত্তিতেই ছবি তোলা শেষ করলুম! আমার সব চেয়ে কষ্ট হচ্ছে Chattering-ape'র চমৎকার মুখসটি পরে শ্রীমুখমণ্ডলের বাহার খোলতাই করতে পেলুম না।

চিঠিটা বড্ডই বড় হয়ে চলছে, এবার এইখানেই ফুলষ্টপ।—শেষ কথা, তোমরা honest-man, তাড়াতাড়ি বিয়ে করে বেশ ভাল মানুষের মতই কায করেছ, কিন্তু আমি honest নই, wise তো এক দমই না,—সুতরাং ও ব্যাপারটায় আমি soon এর তরফেও নই এবং not at all এর জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধের দলেও নই। আপাততঃ দিন কতক সোয়াস্তির নিঃশ্বেস ফেলবার অবকাশ দাও কারণ আমার অনেকগুলি জরুরী কাজ আছে। ছেলেদের কুশল দিও। আমার ভাবী মহাশয়াকে সম্মানপূর্ণ প্রীতি-সম্ভাষণ জানিও। ইতি—

তোমার স্নেহের

মনু।"

সকৌতুকে আগ্রহোজ্জ্বল মুখে বেগম বেশ তন্ময় চিত্তেই নির্ভাবনায় চিঠিখানি পড়িয়া চলিয়াছিল, কিন্তু চিঠির শেষে লেখকের নাম স্বাক্ষর দেখিয়াই—হঠাৎ সে বিপুল বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল! একি!—ইনিই যে সোফিয়ার সেই দেবর! সোফিয়ার স্বামীর মাসতুতো ভাই! এই লোকটিকে লক্ষ্য করিয়াই না বেগমকে বিবাহে সম্মত করাইবার জন্যই সোফিয়া এত পীড়াপীড়ি করে?

বিস্ময়োদ্বেগের উত্তেজনায় বেগমের কপালের শিরাগুলা দপ্ দপ্ করিয়া উঠিল! কাণ দুটা গরম হইয়া গেল! ফটোখানা পুনশ্চ ভাল করিয়া দেখিবার ইচ্ছাটা গোপন-অন্তরে অজ্ঞাতেই অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল বটে,—কিন্তু সে ইচ্ছাটা নিজের কাছেই হঠাৎ এমন অস্বাভাবিক লজ্জাদায়ক ঠেকিল যে, ছবিখানার দিকে দ্বিতীয়বার চোখ ফিরাইতেও যেন বেগমের মাথা কাটা যাইতেছিল। ছবির দিকে সে এবার চাইলেই যেন ছবির মানুষটা এখনি সতর্ক সজাগ হইয়া—সচেতন মন বুদ্ধি বিশিষ্ট সজীব মানুষে পরিবর্তিত হইবে, এবং বেগম যেমন সকলের অজ্ঞাতে, কৌতূহল-ব্যগ্র দৃষ্টি লইয়া, তাহার দিকে গোপনে চাহিতে উদ্যত হইয়াছে, সেও যেন-বা তেমনি কৌতূহল-ব্যগ্র দৃষ্টি লইয়া, অকুতোভয়ে বেগমের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইবে!—ঠিক এমনিই একটা অদ্ভুত খেয়ালে বেগমের সমস্ত মন সহসা এমন উৎকণ্ঠা-অধীর হইয়া উঠিল যে সে কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া হঠাৎ—ছবিখানার সামনের দিক হইতে সরিয়া পড়িল। টেবিলের অন্য দিকে দাঁড়াইয়া অনাবশ্যক ব্যস্ততার সহিত,—সদ্যঃ গোছানো চিঠির গোছা টানিয়া লইয়া, অতি-ব্যস্ত ভাবে ওলট্ পালট্ করিয়া কি যেন কিসের অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

কিন্তু—বিধি বাদী! আবার তাই!—চিঠির গোছার ভিতর হইতে সেই সদ্যঃ পরিচিত হস্তাক্ষরে লেখা আর খান কতক চিঠি বাহির হইয়া পড়িল! বেগম অধীর হইয়া নিজের অজ্ঞাতেই অস্ফুটস্বরে বলিয়া ফেলিল "আঃ কি মুস্কিল!"

যেন সত্য সত্যই কে একজন, কি একটা কৌতুকের খাতিরেই তাহাকে বিশেষ রকম ব্যস্ত-বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে, ঠিক এমনিতরই তাহার ভাবখানা!—চিঠিগুলা যেন সত্য সত্যই কি একটা বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়াই তাহার সামনে হঠাৎ আবির্ভূত হইয়াছে এবং

নেহাৎ দুষ্টামীর মতলবেই যেন, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রঙ্গভরে হাসিতেছে! বেগমের কাণ দুটা উত্তরোত্তর গরম হইয়া উঠিতে লাগিল!—

অত্যন্ত দ্বিধাভরে খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া শেষে,—যেন চোখ বুজিয়া ছো মারিয়া চিঠি কয়খানা উঠাইয়া লইয়াই, জানালার কাছে একটা দেরাজের আড়ালে গিয়া বেগম লুকাইয়া বসিয়া পড়িল। এবং নিজের এই লুকাইয়া বসাটার সঙ্গে সঙ্গেই—হঠাৎ সে নিজের মধ্যেই নিজে আবার এক অভাবনীয় বিস্ময় ও লজ্জা বোধ করিল। এরূপ লুকোচুরির অভ্যাস তো তাহার জীবনে কস্মিন্‌ কালেও নাই!—হঠাৎ একি অর্থহীন অদ্ভুত খেয়াল তাহাকে পাইয়া বসিল? বেগম নিজের মধ্যে কোন সদুত্তর আবিষ্কার করিতে পারিল না। কিন্তু অপ্রত্যাশিত লজ্জা-বিপন্নতার সহিত হঠাৎ তাহার স্মরণ হইল, তাহাদের স্কুল জীবনের পরিচিত স্কুলের একটি ছোট মেয়ের কথা!—সে মেয়েটির পছন্দ শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল,—এবং স্কুল শুদ্ধ সমস্ত বড় মেয়ের দল খুঁজিয়া সে একদিন নাকি—কি ভাবিয়া কে জানে—বেগমকে দেখিয়া মনে মনে অতিশয় পছন্দ করিয়া ফেলে! তার পর হইতেই মেয়েটির ভিতরে কি ব্যাধি আবির্ভূত হইল কে জানে,—বেগমকে দেখিলেই সে লজ্জায় সারা হইয়া ছুটিয়া পলাইতে সুরু করিত। টেবিলের আড়ালে, বেঞ্চির পিছনে, নিদান পক্ষে—নিকটবর্ত্তিনী মেয়েটির পিছনেও ছুটিয়া গিয়া আত্ম-গোপন করিতে সে এমনি সুন্দর অভ্যস্ত হইয়া উঠিল, যে তাহার সেই অহৈতুকী লজ্জার তাড়ায় বেগম শুদ্ধ যথেষ্ট রকম অপ্রস্তুত বিব্রত হইয়া উঠিতে বাধ্য হইয়াছিল! সেই এক ফোঁটা ছোট্ট মেয়েটার কাণ্ড কারখানা দেখিয়া স্কুল শুদ্ধ মেয়েরা তাহাকে যা তা ঠাট্টা করিত,—বেগম নিজেও সময় সময় সে ঠাট্টায় মৃদুভাবে যোগ দিয়া, সেই খুদে মেয়েটার এক গুণ লজ্জাকে শত গুণে পরিণত করিতে ত্রুটি রাখিত না! কিন্তু তবু বেগমের মনে মনে বিস্ময় বোধ হইত যে,—মেয়েটার এই পছন্দ শক্তির সঙ্গে ওরূপ ভাবে আত্ম-গোপন চেষ্টাটার সম্পর্ক কি?

এখন নিজের এই অকস্মাৎ পরিবর্ত্তিত অবস্থা বিচার করিয়া বেগম সবিস্ময়ে মনে মনে বলিল—সেই অর্ব্বাচীন-প্রকৃতির খুদে মেয়েটার মতই বুঝি একটা নেহাৎ অর্ব্বাচীন মেয়ে আজ হঠাৎ বেগমের হৃদয় মধ্যে ত্রস্ত-ব্যাকুলতায় জাগিয়া উঠিয়াছে! সে মেয়েটা বড় দুষ্ট! তাহাকে উচ্চ-শিক্ষা-মার্জ্জিত,—বিজ্ঞ বেগমের বুদ্ধি লইয়া হয়তো এই মুহূর্ত্তেই এক ধমকে ঠাণ্ডা করিয়া

দেওয়া খুব সহজ, কিন্তু কে জানে কেন,—সে মেয়েটার কৌতুকময়ী চপলতা লীলা .....আজ বেগমের বড় স্নেহের দৃষ্টিতেই দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে! যেমন স্নেহভরে সে নিজের ছোট বোনটার বিচার বোধহীন দুষ্টামী-প্রতাপগুলা দেখিতে ভালবাসে, ঠিক তেমনিই একটা কোন অজ্ঞাত খুশীর নেশা তাহাকে আজ যেন নির্ব্বিচারেই আচ্ছন্ন আবিভূত করিয়া দিতে চাহিতেছে!—

ক্রমশঃ—

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

স্মৃতির দেশ।

সেখানে কনক-উষা শিশু সনে কথা কয়,
জননীর সুখ-আশা হাসি হয়ে ফুটে রয়,
সেথা হ'ল পরিচয় নয়নেতে নয়নে,
পথহারা প্রাণ মেশে কুসুমের শয়নে,
সে দেশের লাজ-রাঙা সঙ্কোচ মাধুরী,
অধরের আধ হাসি, নত আঁখি—আমরি!
বিদায়ের সে চাহনি, মুকুতার বৃষ্টি—
স্বপনের সোণালিতে বুঝি সব সৃষ্টি!
নাহি সেথা শীত নাই—শ্বেত-শির-বৃদ্ধ;
তরুণের নবীনের লাবনী সমৃদ্ধ।
চিরহাসি-মধুমাস, কি শরৎ গ্রীষ্ম
হাতে হাত ধরি চলে—অপরূপ দৃশ্য!

রবি শশী এক সাথ এক পথ যাত্রী ;
পলকেতে পূর্ণিমা, ঘোর অমারাত্রি।
বিষাদের সাহারাতে বসেরার খুস্‌গুল্
ফোটে সেথা ; আলো ছায়া এক সাথে মস্‌গুল্।
চঞ্চল কিশোরের উদ্দাম হরষে
কত তাজা ব্যথা সেথা কাঁটা হয়ে পরশে !
সাথীহীন প্রাণ আসি নিরালাতে এ দেশে
স্বরগের ঘর বাঁধে ক্ষণেকের আবেশে !

শ্রীঅনন্তকুমার সান্যাল।

দেশীয় রাজ্য।

——:o:——

(৩)

পুরাকালের রাম রাজত্ব রামচন্দ্রের সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়াছে। ঐতিহাসিক কালের রাজা অশোক চলিয়া গিয়াছেন, ভারতকুলকে শোকে ভাসাইয়া। তারপর হইতে ভারত বিদেশীর প্রবল প্রতাপের মধ্য দিয়াই প্রায় চলিয়াছে। কাজেই হিন্দুরাজগণের পক্ষে বিদেশী ভাব ও ভাষা, এমন কি পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত বিদেশী ধরণের হইয়াছে। সে রামের মত রাজা পাওয়ার আশা করিতে পারা যায় কি ? ভারতবর্ষকে হিন্দুরাজাদের হাতে সমর্পন করা এ সময়ে সুসময় উপস্থিত হইয়াছে কি ? ইহাই বিবেচ্য বিষয় বলিয়া মনে করি।

'চন্দ্র সূর্য্য বংশ অগৌরবে ভ্রমে,
লজ্জায় রাহুমুখে লীন।'

ইহা কবির বাক্য হইলেও এই বাক্য প্রাণে লাগিয়াছে শিশুকাল হইতে। অল্প সংখ্যক

অরত নরপতি ব্যতীত আমরা দেখিতে পাই, প্রায় সকলেই, রাজস্ব ছাড়িয়া রাজ্য শাসন করিতেছেন ; মন্ত্রী ছাড়িয়া বিদেশী ধরণের council দ্বারায় মন্ত্রণা পাইতে চান। নিজেরা আয়াস আরামে থাকেন। পুত্রসদৃশ প্রজাবৃন্দের উপর দৃষ্টি রাখা তাঁহাদের অবসর কোথায় ? এমন অবস্থায় ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়া তাঁহাদের উপর ভার সমর্পন করিতে যে আশা যাঁহারা পোষন করিতেছেন, সে আশা কখন এবং কোন সময় সফলতা লাভ করিবে তাহাও বিবেচনার বিষয়।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে আমি মহীশূরের মহারাজার বিবাহ উপলক্ষে রাজ অতিথিরূপে তথায় গিয়াছিলাম। সৌভাগ্যের বিষয় সে সময়ে আমি অনেক দেশীয় নৃপতিবৃন্দ এবং নৃপতিবৃন্দের প্রতিনিধিবর্গের সহিত মিলামিশা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। সে উপলক্ষে আমি কয়েকজন দেশীয় নৃপতির সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিয়াছিলাম এবং তাঁহাদের রাজ্যে অতিথী হইয়া গিয়াছিলাম। অবশ্য সে সময় ছিল এক যুগ, আর বর্ত্তমানে অন্য যুগ উপস্থিত হইয়াছে একথা সত্য, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষময় এক নূতন গোলযোগও উপস্থিত হইয়াছে। যাহা ভারত ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে স্বপ্নেও দেখে নাই। এক্ষণে Reformation লইয়া নানা দলে নানা কথা বলে। ইহা আধুনিক যুগের চিহ্ন বলিতে হইবে। এ বিষয় আচার্য্য Max Muller ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন।

'When I see a circus a man standing with outstretched legs on two or three horses, and two men standing on his shoulders, and other men standing on theirs, and a little child at the top of all, while the horses are running full gallop round the arena, I feel what I feel when watching the Goverment of India. One hardly dares to breathe, and one wishes one could persuade one's neighbours also to sit still and hold their breath. If ever there were an accident, the crush would be fearful, and who would suffer most ?'

ভাবার্থ,—আমি যখন সার্কাসে একটি লোককে দুটী মানুষকে ঘাড়ে লইয়া তিন চারিটি ঘোড়ার উপর পা ছড়াইয়া দাঁড়াইতে দেখি ও আরও কতকগুলি লোক তাহাদের ঘাড়ে

দাঁড়ায় এবং সর্ব্বোপরি একটি ছেলেকে কাঁধে লওয়া হয়, ঘোড়া পূর্ণবেগে গোলভাবে দৌড়াইতে থাকে, তাহা দেখিয়া আমার মনে যে ভাবের উদয় হয় ভারত গবর্ণমেণ্টকে মনোযোগের সহিত দেখিলে আমার মনে হয় তাহাই। সে অবাক কাণ্ড দেখিয়া নিঃশ্বাস লইতেও যেন সাহস হয় না, পার্শ্বের ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেও যেন বাধ বাধ ঠেকে, সোয়াস্তি নাই যেন তাহাতে। যদি কোন আকস্মিক বিপদ ঘটে,—সব চুরমার! কি ভয়াবহ ব্যাপার! কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ভোগান্তিটা হইবে কাহার বেশী?

উপরোক্ত বাক্যের সহিত বর্ত্তমান ভারতবর্ষের অবস্থা কতদূর মিলে তাহা সকলের বিবেচ্য বিষয়। তিনি অন্যত্র বলিতেছেন :—

'Some young Indian Rajahs while travelling in Switzerland, found themselves lately in the same railway carriage with some Russian Princes and noblemen. They had been discussing among themselves some of their grievances in English. And the Russians, who of course understood English, after listening to them for some time, became very communicative, and began to explain to them the beneficent rule of the Tsar. They even went so far as to hold out a hope to them of an Indian Parliament, as soon as the Russians were settled in Calcutta. On parting they asked the Indian Princes, "When shall we see you ot St. Petersburg?" And they were not a little taken aback when the strangers bowed and smiled, and said, "We are going just now to be present at the opening of Parliament in London. We should like very much to see St. Petersburg afterwards, and to be present at the opening of your Parliament there..."

ভাবার্থ,—কতকগুলি ভারতীয় রাজা সুইজারল্যাণ্ডে রেলে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের সহিত কতকগুলি রুষদেশীয় রাজকুমার ও সম্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা। ভারতীয় রাজাগণ কতকগুলি সুবিধা অসুবিধার কথা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতেছিলেন। ইংরাজীভাষা অভিজ্ঞ রুষিয়েরা তাঁহাদের কথা বার্ত্তা কিছুক্ষণ শোনার পর আলাপে যোগ দিয়া বলিল

'জারের শাসনপ্রণালী কত সুন্দর।' তাঁহারা এপর্য্যন্ত বলিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না যে তাঁরা কলিকাতায় পার্লামেণ্ট স্থাপন করিতে আশা রাখেন। বিদায়কালে রাজাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সেণ্টপিটারবার্গে আপনাদের সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে?" অদ্ভুত রকমের সেলাম ঠুকিয়া ভারতীয় রাজন্যবর্গ যখন উত্তর করিয়াছিলেন "এখন তো আমরা লণ্ডনে পার্লামেণ্ট খোলাটা দেখতে যাচ্ছি, তার পর সেণ্টপিটারবার্গে পার্লামেণ্ট খোলাটা দেখবার ইচ্ছাটা খুবই আছে,—সেই উদ্ঘাটন ব্যাপারে উপস্থিত হতে হবেই ত।"

বর্ত্তমান সময়ে দেশীয় নৃপতিবৃন্দ অনেকে Parliament of London দেখিয়াছেন এবং কেহ কেহ যোগ দিয়াছেন। রুষিয়ার কি অবস্থা হইয়াছে তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন। কাজেই দেশীয় নৃপতিগণ ইংরেজ রাজভক্ত হইবেন সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু দশ বৎসর মধ্যে ভারতবর্ষ Parliament পাইতে যে আশা অনেকে করিতেছেন, বোধ হয় তাঁহারা নিজ নিজ রাজ্যেতে কখনও Parliament দিবেন কিনা এ আশা সুদূরপরাহত। কারণ তাঁহাদের পিতা পিতামহ কি পৌরাণীককালে অথবা আধুনিককালে Parliament দ্বারা রাজ্য শাসন করিতে চান নাই এবং তাঁহারাও করিবেন না। তবে তাঁহারা সুশাসন করিতে পারিবেন এরূপ আশা করা যায়; যদি তাঁহাদের ভাব এবং স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয় এবং তদনুসারে তাঁহারা চলেন এবং চালিত হন। তাঁহাদের সুমন্ত্রীর দরকার। মন্ত্রণা সভার আবশ্যক হইলে সুমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারেই তাহা হইবে কিন্তু agitation দ্বারা কখনও হইবে না। Agitationএর পশ্চাতে যে সকল আপদ জঞ্জাল আছে এবং হয় তাহা তাঁহাদের বিলক্ষণ জানা আছে। একথা দেশীয় রাজ্যবাসী প্রজাবৃন্দ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে এবং বোধহয় তাহারা agitationরূপী বৃক্ষের ফল খাইতে প্রস্তুত নয়। মাঝে মাঝে কোন কোন রাজ্যে আনাস্তিকে agitation সম্বন্ধে যে কথা শোনা যায় প্রায় সকলই তাহা বিদেশের আমদানী। কিন্তু এ সকল এখনও বিক্রয় হইতেছে না, দেশীয় রাজ্যবাসীর নিকট বিদেশীর প্রতি সন্দেহ দোষে। দেশীয় রাজ্যবাসী বেশ আরামে বর্ত্তমান Moderate ও extremistদের দলাদলির তামাসা দেখিতেছে। হয়ত কোন কোন স্থানে সংক্রামক ব্যাধির বীজের মত রোগ উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু রাজ চিকিৎসক তাহার লক্ষণ বুঝে এবং তীক্ষ্ণ বীর্য্যবান ঔষধ দ্বারায় ব্যাধি নির্ম্মূল করিতে পারে।

প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যাইতেছে গত ২৩শে এপ্রিলের সংখ্যা 'Nation and Athenæum নামক পত্রে একজন Indian correspondence লিখিয়াছেন বর্ত্তমান সময়ে ভারত নৃপতিবৃন্দের অবস্থা কি ?

"The Chamber of Princes, one of the many stillborn children of Lord Chelmsford, attempted to give them a meeting-place where they could discuss matters affecting their class. The smaller rulers who had nothing to lose, repaired to it in shoals. Not so the larger fish. The Nizam for instance, with dominions as large as France and as populous as Egypt, does not want to hobnob with chieftains who may be far less powerful than his own vassals. The little Rajput chiefs alone are so numerous that they can outvote any combination that can be brought against them, and do outvote, since they are organized under an able leader, the Maharaja of Bikanir."

ইঁহারা যে আরামে আছেন একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইঁহারা যথেষ্ট সম্মান অর্জ্জন করিয়াছেন একথা সত্য। পূর্ব্বে যাহারা Political agent কর্ত্তৃক চালিত ও চলিতে হইত তাঁহারা এখানে প্রকৃত স্বাধীন হইয়াছেন। ঐ পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে যে 'The Political agent of to-day is a wilted and almost pathetic. They have orders to treat the Princes of India as if they were Princes and not "naughty boys." দেশীয় রাজ্যবাসী বলিয়া একথা আমাকে বিশ্বাস করিতে হইতেছে। পণ্ডিত ব্যক্তির কথা মানা উচিত এবং তাঁহারা দৃষ্টান্ত আমাদের—অনুকরণীয়। ভট্ট Maxmuller জার্ম্মেন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত Dukedom রাজ্যের অধিবাসী। তিনি Auld Lang Syne, first series, European বন্ধুবর্গের Recollection লিখিতে যাইয়া "Recollection of Royalities" পর্ব্বাধ্যায়ে তাঁহারই Dukeকে উপলক্ষ করিয়া প্রায় পর্ব্ব সমাপন করিয়াছেন। অন্যান্য Crown Headsদের সম্বন্ধে অধিক কিছু বলেন নাই। তাহার কারণ ঐ Dukedom ক্ষুদ্র ; এমন কি এক রাস্তা পার হইলেই তাঁহার Frontier পরিত্যাগ করা হয়।

একটী দুষ্ট লোককে Duke তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, কোন এক অপরাধের জন্য। ঐ দুষ্ট লোক রাস্তার অপর পারে গিয়া ভিন্ন রাজ্যে উপস্থিত হইয়া ঢেলা মারিতে মারিতে Duke এর রাজপ্রাসাদের দরজা জানালা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। Max Muller এমন ক্ষুদ্র রাজ্যবাসী হইয়াও গর্ব্ব করিতেন এবং Dukeকে তিনি পিতৃবৎ দেখিতেন। লিখক যদি ত্রিপুরা রাজ্য সম্বন্ধে কোন কথাবার্ত্তা অবতারণা করে তাহা হইলে পাঠকবর্গ বেজার হইবেন না। কারণ দৃষ্টান্তস্থলে আমাকে অন্য রাজ্যের কথা লইয়া আলোচনা করার সুবিধা হইবে না বলিয়া মনে করি।

বর্ত্তমান ত্রিপুর রাজ্য কালে সাম্রাজ্য তুল্য ছিল। ইরাবতী নদী হইতে পবিত্র গঙ্গাকূল পর্য্যন্ত ইহার সীমা ছিল। কালচক্রে ঐ রাজ্য এক্ষনে চতুঃ সহস্র বর্গ মাইলে পরিণত হইয়াছে। বাজীকর যেমন হস্তস্থিত তাসগুলিকে আকুঞ্চিত করিতে করিতে এত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র করেন যে পরে ফুঁ দিয়া তাহাও উড়াইয়া দেয়। ইহা অবশ্য অপ্রাসঙ্গিক কথা। কিন্তু ৺শম্ভুচন্দ্র মুখার্জ্জি মহাশয় অগাধ পণ্ডিত ছিলেন এবং উচু দরের সাহিত্যিক ছিলেন একথা বোধ হয় আজও অনেকে জানেন। যখন ত্রিপুরায় সর্ব্বপ্রথম Political agent নিযুক্ত হইলেন তখন Redtape ও Fullscape আপনা হইতে আসিয়া পৌঁছিল, ইংরেজী ধরণে। প্রাচীন বংশের যেমন গুণ আছে দোষও ততোধিক আছে এবং ইহাও স্বাভাবিক। Political লিখা পড়া করার জন্য বীরচন্দ্র শম্ভুবাবুকে আপনা হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং তিনি আসিয়াছিলেন ও নিজ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে তিনি কেন চলিয়া গেলেন তাহা পূর্ব্বে শম্ভুবাবুর পত্রে প্রকাশ হইয়াছে। কতকগুলি কারণের মধ্যে কয়েকটা ঘটনা দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতেছে। বীরচন্দ্র ছিলেন রক্ষণশীলবাদী অথচ উদারনীতির প্রতি অনুরাগী। কিন্তু নিজ রাজ্য সম্বন্ধে কোন কথা উপস্থিত হইলে তাঁহার মত যাহাতে রক্ষা হয় সেজন্য তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। শম্ভুবাবু বীরচন্দ্রের অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু Political agentএর সন্দিগ্ধ মূলক দৃষ্টির মধ্যে পড়িয়া গেলেন। ইতিপূর্ব্বে বীরচন্দ্র ঢাকায় যাইয়া Lord Northbrooke (Viceroy) সহিত State visit দিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য Return visit দিলেন না। বীরচন্দ্র ক্ষুদ্ধ হইলেন না কিন্তু সুবুদ্ধির ন্যায় হাসিতে লাগিলেন। তাঁহাকে Raja of Hill Tippera

নামে Viceroy নিমন্ত্রণ পত্রে অভিহিত করিলেন বটে, কিন্তু বীরচন্দ্র ইহার অর্থ বুঝিলেন না। দেশের এবং দশের কেহই 'Hill Tippera' এই Out landish নাম জানে না এবং বলে না। এমন কি ইংরেজী হইতে বাঙ্গালা তরজমা করিতে গিয়া Government Correspondence মধ্যে 'পার্ব্বত্য ত্রিপুরা' বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। তদানীন্তন Political agentকে তিনি ঐনামে বদনাম' করার অর্থ কি তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এই বিষয় লইয়া তিন পুরুষ যাবত দিস্তায় দিস্তায় কাগজ খরচ হইয়াছে। অনেক ঝগড়া ঝাটিও হইয়াছে। সুখের বিষয় বর্ত্তমান উদারনীতি পৃষ্ঠপোষক ঐ অলক্ষী নাম পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। এখনে সেই পৌরাণীক নামে Tripura নামে অভিহিত করিবার জন্য Gazetted করিয়া দিয়াছেন। তখন শম্ভুবাবুর সহিত সর্ব্ব প্রথম এ বিষয় লইয়া যে কেলেঙ্কারী হইয়াছিল, ঐ সব কাগজ পত্র দেখিলে ও শুনিলে যেন বালকগণের যুদ্ধের অভিনয় ন্যায় মনে হয়। "সোনা কয় 'আমি বড়' লৌহ কয় 'বিচার কর'" এ ভাবে কতকাল চলিয়া গেল। Return visit লইয়া উভয় পক্ষ তিন পুরুষ যাবত ঝগড়া করিয়াছিলেন। কিন্তু সুখের বিষয় উদার নৈতীক Government স্বইচ্ছায় তাহা পূরণ করিয়া দিয়াছেন। সহমরণ প্রথা পৌরাণিক কাল হইতে এ রাজ্যে ছিল ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। অবশ্য ইহা যে Barbarous প্রথা একথা বলিতে দ্বিধা বোধ করিনা। কিন্তু বীরচন্দ্র মানিক্য প্রজার কথা শুনিতেন এবং অনেক সময় মানিতেন। এ সতীদাহ প্রথা লইয়া যে ধরণের লিখা পড়া হইয়াছিল Government বীরচন্দ্রের সমস্তগুণকে ভুলিয়া গেলেন এবং এই দোষটাকে প্রবল দোষের মধ্যে গণ্য করিলেন। কাজেই বীরচন্দ্র মনে করিলেন 'সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল," তিনি আইন করিয়া ঐ প্রথা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। ভালই করিয়াছিলেন। এ বিষয় Bengal Adminitration Report 1888 প্রকাশ করিয়াছে।

"The Mahartja has in accordence with advice given to him, prohibited by a duly promulgated order, the practice of Suttee which formerly was permitted."

---

*সতীদাহ প্রথা বৃটীশ রাজ্য হইতে ১৮৩৫ খৃঃ অব্দের লর্ড বেন্টিক কর্ত্তৃক আইন দ্বারা নিবারিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে সতীদাহ নিবারিত হওয়ার ৫৪ বৎসর পরে ত্রিপুরা রাজ্য হইতে সতীদাহ প্রথা নিবারিত হইয়াছে।

মহাকাল সময়ে রাজা বীরচন্দ্রকে কবলে উঠাইয়া লইলেন এবং শম্ভুবাবুকে কালগ্রাসে সময়ে পতিত করিল। লিখক মনে করে উপরের লিখিত প্রথম ২টী ঘটনা লইয়া যেরূপ তমূল কাণ্ড হইয়াছিল; তখনকার দিনে কেবলই এই ধরণের লিখা পড়া চলিত। বীরচন্দ্র ইংরেজ রাজের যথার্থ ভক্ত ছিলেন যেমন অন্যান্য ভারত নৃপতিবৃন্দ ছিলেন ও আছেন। তিনি অনেক সময় সুহাস্য বদনে বলিতেন 'ইংলণ্ডের রাজা ভারতের সম্রাট। তিনি যেন মরাল পাখী, নিজ গর্ব্বে গর্ব্বীত এবং তাহার চলা ফিরাও তদ্রূপ। কিন্তু বেতনভোগী ইংরেজ কর্ম্মচারীবৃন্দ Viceroy ও Lt. Governor রাজহংস। ইহারা সর্ব্বদা উচ্চৈস্বরে শব্দ করে এবং Political Agentগণকে আমি পাতিহংস মনে করি। ইহারা কেবলই খাই খাই দাও দাও এবং 'কাদাখোঁচার' মত কাদা খাইতে ও মাখিতে সদা ব্যস্ত। ভারতের ভাগ্যে ব্রিটীশ মরাল আসিয়া আমাদের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য-গুলিকে রক্ষা করিয়াছেন নতুবা আমাকে হয় ত কালে ব্রহ্মদেশবাসী অথবা চীনা পুতুল হইয়া পড়িতে হইত।" এই উক্তি লিখকের স্মরণে আসিয়া এখনও মরমে প্রবেশ করিতেছে। বীরচন্দ্রের মত সর্ব্বগুণালঙ্কৃত এবং আশ্রিতবৎসল রাজা আমরা কি কখনও পাইতে পারিব? প্রচীন বংশে এরূপ হওয়া বিচিত্র হইবে না। কাশ্মীরের বৃদ্ধ মহারাজা এখনও বাঁচিয়া আছেন। তাঁহার প্রচারিত পুস্তিকায় তাঁহার দুর্দ্দিনের ঘটনাগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায় তিনি—সিংহাসন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া রক্ষা পান নাই। ৺নীলাম্বর মুখার্জ্জির আত্মীয় স্বজনের সহিত আমার বন্ধুতা ছিল। এক্ষণে তিনি স্বর্গে এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অনেকে তাঁহার গতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মুখে যা শুনিয়াছিলাম, গত দিল্লী দরবারের সময় তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার উপর যে সব Star ও Ribbon প্রভৃতি সম্মান বর্ষিত হইয়াছিল তাহাও দেখিয়াছিলাম। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাকে বহুল সম্মানে সম্মানিত এবং বহু ভাষায় তাঁহার গুণাবলীর মহিমা viceroy অন্যান্য কৃষ্ণ বিষ্ণু পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছেন, মহারজার অবস্থা দেখিয়া লিখকের যেন চক্ষু কর্ণের বিবাদ ঘুচিয়া গেল। দিল্লীর দরবারে দিন রাত্রে সম্রাট রাজ ভোজ দিয়াছিলেন। তাহাতে অনেক হিন্দু রাজা মহারাজা যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত যদি এই প্রাচীন হিন্দুরাজা পথে না দাঁড়াইতেন। এ বিষয়ে কোন কোন ঘটনা

লিখকের মনে আছে তাহা এখানে প্রকাশ করা দরকার দেখি না। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্যের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা বিদ্যমান আছে। তিনি মহারাজকে স্ব ইচ্ছায় দরবার বসার পূর্ব্বে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক মহারাজকে প্রাঙ্গনে লইয়া গেলেন এবং দীর্ঘকাল আলাপ করেন। রাজায় রাজায় কথাবার্ত্তা আমরা তাহার খবর কি জানি। সে দিন Government হইতে ত্রিপুরার নরপতিকে "পুরুষানুক্রমে" মহারাজা উপাধি দিয়া তিন পুরুষের কেলেঙ্কারী দূর করিয়া দিলেন। Lord Runalshoy উদার নীতিতে এ কার্য্য করিয়াছিলেন এ কথা আমাদের বলিতে ইচ্ছা করে। ১৮৭ খৃষ্টাব্দে বীরচন্দ্রকে ব্যক্তিগত ভাবে মহারাজা উপাধি দিয়া তদানীন্তন Government হয়ত মনে করিয়াছিলেন Obstinate বালককে (?) এই উপায়েই শান্ত রাখিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে উদারনীতি গভর্ণমেণ্ট সর্ব্ব বিষয়ে খোলাসা-বাদী তিনি কেন প্রেমে বাদ সাধিবেন ! সব আপদ ক্রমে ক্রমে ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের দরবার হইতে দূর হইতেছে এবং হইবে। এ জন্যই Nation and the Athenaeum পত্রে লিখিত হইয়াছে, 'The pride is not always personal. Though a model Ruller may feel that he represents his State and family and must uphold their honour and they must insist upon it.'

পুরাতন প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া আধুনিক প্রসঙ্গের কথা বলিতে ইচ্ছা করে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের অবস্থা ও তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা সময়োপযোগী কিনা ? Chembers of Princes (Narondra Mandal) নব প্রবর্ত্তিত রাজমণ্ডল বটে, কিন্তু সাবধানতার সহিত দেখিতে হইবে এ সময় নরেন্দ্রমণ্ডলের দ্বারায় আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে কিনা ? পক্ষান্তরে ভারতের নৃপতি মণ্ডলের মধ্যে ভারতবর্ষকে বিবচ্ছেদ করিয়া দেওয়া সুপরামর্শাধীন হইতে পারিবে কিনা তদ্বিষয়ে ভবিষ্যৎ প্রবন্ধে আলোচ্য।

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর

অপাত্রে।

-:*:

(কোন আত্মঘাতিনী বেশ্যার শব সন্দর্শনে।)

"ছুঁওনা, ছুঁওনা—ওটা বেশ্যার মড়া,
তাহে আত্মঘাতী—ওর পাপে তনু ভরা ;
সাদা হাতে লাগিবে হে কলঙ্কের ছাপ,
ছুঁওনা ছুঁওনা—ছিছি, মূর্ত্তিমতী পাপ।"

কিন্তু ও পতিতা তব করেছে তর্পণ
চিরদিন—সববস্ব করিয়া অর্পণ ;
তবু তার জন্মিল না হেন অধিকার,
পাইবে সে যার বলে শেষের সৎকার !

কি ফল লভিলি বল্, হায় রে অভাগি,
তুচ্ছ ধন বিনিময়ে সকল তেয়াগি ?
কাচসম চিরকাল কাঞ্চন ছড়ালি ;
কাঞ্চন বলিয়া কাচখণ্ড যে কুড়ালি।

না পাইল মার্জ্জনা যে নরের বিচারে,
মহাবিচারক কি গো ক্ষমিবেন তারে ?

শ্রীদ্বিজচরণ মিত্র।

তটিনী

(১৫)

অতুল আসিয়াছিল। মহেশ্বরী সেদিন মায়াদের বাড়ীতেই সমস্ত দুইপ্রহরটা কাটাইয়া পড়ন্ত বেলায় বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, তটিনী সন্ধ্যার রান্নার জন্য তরকারীর ব্যবস্থার একখানি বড় বঁটি পাতিয়া বসিয়া ঠাকুরকে রান্নার উপদেশ দিতেছে। প্রসন্নমুখে মহেশ্বরী বলিলেন "এই যে তিনু আমাদের দিব্যি গোছালো হয়েছে! তোর বাবা কোথা রে তিনু?"

"ওপরে আছেন; অমুলদাকে ডেকে না পেয়ে রাগ ক'রছিলেন বড্ড।"

"তাই নাকি? সে গেল কোথায়? ডেকে না পেলে তো রাগ ক'রবেই, তুই একটু ব'স তিনু, আমি যাই গোটাকতক কথা আছে আমার তোর বাবার সঙ্গে।"

তটিনী হাসিয়া ফেলিল বলিল "তা যাও না, আমাকে সাবধান ক'রে দিয়ে যাচ্চো নাকি? আমি এখানেই আছি।"

মহেশ্বরী সে কথার কোনো জবাব না দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। তারিণীবাবু তার ঘরে অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় ধূমপান করিতেছিলেন মহেশ্বরীকে দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য ভাবে চোখ তুলিয়া চাহিলেন। মহেশ্বরী বলিলেন "তুমি অতুলকে ডাকছিলে বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"কোনো বিশেষ দরকার ছিল?"

"হ্যাঁ ছিল, একটু দরকার। সে এসেচে নাকি?"

"না, আসে নি বোধ হয়। আমি জমিদারদের বাড়ী থেকে আসচি। তাঁরা আমাকে অনেক ক'রে বলে দিয়েছেন, তোমাকে ব'লতে, তাই আমি সোজা ওপরে উঠে এসেছি,—বলি, তুমি আবার বেড়াতে বেরিয়ে যাবে, বল্‌বার সময় পাবো না।"

"কি এমন কথা। অতুলের বিয়ের জন্য নয় তো!"

"তাই। তুমি জানলে কেমন ক'রে ? ওরা বুঝি তোমাকেও ব'লেছিল ?"

"না বলেনি, তবে অন্য লোক দিয়ে বলিয়েছিল। ও সব বাজে কথায় আমি কান দিই নে।"

মহেশ্বরী স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। তারিণী কি ভাবিয়া বলিলেন "তোমার কি ছেলের বিয়ে দিতে ভারী ইচ্ছে হয়েছে নাকি ?"

মহেশ্বরী যেন একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন "না,—তা ত নয়। তবে এমন সুবিধে মত সম্বন্ধ কি আর অতুলের জুটবে কখনো ?"

"কিন্তু বিয়ে টিয়ের গোলমাল এবাড়ী থেকে হবে না। ওঁরা অতুলকে ক'লকাতায় নিয়ে যান সেখান থেকে বিয়ে দিয়ে অতুলকে ওইখানে ওঁদের বাড়ীতেই রাখুন, বা যা খুসী করুন তাতে আমার কোনো আপত্তি হবে না !"

"ওমা ! সেকি কথা ? তোমাকে বাদ দিয়ে হবে সব ? তা কি হয় ? তা হ'লে তোমার মত নেই, সেই কথাই ওদের ব'লবো এখন !"

"মিছি মিছি...কথা ওল্টাবে কেন ? আমি যা ব'লছি, তাই তাঁদের ব'ল গে ! কিন্তু আমি তো দেখ্‌ছি তোমারই গরজ বেশী !"

মহেশ্বরী রাগিয়া বলিলেন "হাঁা, আমারই পুত্রদায় হ'য়েছে কি না ? তাই আমি তাদের পায় ধ'রতে গিয়েছিলাম আর কি ?

তারিণী বাবু তামাকের নলটি নামাইয়া রাখিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন "তা যাই বল বিয়ে এ বাড়ীতে হবে টবে না। তবে আমি আরও একটু ভেবে দেখি দাঁড়াও। তুমি অতুল বা তিনুকে কোন কথা বলো না, সাবধান !"

"না, না, তা ব'লতে যাব কেন ? আমি তো ওই জন্যে তিনুর সুমুখে কথা তুল্‌তে পারলাম না,—তা হ'লে দেখ ভেবে যা হয় !"

"হ্যাঁ;...দেখি বিবেচনা ক'রে। অতুল বেরিয়ে ফিরলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। এমন অসময় সে কোথায় বেরিয়েছে যে ডেকে পাওয়া যায় না ! কি বাঁদ্‌রামী এ সব !"

মহেশ্বরী আর দু'একটা কথা বলিয়া নামিয়া আসিলেন। তটিনী তখনো আলুর খোসা ছাড়াইতেছিল। অতুল কাছে দাঁড়াইয়া পোষা কুকুরের গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিতেছিল। মহেশ্বরী তাকে দেখিয়াই বলিলেন "হ্যাঁরে তুই কোথায় ছিলি এতক্ষণ! তারিণী কখন্ থেকে ডাক্‌ছেন!"

দু' চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া অতুল বলিল "ডাক্‌ছেন, আমাকে? আমাকে কেন মা?"

কেন তা আমি কি জানি। রাগ ক'রছে এখন,—যা, যা, শীগ্‌গীর শুনে আয় কি ব'ল্‌ছে।"

"এখন? না মা এখন যাবো না, রেগে আছেন একটু রাগ পড়ুক আগে,—তার পর যাব।"

তটিনী হাসিমুখে বলিল "শুনেই কেন এস না, রাগ করেছেন করেছেন তা ব'লে তোমাকে ধ'রে খেয়ে ফেলবেন না তো!"

"বাপ্‌রে! অত সাহস আমার নেই।"

বলিয়া অতুল নিজের পড়িবার ঘরে গিয়া বসিয়া পড়িল। তার ইচ্ছা ছিল,—বাড়ীতে জলযোগটা সারিয়া আবার সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইবে। কিন্তু গ্রহদোষে সেদিন আর তা ঘটিয়া উঠিল না। টেবিল ল্যাম্পের কাছে ঘাড় হেঁট করিয়া সে একখানা ইংরাজি মাসিক-পত্রের ছোট গল্পে মন দিয়াছিল। ঘণ্টাখানেক পরে তারিণীবাবু নিজেই ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। একটা খালি চেয়ার টানিয়া তিনি অতুলের পাশেই বসিয়া পড়িলেন।

চেয়ার টানা শব্দ শুনিয়াই সন্ত্রস্ত ভাবে অতুল উঠিয়া দাঁড়াইল। তারিণী গম্ভীর মুখে তাকে বসিতে বলিয়া বলিলেন "আমি অনেকক্ষই থেকে তোমাকে ডাক্‌ছি, তুমি বেরিয়ে গিয়েছিলে।"

মুখ নত করিয়া অতুল বলিল "হ্যাঁ, আপনার কোনো কাজ আছে তা আমি তো জান্‌তাম না।"

"না, কাজ তো বিশেষ কিছু নেই। তা, হ্যাঁ—একটা কথা, তুমি বারীনকে চেনো? সে নাকি তোমার বন্ধু শুনেছিলাম।"

"হ্যাঁ,—চিনি।"

"সে এখন কি করে জানো ?"

"সে তো ডাক্তার,—মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েছে—"

"আঃ ! তাতো আমিও জানি ছাই ! সে কি রকম উপার্জ্জন করে তা জানো কি ? আমি তাই জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

"ভালই করে বোধ হয়। তবে ঠিক জানিনে অনেক দিন সে তার কোনো খোঁজ খবর আমাদের কাউকে দ্যায়না, শুনেচি সে নাকি এখন মেসোপটেমিয়া আছে।"

"হুঁ !"

"যদি কোনো দরকার থাকে তাহলে চেষ্টা করে তার খোঁজ পাওয়া যেতে পারে।"

"না অত করবার দরকার নেই। অনেক গুলি টাকা তার বাপের ধার ছিল চট্‌পট্‌ সে শোধ করছে, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম সে কি করে।"

মহেশ্বরী তাঁর জপের মালা হাতে করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন "কই, অতুল আবার গেল কোথায় তিনু—জল খেয়ে গেল না ?"

তটিনী বলিল "ঐতো খাবার পড়ে আছে, সে যে দাঁড়ালনা। নিজের ঘরেই আছে বোধ হয়।"

"তা হলে খাবারটা তার ঘরে দিয়ে এলেই তো হয় ! আমার আবার হাতে মালা রয়েছে যে !"

"আমিই দিয়ে আস্‌চি !"

বলিয়া একহাতে খাবারের রেকাব ও অন্য হাতে জলের গেলাস তুলিয়া লইয়া তটিনী অতুলের ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে সেই ঘরে তারিণী বাবুকে দেখিয়া মুহূর্ত্তমাত্র সবিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। দু একটী মাত্র কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিল যে তার পিতা বারীনের সম্বন্ধেই কোনো কথা বলিতেছিলেন। তাঁর মুখ গম্ভীর হাস্যবর্জ্জিত।

তটিনী ঘরে ঢুকিলে তারিণী বাবু দু চারটী কথা বলিয়া বাইরের ঘরে চলিয়া গেলেন। অতুল হাসিয়া বলিল "উনি হঠাৎ বারীনের কথা তুলবার জন্যে যে আমাকে তলব করবেন আর আমি কি ক'রে জান্‌বো, তুমি বলতে পারো তিনু, যে বারীনের কথা ওঁর কেন মনে পড়লো ?"

"তুমি খাবার খাও দাদা,—ও আর এমন কিছু আশ্চর্য্য কাণ্ড নয়!"

কণ্ঠস্বরে বেশ জোর দিয়া অতুল বলিল "তা আশ্চর্য্য বই কি! তার মত কাঙাল গরীবকে যে এই বড়লোকের বাড়ীতে কেউ চিন্‌বে তা কি আশা করা যায়?"

জলভরা থমথমে মেঘের মত মুহূর্ত্তকাল মাত্র দাঁড়াইয়া তার পর প্রাণপণে ঘাড় নামাইয়া তটিনী সে ঘর ছাড়িয়া গেল। অতুল আশ্চর্য্য ভাবে বলিল "কি হল তিনু?"

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বাহির হইতেই তটিনী উত্তর করিল "কি আবার হবে!"

কিন্তু অকারণ কেন যে শুধু শুধু অন্তর্বাষ্পে তার বাক্‌রোধ করিয়া দিয়া তাকে এমন করিয়া জব্দ করিয়া দিল, সে নিজেই তার কিছু বুঝিলনা। এই ধনীর বক্ষ-পালিতা দুলালীর বুক কিসের দৈন্যে যে ফুলিয়া ক্ষুব্ধ তরঙ্গের সৃজন করিল, তার সেই গোপন ব্যাথার মর্ম্ম সে কোনো দিনই বুঝিবার চেষ্টাও করিত না।

এই ধনীর ঘরে কেউ তাকে চিনিবে না এই কি সত্য? ধনী কি মানুষ নহে? আর তারা কিই বা এমন ধনী। অতুল যে তাদের ঘরের লোক সে ত মনে করে যে তারা হৃদয় হীন! মানুষের মর্য্যাদা বুঝিবার ক্ষমতা বুঝি তাদের এতটুকুও নাই!

কি অপূর্ব্ব যে এই সম্পর্ক রহস্য তাই যে বুঝা কঠিন। যদি সেই একটা দুঃস্বপ্নের মহৎ মনের প্রশংসা সে মুক্তকণ্ঠেই করিতে পারিত।

কিন্তু আজ তা সে পারে না। বারীন নিজের মুখে যে দিন তাকে নিজের নাম বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছিল, তা ছাড়া স্বদেশের লোক বলিয়াও পরিচয় দিবার লোভে ঘনিষ্ঠতার ধার দিয়াও চায় নাই সে। অবশ্য পরিচয় না দিলেও তটিনী তাকে চিনিতে পারিত কিন্তু তার সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করিবার ক্ষমতা তার আগেও ছিল না, এখনো নাই।

(১৬)

তারিণীবাবু ঠিক করিয়া বসিয়াছেন যে, তিনি পশ্চিমের দিকে বেড়াইতে যাইবেন, সঙ্গে কেবল চাকর দুজন, তটিনীর ঝি তুলসীয়া ও তটিনী থাকিবে।

এ খবরে তটিনী যত বেশী অবাক্ হইল মহেশ্বরী তা হইলেন না। তাঁর বরং মন ও মুখের প্রসন্ন ভাবই বেশী রকম দেখা গেল। তাঁর বাসা আগুলিয়া থাকাতে একটুও আপত্তি নাই দেখিয়াও তটিনী কম আশ্চর্য্য হইল না।

একমাত্র সকল কথা পরিষ্কার করিয়া শুনাইতে পারিত অতুল, কিন্তু ইদানিং যখনি তাকে ডাকা যায়, সে তখনই অনুপস্থিত।

তটিনী এক সময় তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করিল "এই সময়ে হঠাৎ পশ্চিমে যাবেন কেন বাবা?"

তারিণীবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন "এ জায়গাটা বড় একঘেয়ে হ'য়ে গেছে তিনুমা,—আর ভাল লাগছে না, তাই একটু ঘুরে বেড়িয়ে আসতে চাই।"

তারপর তটিনীর দিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন "কেন, তোমার যেতে ইচ্ছে ক'রছে না তিনুমা? কত দেশ দেখে আসা যাবে।"

"কাশীতেও যাবেন?"

"কাশীতে? কেন ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করতে চাও? আচ্ছা যদি সুবিধা ও সময় হয় তো তাও যাব।"

"আচ্ছা!"

তারিণীবাবু অফিস কামাই বোধহয় জীবনে এই প্রথমে করিবেন, তা না হইলে কাজের উপর তাঁর এমন ভালবাসা ছিল যে অত বড় মন খারাপের সময়েও তিনি কাজ ফেলিয়া থাকিতে পারিতেন না।

মহেশ্বরীর নিতান্ত অনুরোধে পড়িয়া আর অতুলকে তিনি যথেষ্ট স্নেহ করিতেন বলিয়াই মামার সঙ্গে অতুলের বিবাহ বিষয়ে তারিণীবাবু মত দিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের সময় নিজেও উপস্থিত থাকিবেন না, বা মেয়েকেও উপস্থিত থাকিতে দিবে না ইহাই তাঁর ইচ্ছা ছিল।

এই জন্যই কেবলমাত্র মহেশ্বরীর অধিকারে এখানকার বাড়ীঘর সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া যাওয়া। তিনি অতুলের বিবাহ দিবেন, আত্মীয় স্বজন যাহাকে আনিতে হয় আনিবেন, যাহা কিছু করণীয় সমস্তই হইবে, কিন্তু তারিণীবাবু বা তটিনী এ সকল হইতে দূরে থাকিবেন!

এই সতর্কতা যে কি জন্য, তাহা তারিণীবাবু মুখ ফুটিয়া না বলিলেও মহেশ্বরী বুঝিলেন,—তাই মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেও কোনো কথা বলিতে পারিলেন না। বাড়ীর ঝি চাকরেরা যা একটু আধটু শুনিয়াছিল পরিশেষে তাই তটিনীরও কানে গিয়া উঠিল।

সদ্য ধোওয়া কাপড়গুলি তটিনী ট্রাঙ্কে তুলিয়া রাখিতেছিল, তার ঝি তুলসীয়া আসিয়া বলিল "ময়লা যা কিছু কাপড় চোপড় আছে' সে সবও ধুইয়ে নিলে হয় না দিদিমণি ?"

"না। এই ক'য় দিনের ভেতর যদি না দিতে পারে তো তাড়াতাড়ি ক'রে কি হবে ? সব থাক্ প'ড়ে, পিসিমা এ সব দেখে শুনে ধুইয়ে রাখবেন এখন।"

তুলসীয়া বলিল "হাঁ—পিসিমা তুলে রাখ্‌বেন ! তিনি তাঁর ছেলের বিয়ের গোলমালে সব ভুলে যাবেন।"

তটিনী সে কথা উড়াইয়া দিয়া বলিল "ছেলের বিয়ে যখন হবে তখন হবে, এখনি তো হচ্চে না !"

"আমরা চ'লে গেলেই ত হবে, শুনচি !"

"তোমার মাথা ! আমি কাজ করছি আর তুমি এই সময়ে যত আজগুবি বক্তৃতা দিতে বসে গেলে ! যা,—তুই দূর হ'য়ে যা, এ ঘর থেকে !"

"কাকে দূর করে দিচ্চো তিনু—কে যাবে দূর হ'য়ে ?"

অতুল আসিয়া ঘরে ঢুকিল। তটিনী হাসিতে হাসিতে বলিল "তোমাকে তা ব'লে না অবশ্য ! তোমাকেই তো বরং স্থির করে রেখে যাচ্ছি।"

অতুল বলিল "লাভ তো তোমাদেরই। কত দেশ দেখে বেড়াবে তার ঠিক কি ? আমাকে সঙ্গে নিলে আমিও খুব খুসীই হতাম।"

"তা নয় তো আরও কিছু ! আচ্ছা অতুলদা যদি সত্যি সত্যিই বাবা এখন তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চান, তুমি তা হ'লে খুব খুসী হও ? সত্যি বলো।"

"তা হই বই কি ?"

"এই বুঝি তোমার সত্যি কথা হ'ল ?"

অতুল মাথা নামাইয়া হাসিল। তটিনী বলিল "তা হ'লে আমার ভাগের সন্দেশটা যেন জমা থাকে !"

অতুল ক্ষুন্ন হইয়া বলিল "কারটা কার কাছে জমা থাকবে ভাই,—তোমরা যদি থাকতে এখানে কি ভালোই যে হ'ত তা হ'লে—! সমস্তই যে শ্রীহীন হ'য়ে যাবে তোমাদের অভাবে!"

এই বারে বুঝি অন্যরকম কাঁদুনি সুরু হ'ল!

"না। কেঁদে তোদের যাওয়ার আমোদটা নষ্ট করে দেব কেন?"

"বাস্তবিকই দেশ ভ্রমণের পরিবর্ত্তে বিবাহ সম্ভাবনাটা তখনকার মত অতুলকে আনন্দ দিতে পারিতেছিল না। তাই সে উদাস মনে বাড়ীর ভিতর বাহির করিয়া বেড়াইতেছিল।

তটিনী সান্ত্বনার স্বরে বলিল "তোমার আর এতে ক্ষুন্ন হবার কি আছে অতুলদা,—তুমি স্বাধীন মানুষ এর পর কতবার কত দেশ ঘুরে বেড়াবে।"

অতুল কোনো উত্তর না দিয়া কেবল একটু হাসিল। পাশের ঘরে কর্ত্তার চাকর নিতাই খুব উৎসাহে জিনিষ পত্র গোছগাছ করিতেছিল।

নিতাই বাঙালী! সে বহুদিনের পুরাতন চাকর। তারিণী বাবুর সেবা করিয়াই সে চুল পাকাইয়াছে বলিয়া তার একটা গর্ব্ব ছিল। পশ্চিমে বেড়াইতে যাওয়া অর্থাৎ তীর্থ দর্শনের লোভে সকলের চেয়ে বোধ হয় সেই বেশী আনন্দিত হইয়াছিল।

অতুল বলিল "হাঁারে নিতাই তুইও চল্‌লি বুঝি?"

নিতাই বিনীত ভাবে হাসিয়া বলিল "এতকালে বিশ্বনাথ বোধহয় মনে করেছেন বাবু!"

"তাই তো নিতাই,—বিশ্বনাথ যখন এতকাল পরে মনে ক'রেছেন তখন গেলে আবার ফিরে আস্‌তে দেবেন তো!"

"নাই যদি দেন তাতে আর ক্ষতি কি হবে বাবু, বুড়ো তো হয়েছি,—কাশী পেয়ে যাবো।"

হাঁা তা বেশ হবে। তিনু কি বল,—তুমি বুঝি পাবে ব্যাগ-কাশী?"

"তা বই কি!"

নিতাই কর্ত্তার বড় ব্যাগ দুইটী দু'হাতে ঝুলাইয়া নাবিয়া গেল।

যাওয়ার দিন বাড়ীর ব্যাপার সমস্ত চুকাইয়া যখন তারা ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণে উঠিয়া বসিল, তখন বহুকাল পরে তটিনীর মনে মুক্তির স্নিগ্ধ হাওয়ার পরশ লাগিল। রিজার্ভ কামরার একটা আসনে বসিয়া তারিণীবাবু ত তাঁহার অভ্যাস মত নির্ব্বিকার মনে চশ্‌মাটী পকেট হইতেবাহির করিয়া কাগজ পড়িতে বসিলেন।

অন্য দিকের আসনে বসিয়া তটিনী দু ধারের বাধা বন্ধনহীন উদার মাঠের শরিষা ফুল ছাওয়া পীতাঞ্চলখানির দিকে চোখ ডুবাইয়া দিল।

দ্রুত চলন্ত গাড়ীর বাতাস লাগিয়া তার বাঁধনছাড়া ছোট ছোট চুলগুলি কপালের উপর উড়িয়া পড়িতে লাগিল।

(১৭)

আগ্রায় আসিয়া যে বাসাখানিতে তারিণীবাবু উঠিলেন। সেখানি তাঁর একজন বন্ধুর বাসা। দুইটী বাসা পাশাপাশি। একটীতে এই ভদ্রলোক সপরিবারে বাস করিতেন। বাহির দিকে ঘড়ি, হারমোনিয়ম, বাইসাইকেল, প্রভৃতির দোকান,—এ বাড়ীখানি বড়, দ্বিতীয়খানি অপেক্ষাকৃত ছোট ; এখানি ভাড়া দেওয়া হইয়া থাকে কিন্তু সম্প্রতি ভাড়াটে উঠিয়া যাওয়াতে খালি পড়িয়াছিল তাই তারিণীবাবু আসিয়া উঠিয়াছেন।

সদর রাস্তার উপর এই বাড়ীখানির সুমুখ দিয়া সর্ব্বদাই গাড়ী ঘোড়া ও লোকজনের চলাচলে কোলাহল মুখরিত। পথ পানে চাহিয়াও তটিনীর অনেকক্ষণ সময় কাটিয়া যাইত।

বাড়ীর ছোট পাকা আঙ্গিনাটীর এক কোণে কয়েকটী গাঁদা ফুলের গাছ ও একটী কুলের গাছ ছিল। তটিনী কুলের গাছের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, তার ঝি তুলসীয়া বলিল "আজ রান্না কি হবে দিদি মণি ?

তটিনী বলিল "কেন,—নিতাই ফেরেনি কি ?"

"এখন তো ফিরলো না কখনই বা ফিরবে, কখন বা রান্না হবে !"

তটিনী বলিল "আজ আমি রাঁধবো। এখানে তো লোক বেশী নেই।"

আগ্রায় মাটীতে পদার্পণ করিয়াই সঙ্গের রাঁধুনী ব্রাহ্মণ ঠাকুরটির জ্বর হইয়া পড়িয়াছিল। নিতাই কর্ত্তার হুকুমে অন্য ব্রাহ্মণের চেষ্টায় গিয়াছিল কিন্তু বেলা এগারোটার সময় ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল যে ব্রাহ্মণ পাওয়া গেল না।

তটিনী তখন অন্ন রান্না প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছিল। সে আগুনের তাপে আরক্ত মুখখানি আঁচল দিয়া মুছিতে মুছিতে বলিল "ভালই তো হ'ল, ভারী তো রান্না! এ আমিই রাঁধতে পারি।"

তারিণীবাবু কিছুমাত্র উৎসাহ না দিয়া বলিলেন "হাঁ, এরপর অসুখ বিসুখ কিছু একটা হ'য়ে পড়ুক আর কি?"

তটিনী মাথা নামাইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল "না,—অসুখ হবে না!"

সেই দিনই বৈকালে তটিনী দেখিল উঠানের কুলগাছের নীচে অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে জমিয়া গিয়াছে। আর সেই ছোট ছেলেদের একটু তফাতে দাঁড়াইয়া একটী তরুণী মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে। তটিনী তার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া দু একটী কথা বলিবার পর সে বুঝিতেছিল যে এই তরুণীটি তাদের প্রতিবেশী তারিণীবাবুর এই প্রবাসী বন্ধুর কন্যা।

এই মেয়েটী বয়সে তটিনীর সমবয়স্কা হইলেও সে বিবাহিতা ও দুইটী শিশুর মা। সুতরাং তটিনী তেমন করিয়া মিশিতে পারিল না।

সন্ধ্যার সময় তটিনীকে সঙ্গে করিয়া তারা বেড়াইতে যাইবে বলিয়া রাখিয়া মেয়েটী তখন চলিয়া গেল।

শীতের কুহেলি জড়িত জ্যোৎস্নারাতে তটিনী সেই প্রকাণ্ড নূতন পরিচিত জন কয়েক মহিলাদের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইল। তারিণীবাবু ইহাদের সঙ্গে মিশিলেন না তিনি প্রতিদিন প্রাতে ও সায়াহ্নে যতদূর পারিতেন বেড়াইয়া আসিতেন, সুবিধা হইলে তটিনীকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন।

মেয়েরা তাঁদের কাজ কর্ম্ম সারিয়া যখন বাহির হইলেন, তখন রাজপথে লোক চলাচল বিরল হইয়া আসিয়াছে। প্রচুর জ্যোৎস্নার আলোকে চারিদিক শুভ্র সুন্দর দেখাইতেছিল। শীতাহত দূর্ব্বাবিহীন জমিতে কোথাও কোথাও উচ্চ প্রাসাদের ছায়া পড়িয়াছিল!

তাজমহলের কাছাকাছি আসিয়া তটিনী মুগ্ধচক্ষে চাহিয়া দেখিল। তাজের চাঁদের আলোক প্লাবিত মর্ম্মর দেহ অম্লান শুভ্রতায় জল জল করিতেছিল।

সেই সেকান্দরের প্রবল প্রতাপ সম্রাটের বক্ষমথিত বেদনার অর্ঘ অশ্রু তুষার যেন অমর হইয়া জমিয়া রহিয়াছে !

সঙ্গে যে দু একজন পুরুষ সঙ্গী ছিল তারা অনেক দূরে আগাইয়া গিয়াছিল। তটিনীকে তাদের দিকে চাহিতে দেখিয়া তার পিতার বন্ধুপত্নী বলিলেন "যাবে তুমি ওখানে ?"

তটিনী চোখ নামাইয়া বলিল "না। আমি বাবার সঙ্গে দুবার গিয়েছিলাম।"

"দিনের চেয়ে কি এই রাতেই বেশী সুন্দর দেখায় না ?"

"তা দেখায়।"

"তবে চল না। তোমার তো খুব ভালই লাগ্‌ছে।"

তটিনী একটু হাসিয়া বলিল "ওর ভিতরে গিয়ে উঠ্‌লে কিন্তু আর এত বেশী সুন্দর দেখাবে না।"

পথে নব মুকুলিত আমগাছের মাথায় লুকাইয়া বসন্তদূত কোকিল তার সাধা সুরে কূজন জুড়িয়া দিয়াছিল। একটা পাপিয়া কোমল করুণ চীৎকারে সমস্ত আকাশটা সে মূর্চ্ছনার প্লাবিয়া দিয়া গেল।

ফিরিবার সময় বাসার কাছাকাছি আসিয়া তটিনীর সমান বয়সের সেই মেয়েটী বার কয়েক তটিনীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিল "আচ্ছা ভাই তুমি স্বামীর ঘর কর না কেন ?"

তটিনীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে এইরকম প্রশ্নের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলনা। কিন্তু পাছে আবারও এই প্রশ্নই শুনিতে হয় তাই মৃদুকণ্ঠে বলিল "আমার বিয়ে হয়নি।"

সঙ্গের সকল মেয়েরা একবার পরস্পর মুখের দিকে চাহিলেন। গৃহিণীর চক্ষের ইঙ্গিতে আর কেহ কোনো কথা বলিতে পারিল না কিন্তু তারা যে তটিনীকে একটী অদ্ভুত জীব মনে করিতেছে তা তটিনীও বুঝিতে পারিল।

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিল তারিণীবাবুর ঘর তখনো দেশী বিদেশী ভদ্রলোকে পরিপূর্ণ। তিনি এখানে আসিয়াও নিঃসঙ্গ হইয়া পড়েন নাই। যদিও আফিসের কাজ

নাই, তবুও হিন্দু ও মুসলমান নানা রকম ভদ্রলোকের যাতায়াতে তাঁর একা একদণ্ডও থাকিতে হইত না।

তটিনী কাপড় ছাড়িয়া ঘুমাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। এমন সময় তারিণীবাবু আসিয়া বলিলেন "কি তিনু কেমন বেড়িয়ে এলে? গাইড্ কেমন লাগলো?"

তটিনী বলিল "আমাকে আপনিই সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে যাবেন বাবা,—ও সব গাইড্ আমার ভাল লাগে না।"

"কেন,—ওঁরা তো এখানকার অনেক দিনকার পুরাণো লোক।"

"আমার সঙ্গে যে মোটে আলাপ নেই—।"

"আলাপ ক'রে নাও না; তবে আমরা তো এখানে বেশীদিন থাকবো না।"

তটিনী কথা উল্টাইয়া বলিল "আপনার খাবার ঢেকে রেখে গিয়েছিলাম, আপনি খেয়েছিলেন বাবা?"

"খাবার? না খাই নি তো!"

"তা হ'লে খেয়ে নিন। রাত ঢের হয়েছে এগারোটা প্রায়।"

"তবে থাক্, আর খাবো না আজ। তুমি ঘুমোও গে"

"সামান্য কিছুও খাবেন না?"

"না"

তটিনী আবার বলিল "কেবল দুধটুকুও খাবেন না?"

তারিণী বাবু তখন কেবল দুধই খাইলেন। তটিনীকে শুইতে বলিয়া দিয়া তিনি নিজেও শুইতে গেলেন। তিনি তটিনীর মুখের এক কথাতেই বুঝিলেন যে তাঁর বন্ধু পরিবারের স্ত্রীলোকেরা তটিনীকে এমন কোনো প্রশ্ন করিয়াছে যাহাতে তটিনী সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে।

পর দিন শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়াই তিনি বলিলেন "তিনু ও বাড়ীর সঙ্গে মিশতে তোমার তেমন সুবিধে হবে না নয়! তা হ'লে সে কাজও নেই।"

তটিনী ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল "আচ্ছা!"

তার পর বলিল "যদি ওঁরা নিজে হতে একটু আত্মীয়তা দেখান তাতে অভদ্রতা ক'রবো কি ক'রে ?"

"না তা আর কি ক'রে ক'রবে !"

তারিণী বাবু বাহিরে চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁর চিন্তাম্লান মুখ দেখিয়া তটিনী ভাবিল এইবার বুঝি এ আশ্রয় ছাড়িতে হয় !

ক্রমশঃ

শ্রীনীহারবালা দেবী।

ঝড়োহাওয়ার গান্।

——:o:——

(১)

সামাল তরী, সামাল তরী

'তুফান ভারী আজ্‌কে !

ওরে পাগল ! ডরাস্ নাকি

ঝঞ্ঝাবায়ু ব'জ্‌কে ?

থর্ থরিয়ে বিশ্ব কাঁপে ;

আসমানেরি ফাঁকে ফাঁকে

থেকে থেকে আগুণ বরণ

বিজ্‌লি ওঠে চম্‌কি ;

দিক দিকে ঝড়োহাওয়ার

সুর্‌টা ওঠে ঝম্‌কি।

(২)

ক্ষুদ্র তরীর প্রান্ত বেয়ে
জল্ যে উঠে ছল্‌কি।
মাঝ নদীতে ডুবিয়ে তরী
বন্ধু আমার ফল কি ?
ঢেউ যে উঠে দুলে দুলে,
ক্রুদ্ধ রোখে ফুলে ফুলে,
মেঘের কোলে ওঠে জ্বলে
দাবানলের ফুলকি।
এমনি করে চল্‌লে ভেসে
ভাবিস পাবি কুল কি ?

(৩)

আয় রে ফিরে বন্ধু আমার
আমায় ফেলে যাস্‌নে ;
বিচ্ছেদের এই করুণ গীতি
কঠিন সুরেই গাস্‌নে।
হেথা আমার বিজন গেহ,
আপন আমার নাহি কেহ,
এক পাশেতে আছে ফুটি
রক্তবরণ ফুলটী।
ওরে নিঠুর ভাঙ্গিস্‌নে মোর
সব ভুলানার ভুলটী।

(৪)

বদখৎ তুম্ চোপ রহ আজ
　　ডাকিস্ নাকো পিছ্‌নে ;
অতীতের ওই লুপ্ত স্মৃতি
　　আবার এনে দিস্‌নে।
　আজ্‌কে রাতে বিষম ঝড়ে,
　ঘরটা আমার গেছে পড়ে.
ডাক পড়েছে, ডাক পড়েছে
　　ভেঙ্গে গেছে বাঁধটা ;
আজ্‌কে তবে সাধ্‌তে হবে
　　অনেক দিনের সাধটা।

(৫)

ওরে ভীরু, চুপ বসে থাক্,
　　মরদ যত আয় রে।
দম্‌কা হাওয়া যায় চলে যে,
　　দম্‌কা হাওয়া যায় রে।
　হাস্‌ব আজি অট্টহাসি,
　বিশ্ব যাহে উঠ্‌বে ত্রাসি,
শঙ্কা কিসের হুঙ্কারেতে
　　কাঁপিয়ে সবি চল্ রে।
আজকে নব বধূর সাথে
　　চল্‌বে নাকো ছল্ রে।

(৬)

কোকিলের ওই কুহু কুহু
চাই না আজি শুন্‌তে,
ঘরের কোণে বসে বসে
প্রেমের ঢেউ গুণ্‌তে।
ভোরের আলো, চাঁদের হাসি,
ঘুম পাড়নর ছোট্ট বাঁশী,
সব ফেলে দাও অগাধ জলে
চাই না কিছু চাই না।
ঝড়োহাওয়া বাজায় ভেরী
আয় না ছুটে আয় না।

(৭)

বন্ধু আজি গান ধরেছে
মুক্ত হাওয়ার গান রে।
বক্ষ মাঝে গর্জ্জি উঠে
হুহু করি বান্‌ রে।
চল্‌ রে ভেসে, চল্‌ রে ভেসে,
ঝড় উঠেছে সর্ব্বনেশে,
আর কি বসে রইতে পারি
চুপটী করে আজ্‌কে।
এবার আমি ভয় করিনে
ঝঞ্ঝা বায়ু বাজ্‌কে।

শ্রীশ্রীধর শ্যামল।

গ্রহণ।

—:•:—

জাপান একদিন ইউরোপকে ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। বলেছিল, আমরা তোমাদের জমি দেবনা, ঘরবাড়ী করতে দেবনা, আমাদের দেশে নামতে দেবনা, তোমাদের আমরা চাই না! কিন্তু 'চাইনা' বললে কি হয়, কমলি নেহি ছোড়তি হায়! এই মস্ত ভুল জাপান যেদিন উপলব্ধি করেছিল সেদিন তাকে বলতে হয়েছিল, হাঁ, তোমাদেরই আমরা চাই। তখন তারা যে বিদ্যায় ইউরোপ সমস্ত পৃথিবী অধিকার করেছে সেই বিদ্যা গ্রহণ করেছিল।

আজ প্রাচ্য মহাদেশে যে কোন দেশ ইউরোপের বিদ্যাকে যে পরিমাণে অগ্রাহ্য করচে তারা সেই পরিমাণেই ইউরোপের কাছে পরাভূত হচ্চে। বিদ্যা জিনিষের প্রতিষ্ঠা সত্যে, কোন দেশবিশেষে নয়—এবং বিশেষ সত্যের উৎপত্তি যে-দেশেই হোক্, তা সমস্ত দেশেরই সম্পত্তি। তাকে অস্বীকার করা আর কিছু নয় সত্যের প্রতি নিজের অধিকারকে অস্বীকার করা।

ইউরোপীয় বিদ্যা বাইরের জিনিস নয় এ কেবল সংবাদের সংগ্রহ বা পড়া মুখস্থ নয়।

এর মধ্যের একটি মনের সাধনা আছে—সেই সাধনায় মনের সঙ্গে বিশ্বের যে যোগ হয় সেই যোগে মন শক্তি পায়। বুদ্ধি মুক্তি লাভ করে। সত্যকে গ্রহণ সম্বন্ধে মনের সুর যদি ঠিকমত বাঁধা হয় তা হ'লে মন চরিতার্থতা লাভ করে। ইউরোপীয় বিজ্ঞানের চর্চ্চা কেবল জ্ঞান লাভ করা নয়, সে হচ্চে মনটাকেই তৈরি হলে মানুষ বিশ্বে জয়ী হয় নইলে পদে পদে তার পরাভব ঘটে।

যেমন আধ্যাত্মিক রাজ্যে আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিল হ'লেই মুক্তি তেমনি আধিভৌতিক রাজ্যে বিশ্বের নিয়মের সঙ্গে আমাদের বুদ্ধির যে সামঞ্জস্য আছে সেটা লাভ হলেই আমাদের মুক্তি। আমাদের বুদ্ধি যখন নিজের অধিকারের মধ্যে বিশ্বকে পায় তখনই অশক্তি থেকে আতঙ্ক থেকে পরপরায়ণতা থেকে আমরা মুক্তি পাই।

মানুষের যেমন আত্মা আছে মানুষের তেমনি দেহমনও আছে, সে কথা ত উড়িয়ে দিলে চলবে না। আত্মিক রাজ্যে আমরা অমৃতের অধিকার লাভ করব, কিন্তু সেই সঙ্গে আধিভৌতিক রাজ্যে আমরা মর্ত্যলোকের অধিকার লাভ করব এই হচ্ছে মানুষের সাধনার সম্পূর্ণতা।

ভগবান আমাদের মহা অধিকার দিয়াছেন তিনি বলেছেন, 'কারুর কাছে মাথা নীচু করবে না, আমার কাছেও না। সমস্ত বস্তু-বিশ্বকে তুমি আপনার হাতে নাও। আমার এই সম্পত্তি তোমারই রইল, তুমি একে চালাও।' তাঁর এই মহা অধিকারের দলিলকে আমাদের মানতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে। তিনি যদি আমাদের এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করতেন তবে তো Diarchy দ্বৈরাজ্য হ'ত কিন্তু তিনি কখনো তা করেন নি।

"যাথাতথ্যাতোঽর্থান্ ব্যধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।"

তিনি বিশ্বের সমস্ত অর্থের যে বিধান করেছেন, তা যথাযথ, সে বিধানে খামখেয়ালি নেই, তা নিত্যকালের। এতে সাত বছরের পরীক্ষার অপেক্ষা নেই। যে তা মেনেছে সেই ধনে ধান্যে বড় হয়েছে। এই নিত্যকালের সাধারণ বিধি কেউ আড়াল করে বসে নেই। পাশ্চত্যবাসীদের তাড়াতে পারলেই সে বিধি করায়ত্ত হবে না, বিধাতার দলিল যেদিন স্বীকার করব সেদিন এদের আপনা থেকেই চলে যেতে হবে,. দাঁড়াবার আর যো থাকবে না। ভারত যখন বিশ্বসিংহাসনের কাছে দাঁড়িয়ে একযোগে বলতে পারবে, 'আমার বিশ্বরাজ্যে অধিকার আছে'—তখন কেউ তাকে আগলাবে না। কিন্তু যতদিন এই কথা বলবার শক্তি সঞ্চিত না হয়, ততদিন আমরা পরাভূত হব।

পাথরের খণ্ড সহস্র বৎসর ধরে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে, সে কিছু নিতে পারে না। কিন্তু চিত্ত যেখানে সজাগ সেখানে তার প্রধান লক্ষণ এই যে তার গ্রহণ করবার শক্তি আছে কেবল বর্জ্জন করবার নয়। বাঙলার ইতিহাসেও আমরা এটাই দেখেছি।

বাঙলা পলিমাটির দেশ এখানকার ভূমি উর্ব্বরা, তাই ধনে ধান্যে ভরে ওঠে। বাঙালার চিত্তভূমিও সেই রকম উর্ব্বরা, উৎপাদনশীল। নানা বীজ এখানে পড়ে অঙ্কুরিত হয়। এ কথা কি আজ আমরা বলব না যে পাশ্চাত্যবিদ্যার বীজও এখানে পড়ে ফসল ফলাবে।

আমাদের মাটিতে সব ফসলই ফলে এ কথা পৃথিবীতে সকল বড় জাতিই বলতে কুণ্ঠিত হয় নি। কিন্তু যারা বর্ব্বর তারাই নেয় না। আফ্রিকার বর্ব্বরেরা কিছু নেয়ও না, দেয়ও না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
"শান্তি-নিকেতন"—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯।

নানা কথা।

পাশ্চাত্য কবিগণের প্রণয় কথা।

যে সকল প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য কবি উপন্যাস ও কাব্য লিখিয়া যথেষ্ট যশঃ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন ব্যতীত কেহই ভালবাসায় কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন নাই। বার্ণস্ অনেক মহিলাকে ভালবাসিয়া পরিশেষে যদিও জীন্ আর্মারকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি হাইল্যাণ্ডের মেরি ক্যাম্পবেল্ নাম্নী এক অল্পবয়স্কা চাকরাণীকে হৃদয় দান করিয়াছিলেন। বার্ণস্ আয়ার নদীর তীরে মেরী ক্যাম্পবেলের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মেরি ক্যাম্পবেল্ গ্রীণ্‌চে আপনার জ্বরাগ্রস্ত ভ্রাতাকে শুশ্রূষা করিতে করিতে অত্যন্ত কষ্টের সহিত প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বে বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়া গিয়াছিল। "হাইল্যাণ্ড ল্যাসি" এবং "হাইল্যাণ্ড মেরি" নামক যে উপন্যাস তিনি লিখিয়াছেন, তাহার নায়িকা মেরি ক্যাম্পবেল্ ব্যতীত আর কেহই নন।

স্যার ওয়াল্টার স্কটের বয়স যখন উনিশ বৎসর তখন তিনি ভালবাসায় পড়িয়া ছিলেন। মিস বেলচিস্ নাম্নী কোন বালিকা তাঁহার মন আকর্ষণ করে। কথিত আছে, কোন রবিবারে বৃষ্টি পড়িতেছিল, সেই সময়ে উভয়ে ধর্ম্মমন্দির হইতে আসিতেছিলেন। মিষ্টার স্কট্ এই সময়ে আপনার ছাতার মধ্যে তাহাকে আশ্রয় দান করেন। মিস বেলচিসের প্রতি স্কটের ভালবাসা সাত বৎসর কাল স্থায়ী হইয়াছিল এবং তিনিও তাহাকে স্বীয় পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে

অনেকবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন কিন্তু মিস বেলচিস্ পরিশেষে এক ধনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, অগত্যা স্কট শেষে নীল্‌কার পেট্রিটায়ারকে বিবাহ করিয়া নিজকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। এবং তাহার সহিত সুখে বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

যখন কোলিরিজ তাঁহার কোন সহপাঠীর ভগ্নী মেরি ইভান্সের সহিত প্রেমে বিজড়িত হইয়াছিলেন, তখন তিনি বালক মাত্র। এই সময়ে তিনি চাকরের কাজ করিতেছিলেন। মিস মেরি ইভান্স আমোদপ্রিয়া, বুদ্ধিমতী এবং নীলনেত্রা ছিলেন। মিষ্টার ই, এইচ্, ডিকিটেলি তাঁহার একখানি গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, মেরি ইভান্স পরে অপরের পত্নী হইয়াছিলেন। একজন জীবনী লেখক বলেন যে, মিস মেরি ইভান্সের ভালবাসায় নিরাশ হইয়া কোলিরিজ কেম্ব্রিজ হইতে পলায়ন করিয়া কিংস-এন-লাইট-ড্রাগুন্স নামক সৈন্যদলে সিলাম টমকিন কুম্বারব্যাক্ নাম ধারণ করিয়া কোন সৈনিকের পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার পরিবারবর্গ টাকা দিয়া তাঁহাকে সৈন্যদল হইতে মুক্ত করিয়া আনেন এবং পরিশেষে ব্রিষ্টলের সারা ফিকার নাম্নী কোন বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সারা ফিকারের ভগ্নী এডিথ্, সাউদীর পত্নী ছিলেন। সাউথির বিবাহিত জীবন দুঃখপূর্ণ ছিল, কারণ তাঁহার পত্নী বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া বাতুলাগারে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, পত্নীকে হারাইয়া সাউদী বিন্দুমাত্র দুঃখ প্রকাশ না করাতে তাঁহার বৈরাগ্য সম্বন্ধে অনেক নিন্দনীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল।

সকলেই জানেন যে, চার্লেস ল্যাম্বের জীবন বিয়োগান্ত ঘটনাপূর্ণ। যখন তাঁহার ভগ্নী মাতাকে ছোরার দ্বারা হত্যা করিয়া পাগল হইয়াছিলেন, তখন তিনি বিবাহ করিবার সংকল্প একেবারে পরিত্যাগ করেন, তাঁহার ভগ্নীকে রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। সেই সময়ে তিনি ম্যানি সিমিন্স নাম্নী একটী বালিকার প্রেমে আবদ্ধ ছিলেন। ম্যানি সুকেশীনী ও নীল-নেত্রা ছিলেন।

জীবনের শেষাংশে ল্যাম্ব হেষ্টর ল্যাভরি নাম্নী অপর একটী বালিকার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই বিবাহ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করায় তিনি মনের ভাব কখনও তাহার নিকট ব্যক্ত করেন নাই।

লর্ড বাইরণের প্রণয় কাহিনী অনেক। অতি বাল্যকালে যখন তিনি মেরি ডফ নাম্নী বালিকার ভালবাসায় পতিত হন, সেই সময় হইতেই তাঁহার প্রণয় ব্যাপার আরম্ভ হয়। তিনি স্বদেশে এবং বিদেশে অনেক কষ্ট পাইয়াছিলেন, এমন কি মেরি মিলব্যাঙ্কির সহিত বিবাহের পরও তিনি অনেকের ভালবাসায় পড়িয়া ছিলেন, অবশেষে তিনি মিলব্যাঙ্কিকে পরিত্যাগও করিয়াছিলেন।

বাল্যকালে কোন বালিকার সহিত প্রণয় নিবন্ধন মিষ্টার শেলিকে কষ্টময় জীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। উনবিংশ বৎসর বয়ক্রম কালে তিনি হেরিয়েট ওয়েষ্টব্রুকের সহিত পলায়ন করেন। মেরি গডউইনের সহিত ফ্রান্সে পলায়ন করিবার তিন বৎসর পরে তাঁহার প্রথমা স্ত্রীকে কোন রহস্যময় ঘটনা নিবন্ধন হাইডপার্কের সারপেন্‌টাইন নদীতে মৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। মোটের উপর মিষ্টার শেলি মেরি গডউইনের সহিত সুখে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। যখন শেলি ভূমধ্য সাগরে প্রাণত্যাগ করেন, তখন তাঁহার পত্নী অত্যন্ত শোকান্বিতা হইয়াছিলেন ইহা তাঁহার দৈনন্দিন পুস্তক হইতে জানা গিয়াছে।

মধ্য আফ্রিকার অদ্ভুদ প্রথা।

মধ্য আফ্রিকার অগম্য মরুপ্রদেশে ও শ্বাপদ সঙ্কুল ভীষণ অরণ্যে যে সকল আদিম অধিবাসী বাস করে তাহাদের অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে বিবাহ সংক্রান্ত আচার ব্যবহারগুলি অতি অদ্ভুদ। উগাণ্ডার ম্যাকোল নামক স্থানের বেহুমা জাতীয় লোকদিগকে কন্যার পণস্বরূপ কয়েকটী দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিতে হয়। বহুবিবাহ এই স্থানে নিষিদ্ধ নহে, বরং বহুদার পরিগ্রহ খুব মান সম্ভ্রমের চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হয়।

এই স্থানের স্ত্রীলোকগণ অত্যন্ত স্থূলাবয়ব বিশিষ্ট হয়, এবং তাহাদের স্থূলতা সৌন্দর্য্যের একটী অঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়। বিবাহের পূর্ব্বে বালিকাদিগকে কোথায় বেড়াইতে দেওয়া হয় না। তাহারা স্বামীগৃহে যাইবার পূর্ব্বে যাহাতে অধিক স্থূলকায় হইতে পারে এই জন্য প্রচুর দুগ্ধ খাইতে উৎসাহিত করা হয়। যেরূপ চীন দেশে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে "ক্ষুদ্রপদ" সৌন্দর্য্যের

বিশেষ চিহ্ন, সেইরূপ স্থূলতাও এইদেশের স্ত্রীলোকদিগের নিকট সৌন্দর্য্যের একটী বিশেষ অঙ্গ। যে বালিকা যত বেশী মোটা হয় সে বালিকা তত বেশী গাভী যৌতুক পাইয়া থাকে। বালিকাদিগকে মোটা করিবার জন্য বেশী পরিমাণে দুগ্ধ খাওয়ান হইয়া থাকে। ইহাতে এই ফল হয় যে তাহারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র পদবিশিষ্ট চীনা স্ত্রীলোকদিগের মত চলচ্ছক্তি বিহীন হইয়া পড়ে।

এই বার বিবাহের কথা। কন্যা এক বাটি দুগ্ধ লইয়া বরের গাত্রে নিক্ষেপ করিলে বিবাহ সাব্যস্ত হয়। ইতিপূর্ব্বে সে কখনও তাহার ভাবী পতিকে দেখে নাই, সুতরাং ইহাতে ভালবাসার কোন ব্যপারই থাকে না, ঔচিত্য ও আচার ব্যবহারের বশবর্ত্তী হইয়াই এই নূতন বন্ধনে বদ্ধ হয়। বিবাহের পর কন্যা বহু সখী পরিবেষ্টিত হইয়া স্বামীগৃহে অগামন করে ও সখীগণ তিন চারি দিবস তাহার সহিত বাস করে। বর কন্যাকে দেখিতে আসিলে কন্যার সখীগণ বরকে বাধা দেয় ও বরের সখীগণ আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করে। এই কৃত্রিম আক্রমণ সম্ভবত পুরাকালের বলপূর্ব্বক বিবাহের অনুকরণ। রেভারেণ্ড জন্ রস্কো "দি সোল অফ্ সেণ্ট্রাল আফ্রিকা" নামক পুস্তকে আর একটি জাতির বিবাহপদ্ধতি বিবৃত করিয়াছেন, তাহা ইহা অপেক্ষা আরও বর্ব্বরতা পূর্ণ।

বর যখন কন্যাকে লইয়া যাইতে আইসে, তখন কন্যার আত্মীয়দিগের একজন একগাছি শক্ত রজ্জু দ্বারা কন্যার একটি পা বন্ধন করে দুই পক্ষ (বর ও কন্যাপক্ষ) বদ্ধ রজ্জুর দুই প্রান্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিতে থাকে, বর কন্যার হাত ধরিয়া কন্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে। কন্যা পক্ষও কন্যাকে ছাড়িয়া দিতে নারাজ, বরপক্ষও লইয়া যাইবার জন্য বদ্ধপরিকর। তাহার পায় যখন বরের আনুকূল্যে শেষ টান দেওয়া হয় বর তখন কন্যার পদ হইতে রজ্জুগ্রন্থি খুলিয়া তাহাকে লইয়া স্বগার প্রস্থান করে। সচরাচর চারি মাস মাত্র বয়সের সময় কন্যার বিবাহের কথাবার্ত্তা হয়। কোন কোন জাতির মধ্যে এরূপ প্রথা আছে যে বরপক্ষ কন্যার পিতাকে দুই একটী গাভী দিয়া কন্যাটিকে বাগদত্তা করিয়া রাখে। কন্যা, মাতার অতীব আদরের সামগ্রী, তিনি তাহাকে বাহিরদেশে লইয়া গিয়া পৃথিবীর চারিটী কোণ দেখান এবং তৎপরে তাহার নাম রাখেন।

ব্যাগেবু জাতীয় লোকদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে যে, বালিকাগণ দশ বৎসর বয়সের পূর্ব্ব হইতেই বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। এই প্রস্তুত হওয়া বড় বিষম ব্যাপার। তাহারা বড় বড় সূচ লইয়া বেড়ায়, এবং বক্ষে ও কপালে সূচ দিয়া কাটিয়া চিহ্ন করে। কাটিবার পর ক্ষত স্থানে ভস্ম মর্দ্দন করা হয়। এইরূপ করিতে করিতে ক্ষত চিহ্নগুলি বেশ সুস্পষ্ট হয়। ইহা তাহাদের সৌন্দর্য্যের চিহ্ন। যাহাদের ইহা না থাকে তাহাদের কেহ বিবাহ করে না বা তাহাকে বয়োজ্যেষ্ঠদিগের সমাজে প্রবেশানুমতি দেওয়া হয় না। তবে তাহাদের চিহ্ন করা শেষ হইলে অনুমতি দেওয়া হয়। ইহাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বদাই শত্রুভাব বিরাজ করে, কেবলমাত্র শস্য সংগ্রহের পর যখন সকলে কিছুদিন পানাহার ও আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকে তখনই কোনও বিবাদ থাকে না।

বুনোরো সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদিগের রাজার নিদ্রাকালে একটী যুবতী সর্ব্বক্ষণ তাঁহার বিছানার প্রান্তভাগে আড়া-আড়ি এমন ভাবে শয়ন করিয়া থাকে যে, যাহাতে তাঁহার পদদ্বয় তাহার শরীরের উপর ন্যস্ত থাকে, এবং পা বিছানার প্রান্তভাগে লাগিয়া তিনি কোন কষ্ট না পান। অতি প্রত্যূষে ঐ রমণী শয্যা ত্যাগ করে ও রাজার পদদ্বয়ে তৈল মর্দ্দন করিতে থাকে।

যেমন চীন দেশে বৃষ্টি নিবারণকারী লোক আছে সেইরূপ এদেশেও এই সম্প্রদায় ভুক্ত লোকদিগের মধ্যে এইরূপ লোক আছে। ইহাদিগকে সময়ে সময়ে বিষম বিপদে পড়িতে হয়। যদি সে বৃষ্টিপাত করাইতে না পারে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে প্রখর সূর্য্যকিরণে বসাইয়া লবণাক্ত খাদ্য খাইতে দেন, যখন লোকটী পিপাসার্ত্ত হইয়া জল চাহে, তখন রাজা তাহাকে বলেন "বৃষ্টি আনাইয়া তৃষ্ণা নিবারণ কর।" বৃষ্টি নিবারণ ব্যবস্থা ইহার ঠিক বিপরীত। আবার বর্ষাকালে সূর্য্য কিরণ দেখাইতে না পারিলে যতক্ষণ না রৌদ্র উঠে ততক্ষণ তাহাকে মুহুর্ম্মুহু জল পান করান হয়।

এতদপেক্ষা আরও আশ্চর্য্যজনক প্রথা ওয়াকিকুহু সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়—বিশেষ বিবাহ ব্যাপারে। ইহাদের বিবাহ ব্যাপার আনন্দের হওয়া দূরে থাকুক বরং ঘোর দুঃখের অভিনয় হইয়া থাকে। একটী কন্যার মূল্য সাধারণতঃ ৪০ হইতে ৬০টী ছাগ। অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াও যদি কন্যার বিবাহ না হয় তাহা হইলে তাহার বড়ই নিন্দা

হয়। বর নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাগ প্রদান করিয়া তাহাকে লইয়া যাইতে অগ্রসর হয়। ডঃ লিওনর্ড ফন্ ভাণ্ডেলবার্গ বলেন যে, কন্যা লজ্জাশীলা বালিকার ন্যায় যথাসাধ্য বাধা দিয়া থাকে, কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই বিফল হয়, এবং অচিরে উল্লাসিত হৃদে প্রতীক্ষাকারী বরের নিকট আনীত হয় ও বর তাহাকে তাহার গৃহে লইয়া যায়। তখন কন্যা যথেষ্ট ক্রন্দন ও বল প্রকাশ করিয়া আপত্তি জ্ঞাপন করে। বরের গৃহে গমন করিয়া বালিকা আরও আট দিন ক্রন্দন করে, তখন সেখানে স্বামী থাকে না। এইরূপ আটদিন কান্না-কাটির পর বালিকা তাহার মাতার নিকট আইসে। কিন্তু সেই দিবসেই স্বামীসহ স্বামীগৃহে চলিয়া যায়। তাহার সখিগণ খেলার সাথী হারাইল বলিয়া যথেষ্ট অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকে।

এই সমস্ত দেশে আরও বহু প্রকার অদ্ভুত প্রথা ও বিস্তর অন্ধ বিশ্বাস প্রচলিত আছে। যদি কোনও ব্যক্তি নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামে যাইবার জন্য বাহির হইয়া পথের উপর সাপ দেখে তাহা হইলে তখনই ফিরিয়া যাইবে। তাহার বিশ্বাস যে সে কোনও অশরীরির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতেছে। যদি কোন স্ত্রীলোক তাহার স্বামীর প্রতি এক মুঠ ধূলা নিক্ষেপ করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে স্ত্রী তাহাকে ঘৃণা করে, তখন স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিবার প্রস্তাব জ্ঞাপন করিলে স্ত্রী তাহাকে সম্মতি প্রদান করে।

ওয়াকাম্বা জাতী সুবিচারের জন্য সেকালের ইংরাজদিগের ন্যায় কঠিন পরীক্ষার সমর্থন করিয়া থাকে। চিকিৎসক এক খণ্ড তপ্ত লোহ অপরাধীর হস্তে অর্পণ করে, যদি লোকটীর হাত পুড়িয়া যায় তাহা হইলে সে দোষী সাব্যস্ত হয়। অপর এক জাতীর লোকেরা কোন কোন পীড়া আরোগ্য করিবার জন্যও ঐরূপ উত্তপ্ত লৌহ খণ্ড রোগীর হস্তে রাখিয়া রোগ তাড়াইবার চেষ্টা করে।

কংগো দেশের পিগমী নামক এক খর্ব্বকায় জাতীয় লোকদিগের কথা ডাঃ ভাণ্ডেনবার্গ বলেন যে, তাহারা বাঁদর অপেক্ষা অতি সামান্য সভ্য। তাহারা প্রায় সারাজীবনই অরণ্যে বাস করে, হস্তী ও অপরাপর বৃহদাকার পশু শীকার করিয়া থাকে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাহারা তাহাদের এই ছোট ছোট তীর ধনুক দ্বারা এইরূপ বৃহৎ প্রাণী কি প্রকারে বধ করে। এই যন্ত্রগুলি এই বামনদিগের হস্তে ঠিক যেন বালকের হাতে খেলনার ন্যায় দেখায়।

সম্মিলনী।

অমঙ্গল

হাতীশালে হাতী কাঁদে ঘোড়া কাঁদে গুমরি
রাস দেউলে পেচক ডাকে দিনে,
উড়তে নারে জড়িয়ে জালে লুটায় ভ্রমর ভ্রমরী
প্রাসাদ রাজার কাঁপে কারণ বিনে।

(২)

আধেক পথেই আকাশ-প্রদীপ নিভায় পবন পরশে
গৃধ্র আসে সিংহদ্বারের কাছে,
শ্যেন নখরে ছিন্ন কপোত রুধির ধারা বরষে
রাজ-পতাকা পোড়ে বাজের আঁচে।

(৩)

দুঃখিতা সব শীর্ণ গাভী রয় যে সজল নয়নে,
বৎসহারা চায়না যেতে গোঠে,
রাজমহিষী স্বপ্ন দেখে চমকে উঠেন শয়নে,
বন্ধু যারা শত্রু হয়ে ওঠে।

(৪)

শান্তি আজি পক্ষ ভাঙ্গা, রক্তরাঙ্গা ধরণী
শত্রু মৃত, মন্ত্রে উঠে বেঁচে,
ঘাটের কাছে এসেই ডোবে পণ্যভরা তরণী
পকগুটী নিত্যি আসে কেঁচে।

(৫)

অলক্ষ্মী আজ লক্ষ্মী সেজে ঢুকলো বুঝি পুরীতে
নির্য্যাতন আজ সইছে সাধু হেসে,
অত্যাচারে পারবে কেন অত্যাচারে দূরিতে
প্রেম প্রীতি আর নাই কি পোড়া দেশে !

(৬)

ধরিত্রী আজ ধৈর্য্যহারা, ভ্রম ত তাহার যাবে না
লাঞ্ছনা হয় সত্য কথা কয়ে,
কালিদহের কমল কানন দেখতে যারা পাবে না
শ্রীমস্তকে যায় শ্মশানে লয়ে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।
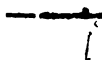
আত্মের কথা।

—:০:—

জ্ঞানই আদিতে।

অভাবের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবের পরিবর্ত্তন অবসম্ভাবী ;—সে অভাব দৈহিক বা মানসিক যাহাই হ'ক। নিরন্ন নীরবে, নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া অসহ্য ক্ষুধার তাড়না সহ্য করে না, করিতে পারে না তাহাকে বাধ্য হইয়া বাহির হইতে হয়। সদুপায়ে উপার্জ্জনের শক্তি যদি তাহাতে থাকে, আর সে শক্তির প্রয়োগের সুযোগ সুবিধা সে যদি পায়, তবেই সে সুপথে

থাকিয়া সদ্ভাবে তাহার অভাব মোচনে সুখী হয়, নতুবা চৌর্য্যাদি অসদুপায়ই হয় তাহার অবলম্বনীয় ;—দেহটাকে রক্ষা করিতে গিয়া সে মনের মরণ ডাকিয়া আনে, নিজেও পদে পদে বিপন্ন বিধ্বস্ত হয় আর সমাজকেও বিপদগ্রস্ত করে না কম। ব্যক্তির অধোগতিতে গোষ্ঠি, সমাজ, জাতীও ক্রমে অবনত অশক্ত হইয়া পড়ে,—সময় থাকিতে ব্যক্তিত্বের উন্নতির দিকে দৃষ্টি না দিলে, ব্যষ্টির অভাব সদুপায়ে মোচনের ব্যবস্থা না করিলে. সে সমাজ সে জাতীর মঙ্গল নাই ; জাতীয় জীবনকে উন্নত সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, তাহার দৈহিক ও মানসিক ক্ষুধার যাহাতে সুপথে থাকিয়া নিবৃত্তি হইতে পারে তাহার বিধান সর্ব্ব প্রথমে।

অনুভূতির সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের. তাহার ক্রিয়া কলাপের উন্নতি,—যেমন যাহার চিন্তা, মনন, তাহার কার্য্যাবলীও তদনুরূপ। চিন্তা শক্তির উৎকর্ষতার মূলে জ্ঞান। অনুভূতি আদিতে,—ইচ্ছা ও মনন তাহার ফল, কর্ম্মে তাহার বিকাশ।

ভারতে অভাবের অনুভূতি অতি তীব্রভাবে আজ সর্ব্ব ঘটে জাগ্রত হইয়াছে, এই জন্য উত্তেজনারও অভাব নাই,—এই অভাবের খোরাক যাহাতে আমরা সুপথে থাকিয়া লাভ করিতে পারি, যাহাতে 'সু'র প্রতি সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হয়, 'সু'তে থাকিয়া সকলে অভাব মোচনের উপায় করিতে পারে, দেহ মনে সেশক্তি যাহাতে বিকশিত হয়, সেই জ্ঞান, নির্ম্মল বুদ্ধি, যাহাতে সর্ব্বসাধারণে উদ্বুদ্ধ হয়, এই জাতীয় উন্নতি সাধনায় তাহার অনুষ্ঠান আদিতে আরব্ধ হ'ক।

হিতাহিত জ্ঞান যাহাতে প্রবুদ্ধ হয় নাই, আত্মসম্মান, আত্মমর্য্যাদার মহিমা যাহাতে পরিস্ফুট নয়—সে জ্ঞান যাহার নাই,—সে নিজের জন্যও মনুষ্যোচিত কার্য্য করিতে পারে না, জাতীয় জীবনের অনুভূতিত তাহার নিকট সুদূর পরাহত। আত্ম বোধ না জন্মিলে পরকে ত বুঝা যাইবে কিরূপে? আত্মবোধই মানুষের প্রকৃত মাপকাঠি, পরের কথায় ভাব জাগ্রত হইতে পারে কিন্তু যে ভাবকে যাচাই করিবার প্রকৃত যন্ত্র আত্ম! আপনার ভাবে ভাব গ্রহণ করিবার শক্তি না জন্মিলে সমস্তই বৃথা হইয়া যায়, সমস্তই ভার ফাঁকা,—হুজুক মাত্র, তাহা মুহূর্ত্তের! স্বদেশশ্রদ্ধার, স্বদেশপ্রীতিতেও চাই এই আত্মবোধ,—আপনার ভাবকে মূর্ত্ত সুগঠিত—প্রাণের পরম আনন্দ স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলে মনুষ্যত্ব আমার

সার্থক,—কার্য্য আমার সকল,—সুপথে থাকিয়া সর্ব্ব অভাবের মোচন পথ তখন সুগম, আমার চিন্তা, আমার মনন, আমার কার্য্যকলাপ সকলই যদি হয় আমার আত্মজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত, যেমনটি চাই তেমনি, অনুশোচনার তবে আর কি থাকিতে পারে? তবেই আমি সুখী, শত বাধা বিপত্তি আমার নিকট তুচ্ছ! জ্ঞানে আত্মার অনুভূতি যেখানে সুসংস্কৃত,—অভাবও সেখানে সংস্কৃত,—তাহার মোচনের জন্য আমার প্রচেষ্টাও তথায় সংযত! অনুভূতির সংস্কার, আমার অবস্থার প্রকৃত জ্ঞান যাহাতে জাগ্রত হয় সেই জ্ঞানই হ'ক আমার প্রার্থনীয়! অভাব মোচনের একমাত্র উপায়,—তাহা হইলে আমার স্বভাব সংশোধিত, সংযত হইবে আপনই।

স্বাবলম্বন উন্নতির মূলে।

যে কারণেই হউক যেখানে অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে নিজের অভাব পূরণ করিবার মত সংস্থান নাই, সেখানে পরের সাহায্যের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলে চলিবে না, নিজকে গড়িয়া তুলিতে হইবে যথাসম্ভব আপন কার্য্যের উপযোগী করিয়া। যে দেশে ধনের প্রাচুর্য্য সে দেশে বিলাসিতাতেও ধনাগম হয় সত্য,—ধনীর আয়াস আরামের উপকরণ যোগাইতে এক শ্রেণীর লোকের অন্নের সংস্থান হয় কিন্তু যে দেশ নিরন্ন নির্ব্বস্ত্র তাহার পক্ষে আত্মশক্তির নিরোধ করিয়া পরশক্তির দ্বারা অভাব পূরণের চেষ্টা আশু আরামপ্রদ বলিয়া প্রতীত হইলেও সে আরাম যে দরিদ্রের পক্ষে আকাশ-কুসুম ও তাহার এই নিশ্চেষ্ট ভাবই যে জাতীয় জীবনকে মরণের দ্বারে আনিয়া দেয় তাহা ভারতের এই দুর্দ্দিনে সুপ্রমাণিত। প্রাচুর্য্য যেরূপ মানুষের স্বভাবকে ঢিলা করিয়া দেয়, অভাবে আবার সে সজাগ না হইয়া পারে না। যে দেশে যে অবস্থাতেই হউক পরশক্তিতে নির্ভরতা আরামপ্রদ হইলেও পরিণামে যে শক্তির পরিচালনা অভাবে আরামপ্রয়াসীকে শক্তিহীন করিয়া ফেলে তাহা প্রমাণ ইতিহাস, শীর্ষস্থানে উন্নীত ভারত, রোম, মিসর প্রভৃতি প্রাচীন জাতির পতনের মূলেই কি আত্মশক্তির নিরোধে এই আরামের চেষ্টা নয়? পূর্ব্বপুরুষ মনীষীগণ নিজকে নানা প্রকার কৃচ্ছ্রসাধনে নিয়োজিত করিয়া যে অতুলন শাশ্বত সত্যের সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন, সেই ভূরিসম্পদ ও আধ্যাত্মজ্ঞানের অনায়াসের অধিকারী হইয়া বংশধরগণ যখন আরামপ্রয়াসী

হইয়া পড়িলেন, নিজকে শক্তিমান করিবার প্রয়াসকে আনন্দের উপকরণ রূপে গ্রহণ না করিয়া দুঃখ স্বরূপ বলিয়া যখন তাঁহাদের নিকট বিবেচিত হইল, পরের শ্রমে নিজে পুষ্ট হইবার যখন প্রয়াসী হইলেন, বিলাসিতার পত্তন হইল যখন, তখন হইতেই না অলক্ষ্যে এই জাতীয় অবনতির সূচনা। যে ভূমিতে এক দিন আত্ম উৎকর্ষতা, পরম জ্ঞান লাভের জন্য হইত সর্ব্বস্বত্যাগের পণ, সংসারের সুখ, দেহের আরাম জ্ঞানলাভের জন্য যে স্থানে ছিল তুচ্ছ, সেই স্থানে হইয়া দাঁড়াইল দেহের আরামই চরম লক্ষ্য। সেই কৃষ্ণপক্ষে মহা অন্ধকারে মানুষ আলোকের মহিমা বিস্মৃত হইয়া নিদ্রাকেই শুভকর বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল! কিন্তু বিধাতার নিয়মে আত্মার সত্তায় নিদ্রা কোন কালেই ত হইতে পারে না জীবনের লক্ষ্য। কৃষ্ণপক্ষ জীবনব্যাপী বিধাতার নিয়মেই যখন থাকিতে পারে না। স্বভাবের নিয়মেই মানুষকে একদিন বুঝিতে হয় অমাতে নাই আনন্দ, নির্ম্মল পূর্ণিমানিশিতেও নাই মানুষের ক্ষুধা মিটইবার মত আত্মার খাদ্য, মানুষের প্রাণ প্রার্থনা করে সূর্য্যকরসমুজ্জ্বল দিবা। মন কর্ম্মশীল। মানবের মন আশু আরামে নিদ্রাতুর হইলেও মন কর্ম্ম-অন্তরায় রজনীকে প্রার্থনা করে না; সে জাগ্রত হইয়া দিবালোকের জন্য ব্যস্ত হয়। নিদ্রাবসানে আলস্য আরাম তাহাকে আর তৃপ্তি দিতে পারে না, সে নিজকে সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মে নিয়োজিত রাখিতে চায়, নিজকে গঠিত করিয়া তুলিতে চায় সে তখন সর্ব্বকর্ম্মের উপযোগী করিয়া। ইহাই মানবের স্বাভাবিক বৃত্তি। এই বৃত্তির তাড়নায় না স্বাবলম্বী হইবার প্রবৃত্তি উন্নতিকামী মানব মনে চির বিরাজিত। ঘোর অমানিশার অবসানে স্পার্টা যখন দেখিলেন বিলাসিতার স্রোতে মানুষ একেবারে শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে, কর্ম্মপ্রবৃত্তি, কৃচ্ছ্র সাধনের দিকে একবারে দৃষ্টি নাই। তখন সমাজসংস্কারক কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে পুন জাগ্রত করিবার প্রয়াসে চৌর্য্য-বৃত্তিকেও অবশ্যকরণীয় নীতির পর্য্যায়ভুক্ত করিতে তিলমাত্র দ্বিধা বোধ করিলেন না। আইন বিধিবদ্ধ হইল, কোন বালকই চৌর্য্য দ্বারা আহার সংগ্রহ করিতে না পারিলে তাহাকে অনাহারে থাকিতে হইবে ও সে চৌর্য্য যদি ধরা পড়ে তাহা হইলে অপরাধী বালক গুরুতররূপে হইবে দণ্ডনীয়। স্পার্টায় মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল! মহা সমস্যা! বালকগণকে বাধ্য হইয়া এমন সমস্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইলে যাহাতে আত্মশক্তির, মেধার, কৌশলের ও তীক্ষ্ণদৃষ্টির পরিচালনা আবশ্যক। ইহার ফলে স্পার্টান আবার স্বাবলম্বী

কর্ম্মশীল হইয়া উঠিলেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষী। চৌর্য্য তখন আবার পাল্টাইয়া অপরাধ বলিয়া হইল গণ্য।

ভারতের নিশার অবসান; ঊষার স্নিগ্ধ আলোক দ্বারে দ্বারে উঁকি মারিতেছে; বিহঙ্গ সুমধুর স্বরে বিভুর স্তুতিগীতি গাহিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত; ভারতসন্তান এই শুভ মুহূর্ত্তে নিরলস বসিয়া থাকিবে না, সেও এই কর্ম্ম জীবনে হইবে সফল। তাহার নিজকে আজ এমন ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যে সে হইতে পারে সর্ব্বকার্য্যের উপযোগী। আভিজাত্যের নিদর্শন এতদিন অন্ধকার যুগে ছিল পরমুখাপেক্ষী হওয়া; —পরের সেবা গ্রহণই ছিল আভিজাত্যের লক্ষণ, এখন তাহা পাল্টাইয়া লিখিত হউক,—স্বাবলম্বনেই সর্ব্ব গৌরব। আত্মনির্ভরতাই আত্মউন্নতির ও সর্ব্ব উন্নতির মূল।

বিরোধে জয়েই আত্মপ্রতিষ্ঠা।

অন্ধের জীবনে দ্বন্দ্ব কম, দুঃখ বেশী। পরের উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাহার কাটাইতে হইবে, আত্ম শক্তিতে যাহার চলিবার শক্তি নাই, দৃষ্টি শক্তি হইতে যে বঞ্চিত, তাহার আবার আত্ম অভিলাষ, অনুভূতির উপর জোর দেওয়া চলে না; পরের খেয়ালে, পরের সুখ সুবিধাকে মান্য না করিয়া চলিলে সে অচল; আপনাকে দাঁড় করাইবার প্রবৃত্তিই তাহার জীবনে সাংঘাতিক! সে সর্ব্বদা নমনীয়, ঘাত প্রতিঘাতের প্রবৃত্তি মৃত সে জীবনে, সেই কি তার সুখ? ইহার নামই কি একতা? মিলিয়া মিশিয়া চলা? একতা! একের সত্বাকে একবারে নিষ্পেষিত বিলুপ্ত করিয়া কি হইতে পারে একতা,—দুইই যেখানে অখণ্ড—অখণ্ড হইয়াও এক সেই না একতা—মনুষ্যত্বের বিকাশ মূলের ঐক্য। নতুবা আত্মাকে এরূপে বঞ্চিত করিয়া মানুষ পরপ্রত্যাশী হইয়া হইতে পারে কি কখন সুখী! অভিশপ্ত তার জীবন, অন্ধের চতুর্দ্দিক অন্ধকার,—অসীম দুঃখ! আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিবার শক্তির অভাবে সে মৃতপ্রায়! জীবনে মৃত্যুর আস্বাদ বাঞ্ছনীয় নয় কাহারই। জীবনে সকলই বর্ত্তমান

সমস্ত প্রবৃত্তিই প্রায় সজাগ অথচ পরপত্যাগীকে জীবনে বাধা হইয়া প্রতিপদে খর্ব্ব করিতে হয় আত্মাকে;—বিকাশের দিকে না ঝুঁকিয়া, তাহাকে ঝুঁকিয়া পড়িতে হয় মরণের দিকে—সেই জন্যই না অনেক মনুষ্য জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় দুঃখ।

বিরোধের ভয়ে, দ্বন্দ্বহীন অন্ধ-জীবন কি মানুষের হইতে পারে বাঞ্ছনীয়? অন্ধের নির্ব্বিরোধী জীবন কি প্রকৃতই নির্ব্বিরোধ? যেখানেই জীবন সেখানেই বাঁচিবার প্রবৃত্তি—জয়ী হইবার ইচ্ছা,—জয়যুক্ত হইবার জন্য এ বিরোধ মনুষ্যজীবনে স্বাভাবিক—এ যে আত্ম-প্রতিষ্ঠায় পরমানন্দ লাভের উপায়!

এই বিরোধ হ'ক সর্ব্ব বটে। গৃহে বাহিরে,—সকলেই চেষ্টিত হক আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য—বদ্ধপরিকর হ'ক। চক্ষুষ্মান মানব কেন অন্ধত্বের অভিনয়ে তুষ্ট হইবে—সে যে তাহার পক্ষে স্বভাবের নিয়মে অসম্ভব;

আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্তরায় অহমিকা—আত্মসর্ব্বস্ব ভাব। আত্মসর্ব্বস্বতা আনিয়া দেয় ক্ষুদ্র স্বার্থ,—অন্যকে, শক্তিহীন দুর্ব্বলকে পীড়ন করিয়া বড় হইবার প্রবৃত্তি,—সে-বড় যে বড় নয়,—গৌরবের নয়—রিপুর দাসত্বের অন্যরূপ—অহঙ্কারে লোকে বিমূঢ় হইয়া আত্মার সত্ত্বাকে মোহে আচ্ছন্ন করিয়া মনে করে সে জয়ী! যে জয় জয় নয়—তাহাকে একদিন বুঝিতে হয়—(ভারত যেমন আজ বুঝিয়াছে)—তখন পরিতাপের সীমা থাকে না,—ব্যক্তির স্বার্থকে বজায় রাখিতে মানুষ নিজের অন্তরের প্রকৃত রূপ, ভাবসত্তার বিরাট আত্মীয়তা কিরূপ বিস্মৃত হইয়া নিজকে বঞ্চিত করে সীমায় পৌছিয়া তখন তাহা বুঝিতে পারে। তখন প্রাণ কাঁদিয়া উঠে সেই বিরাট মানবিকতার জন্য। মনুষ্যত্বের গৌরব রক্ষা করিতে সে প্রার্থনা করে মনুষ্যত্বের সম্মান—মনুষ্যের জ্ঞাতিত্ব—গতি হয় তখন সরল, দ্বন্দ্বহীন হইবার জন্য আত্মায় আত্মায় সমতা। মৈত্রী প্রেম প্রাণের প্রকৃতি প্রকাশিত হইয়া পড়ে! কোথায় আর থাকে তখন তুচ্ছ স্বার্থ—মরিয়া হইয়া মারিয়া বড় হইবার ইচ্ছা।—আপনার ভাবে সে বিরাজ করে স্বরাজে,—সকল যুদ্ধের অবসানে সে হয় সর্ব্বজয়ী। আত্মে দেখে সে পরমাত্মা, স্বার্থক তাহার মনুষ্যজন্ম,—মনুষ্য ধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ। অমৃতের পুত্রের সে কি কম আনন্দ!

কার্পাস চাষ।

—:•:—

পাটের পরিবর্ত্তে কার্পাস চাষের উপদেশ অনেকেই দেন কিন্তু ইহা কতদূর সমীচিন তাহা তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। নানা কারণে পাটের দর বর্ত্তমানে কমিয়া গিয়াছে ইহা হইতে আমরা আর পূর্ব্বের ন্যায় লাভবান্ হইতেছিনা; অপর পক্ষে আমাদের তুলার যথেষ্ট অনটন,—সুতরাং এখন পাটের পরিবর্ত্তে কার্পাস উৎপন্নের চেষ্টা হওয়াই শ্রেয় এই বোধহয় তাঁহাদের যুক্তি ও উক্তির মূলে। কার্পাস প্রচুর পরিমাণে বঙ্গে বর্ত্তমানে উৎপন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয় হইলেও পাটের পরিবর্ত্তে কার্পাসের আবাদ করণীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। পাট ও কার্পাস চাষের মধ্যে সাদৃশ্য এত অল্প যে একটির পরিবর্ত্তে অন্যটির বপন চলে না। ধান্য ও পাটে বরং পর্য্যায়রোপন চলে কিন্তু পাটের উপযোগী জমীতে কার্পাস উৎপন্ন করা কঠিন কারণ কার্পাসের জন্য উচ্চ জমী আবশ্যক। যে জমীতে বর্ষার জল জমে, তাহাতে কার্পাসবৃক্ষ বাঁচে না, উহার গোড়ায় জল জমিলেই মরিয়া যায়। পক্ষান্তরে পাট উপযুক্ত সার পাইলে উচুঁ জমীতেও হয় সত্য কিন্তু নিম্ন জমীতেই উহার আবাদের কোন বাধা হয় না। পাট একবার মাথা তুলিতে পারিলে উহার গোড়ায় জল জমিলেও কোন ক্ষতি করিতে পারে না। উত্তরবঙ্গে বিশেষতঃ নিম্নভূমি পূর্ব্ববঙ্গে সচরাচর দোলা জমীতেই বেশীর ভাগ পাটের আবাদ হইয়া থাকে এমন কি বর্ষা আসিলেও কৃষকগণ জলে ডুবিয়া পাট কাটে। তাহাতেও পাটের কোন ক্ষতি হয় না।

আর কার্পাস বৃক্ষের মূলে বন্যার জল জমা ত দূরের কথা বর্ষণ বারি যদি জমে, বা ক্ষেত্র খুব স্যাঁত স্যাঁতে হয় তাহা হইলেই উহা মরিয়া যায়। সুতরাং পাটের জমীতে কার্পাস চাষ চলিবে না ইহা অপেক্ষা বরং যদি প্রত্যেক গৃহস্থ তাঁহার বাড়ীতে উচ্চ স্থানে দশ পনোরটী করিয়া কার্পাস বৃক্ষ রোপন করেন তাহা হইলে মাঠকে মাঠ কার্পাস রোপন অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যাইবে ইহাতে আয়োজনেরও আবশ্যক হইবে না অথচ গাছগুলিকে যত্ন করিলে ছোট খাট গৃহস্থের এক বৎসরের বস্ত্র বয়নের উপযুক্ত বাজা বাড়ী হইতেই পাওয়া যাইবে। আমাদের দেশী জল বায়ু সাধারণতঃ আর্দ্র, এই জন্য বাঙ্গলা কার্পাস চাষের ঠিক উপযুক্ত নয়,

কিন্তু যদি উপযুক্ত সার দেওয়া হয় ও যাহাতে গাছের গোড়ায় জল না জমে সেদিকে দৃষ্টি রাখা যায় তাহা হইলে বাঙ্গলারও কার্পাস গাছ সতেজ হয় ও প্রচুর পরিমাণে তুলা প্রদান করে। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমাদের কোন বন্ধু দুইটী ইজিপ্সিয়ান তুলার গাছ রোপন করেন। বৃক্ষ দুইটী এখনও প্রচুর পরিমাণে তুলা দিতেছে। এই তুলা বেশ শুভ্র ও আঁশও সরু ও লম্বা।

গ্রীষ্ম ঋতুতে বৃষ্টি হইবামাত্রই তুলার চাষের জমী প্রস্তুত করিতে হয়। উঁচু জমীতে যাহাতে বৃষ্টির জল না জমে তাহার ব্যবস্থা করিয়া খুব গভীরভাবে চাষ করিবে। যদি বাড়ীতে কার্পাস বীজ বুনিতে হয় তাহা হইলে অন্ততঃ দুই হাত পরিমাণ গভীর করিয়া গর্ত্ত খুঁড়িয়া উহা গোবরের সার দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিবে। তুলার মূল মাটীর নীচে অনেক দূর পর্য্যন্ত যায় সুতরাং তুলার চাষের জন্য জমী যত গভীরভাবে খনন করা হয় ততই ভাল। প্রতি তিন বিঘা জমীতে এক শত পঞ্চাশ হইতে দুই শত মণ গোবর সার দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত উহাতে তিন হইতে চারি মণ হাড়চূর্ণ ও দশ মণ পরিমাণ চুণ প্রয়োগ করিলে আরও ভাল ফল পাওয়া যায় কিন্তু ইহাতে এত খরচ যে কার্পাসের চাষই একমাত্র অবলম্বনীয় যাহাদের নয় তাহারা এত খরচ করিয়া লাভবান হইতে পারিবে কিনা সন্দেহ। এই জন্য কেবল গোবরেপ সার দিয়াই আমাদিগকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে। যে সমস্ত গাছ পূর্ব্বে রোপন করা হইয়াছে তাহাদের গোড়ার মাটী আলগা করিয়া দিলে ও সার প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়।

বর্ষা অথবা শরৎ কালে তুলার বীজ বপন করা যাইতে পারে। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম ভাগ 'খরিফ' অর্থাৎ বর্ষা-কালের তুলা বপনের পক্ষে উৎকৃষ্ট সময়। কিন্তু এই সময়ে জলবায়ু বপনের পক্ষে অনুকূল হওয়া দরকার। বপন করিবার পূর্ব্বে তুলার বীজগুলিকে গোবরের সার ও বালির সহিত মিশ্রিত করিয়া বড় এক খণ্ড পাথরের উপর অথবা ঘরের শক্ত মেঝের উপর ঘষিতে হইবে। এপ্রকার করিবার তাৎপর্য্য এই যে তাহা হইলে বীজগুলির উপরে পশমের মত যে আবরণ আছে তাহা উঠিয়া যাইবে ও জমীতে বপন করিবার সুবিধা হইবে এবং বীজগুলি হইতে সহজেই সমানভাবে চারা বাহির হইতে পারিবে। সন্ধ্যার সময় বীজগুলিকে এইভাবে প্রস্তুত করিয়া সমস্ত রাত্রি রাখিয়া তৎপরদিন প্রাতে বপন করিতে হইবে।

আমেরিকা দেশের লম্বা-আঁসযুক্ত তুলার বীজ দুই হাত ব্যবধানে সারি করিয়া প্রত্যেক সারিতে আধ হাত অন্তর বপন করিতে হইবে। চারা গজাইবার পর আড়াই হাত হইতে তিন হাত অন্তর এক একটী চারা রাখিয়া বাকীগুলি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। বপন করিবার এক সপ্তাহ মধ্যেই বীজগুলি গজাইয়া উঠিবে। যখন চারাগুলি এক ফুট প্রায় (তিন পোয়া হাত) উচ্চ হইবে তখন চতুর্দ্দিকের মাটী দিয়া উহাদের গোড়া আলি বান্ধিবার মত বান্ধিয়া দিতে হইবে। সাধারণতঃ এই প্রকার আলি দুইবার বান্ধিয়া দেওয়া দরকার। এরূপ করিলে বৃষ্টির জল আর গাছের শিকড়ে না বসিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরের দিকে বহিয়া যাইবে। জমী হইতে সর্ব্বদা আগাছা নিড়াইয়া ফেলিতে হইবে এবং চতুর্দ্দিকের মাটির ভিতরে যাহাতে বাতাস প্রবেশ করিতে পারে এরূপ ভাবে আলগা করিয়া দিতে হইবে।

যদি বীজ জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমভাগে বপন করা যায় তবে ভাদ্র মাসের শেষার্দ্ধে গাছে ফুল হইয়া কার্ত্তিক মাসের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সপ্তাহেই ফলগুলি পাকিয়া তুলা সংগ্রহের উপযুক্ত হইবে। এই প্রকার তুলা সংগ্রহ কিছু দিন অন্তর অন্তর মাঘ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে। প্রাতঃকালে রৌদ্র উঠিবার পর যখন গাছ হইতে হিম দূর হইবে তখনই তুলা সংগ্রহ করিবার উপযুক্ত সময়। তুলা সংগ্রহ করিবার সময় বিশেষ সাবধান হইতে হইবে যেন শুষ্ক ফুল অথবা পাতার কোন অংশ উহার সহিত সংলগ্ন না থাকে। বৈকালে তুলা সংগ্রহ করিলে পরিষ্কার ভাবে তুলা সংগ্রহ না হওয়ার সম্ভাবনা।

তুলার বীজ সংগ্রহ করিতে হইলে বীজগুলি তুলা হইতে হাতে ছাড়াইয়া লওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। এমন কি 'কেড়কা' দ্বারা ছাড়াইলেও বীজগুলির অত্যধিক ক্ষতি হইয়া থাকে।

পরিষ্কার এবং রৌদ্রযুক্ত দিনে যথেষ্ট পরিমাণে জমীতে রস পাইলে গাছগুলি শীঘ্র বড় হইয়া থাকে। গাছগুলি বড় হইবার সময় যদি অনবরত বৃষ্টি হইতে থাকে তবে তাহাতে গাছের ক্ষতি হয়। বঙ্গদেশে তুলা চাষের সফলতা সম্পূর্ণ উপযুক্ত জলবায়ুর উপর নির্ভর করে। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের বৃষ্টিতে ইহার সমূহ অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা এবং ফলও খুব কম উৎপন্ন হয়। সুতরাং শরৎ ও শীত কালে বৃষ্টি না হইলে এ দেশে তুলার চাষ ভাল হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশে যে সমস্ত বিভিন্ন জাতীয় তুলা পাওয়া যায় বঙ্গীয় কৃষিবিভাগে তাহার পরীক্ষা হইতেছে। কোন্ জাতীয় তুলা বঙ্গদেশে আবাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাহা এখনও স্থির হয় নাই। বিগত দুই বৎসরের পরীক্ষার ফলে ইহা জানা গিয়াছে যে বুড়ী, কম্বোডিয়া এবং ধারওয়ার জাতীয় যে তিন প্রকার লম্বা আঁসযুক্ত তুলা পাওয়া যায় তন্মধ্যে আমেরিকা দেশের যে জাতীয় তুলা ধারওয়ার প্রদেশের জলবায়ু সহ্য করিতে সক্ষম হইয়াছে তাঁহারই ফলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

কুচবিহার পল্লী।

——:০:——

(বালকের রচনা)

নগরের প্রাসাদ, সুন্দর গৃহ, স্কুল, কলেজ, আফিস, আদালত,—প্রমোদাগার, উদ্যান সকলেরই মূলে পল্লী! অথচ পল্লী আঁধারে—নগর আলোক! কিন্তু নগরের আলোক বাহ্যিক,—দেশের প্রকৃত অবস্থা জানিতে হইলে পল্লীজীবনী অবগত হওয়া প্রয়োজন।

কুচবিহারের পল্লীতে হিন্দু মুসলমান দুই জাতির বাস! ইহাদের পরস্পরের ভিতরে নিবিড় মমতা বিদ্যমান! সুখে দুঃখে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল! কি কৃষিকার্য্যে কি বাণিজ্যে ইহারা পাশাপাশি কার্য্য করিয়া থাকে! বালক যুবক বৃদ্ধ এক ক্ষেত্রে মিলিত হইয়া কার্য্য করে! দিবসের কার্য্যান্তে নিশাসমাগমে প্রতিবেশীর গৃহে গমন করিয়া কত সুখদুঃখের কথা আলোচনা করিতেছে! হিন্দুগণ নিমন্ত্রিত প্রতিবেশীর জন্য সুন্দর বন্দোবস্ত করিতেছেন ওদিকে মুসলমানগণও নিমন্ত্রিত প্রতিবেশী হিন্দুগণের জন্য কোন নিষ্ঠাবান হিন্দুর বাড়ীতে আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছেন! বারুণীর দিন কত হিন্দু যুবক বালক মনোনীত প্রতিবেশী মুসলমান যুবক বা বালককে টানিয়া লইয়া যাইতেছে—নদীতীরে তাহাদের প্রথানুযায়ী সখ্যতা-সূত্রে বদ্ধ হইতেছে! এই প্রথার নাম—"সখী পাতা"। কত হিন্দু গৃহিণী যুবতী, প্রতিবেশী মুসলমান গৃহে গমন করিয়া জাঁকজমক করিয়া মুসলমান

গৃহিণীকে সখী বলিয়া বরণ করিতেছে! হিন্দু মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে দাদা, আজু, কাকা প্রভৃতি সম্বোধনে আহ্বান করিতেছে। শিক্ষিত হিন্দুসন্তানগুলি আজকাল তাহাদের ঠাকুরদাদার বয়সের গণ্যমান্য মুসলমানকেও নাম ধরিয়া ডাকে! এইখানেই শিক্ষিত ও কুচবিহার পল্লীর অশিক্ষিত লোকদিগের ভিতরে কত পার্থক্য!

এই দুইটী প্রতিবেশী মমতাশীল জাতির—ধর্ম্ম, সংস্কার, আচার ব্যবহার ভিন্ন, আদর্শ ভিন্ন—বিশ্বাস ভিন্ন!

বহু কাল হইতে মুসলমানগণ এ রাজ্যে বাস করিয়া আসিতেছেন, বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ও স্বনামধন্য মুসলমান নরপতি হোসেন সাহের রাজত্ব কালে (১৪৯৩-১৫১৮) মুসলমানগণ সর্ব্বপ্রথম কুচবিহারে আসেন, তারপর ক্রমশঃ দক্ষিণ-বঙ্গ ও বাঙ্গালার পশ্চিম-প্রান্ত হইতে বহু মুসলমান পরিবার কুচবিহারে আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতেছে। এইরূপ বহু মুসলমান-পরিবারের কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলেই বিশ্বাস করে যে তাহারা অন্যস্থান হইতে আসিয়া এই কুচবিহারে বাস করিতেছে—প্রতিবেশী অশিক্ষিত অজ্ঞ দরিদ্র মুসলমানগণও তাহাদের বিশ্বাসকে প্রকৃত বলিয়া মনে করে! আমি নিজেই অনেকের বংশ-তালিকা দেখিয়াছি! সুদূর আজমীর হইতে কেহ কেহ এই কুচবিহারে আসিয়া বাস করিতেছেন!

বহুদিন অশিক্ষিত অবস্থায় থাকিয়া এবং প্রতিবেশী হিন্দুগণের সহিত বাস করিয়া, কতকগুলি মুসলমান ইস্লামের মূল বিশ্বাসগুলি ভুলিয়া গেল! তাহাদের ইমান টুটিয়া গেল। ইস্লামের প্রভাবে একদিন ভারতে যেমন একেশ্বরবাদমূলক বহু নূতন সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল—কুচবিহারে অধিক সংখ্যক হিন্দুর ভিতরে বাস করিয়া এইরূপে কতকগুলি মুসলমান অদ্ভুত হইয়া পড়িল। ইহারা না মুসলমান—না হিন্দু!

মুখে বলে আল্লারছুল! বিপদ আপদ আসিলে আল্লাকে বিদায় দিয়া নানা অপদেবতা, আপ-পীরের পূজা করিয়া থাকে! ফলে বর্ত্তমানে কুচবিহারের মুসলমান দুই দলে বিভক্ত! একদলের নাম ফরাজী—অপর দলের কারাজী! দুই দলে ঘোর শত্রুতা!

ফরাজী :—

প্রতিবেশী হিন্দুদের মধ্যে উৎসবাদিতে গান বাজনা প্রচলিত আছে! লবকুশ, কৃষ্ণলীলা, বিষহরি, ময়নামতী, প্রভৃতি নাটক বা যাত্রাদল আছে! অশিক্ষিতের ভিতরে হিন্দুগণ এইরূপে

আপনাদের ধর্ম্মের আদর্শগুলি একটু জাগাইয়া রাখিয়াছেন। কতকগুলি দুর্ব্বল হৃদয় মুসলমান এই সকল আনন্দোৎসব দেখিয়া বিচলিত হইল! তাহারাও ঐ আদর্শে যাত্রা নাটকের দল বাঁধিতে লাগিল! ইহাদের সৃষ্টিকে ধন্যবাদ দিতেছি। হিন্দুর নায়ক নায়িকা পরিত্যাগ করিয়া তাহারা সত্যপীর (সত্যনারায়ণ) গাজী, চারিযুগ, ইমাম যাত্রা, সেখ ফরিদ, আসকমুড়ি, মরিচমতী, রহিমসাধু, গুঞ্জরা, দুবলাবালী প্রভৃতি অভিনয়োপযোগী নাটক রচনা করিল!* ক্রমশঃ তাহা মুসলমান সমাজে প্রচলিত হইয়া পড়িল! আমি অতি নিবিষ্টচিত্তে এই সকল গান শুনিয়াছি! গাজীর বৈরাগ্য, ইস্‌লাম প্রচার—অনুজ কালুর ভ্রাতৃভক্তি সত্যপীরের মাতৃভক্তি—অদ্ভুত ধর্ম্ম, চারিযুগের গভীর ভাব, সেখ ফরিদের ভগবদ্ভক্তি, আসকমুড়ির সাহস্ক্রতা, রহিম সাধুর গুরুভক্তি—গুঞ্জরার শোচনীয় দুর্দ্দশা, করুণ বিলাপ বড়ই চিত্তাকর্ষক।

ইমানদার মুসলমানগণ এই ধর্ম্মবিগর্হিত যাত্রা নাটকের শ্রোতা, উৎসাহদাতা ও প্রচলনকারিদিগকে একঘরে করিয়া রাখিলেন, ইহাদের নাম দিলেন 'ফয়তেয়া'।

ফয়তেয়াগণ শুধু এই সকল যাত্রা নাটক প্রচলন করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না! বরং ইমানদারদিগকে 'ফারাজী' নামে অভিহিত করিয়া হিন্দুগণের আদর্শে আরও বিবিধ ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল।

ফয়তেয়া ও ফারাজী দুইদলে ঘোরতর শত্রুতা চলিল! এইবার ফারাজীগণ ফয়তেয়াদিগকে কন্যাদান করিতেও অনিচ্ছুক হইলেন। কিন্তু ফয়তেয়াদল এই গুরুতর কার্য্যে সাহসী হইল না! বিবাহাদি উৎসবে মোল্লা মুন্সীর একান্তই প্রয়োজন! কিন্তু মোল্লা মুন্সীগণ ফারাজী দলভুক্ত! তাহারাও যদি কন্যাদানে অস্বীকার করে, তাহা হইলে মোল্লারা বিমুখ হয়! ফারাজীগণ বিবাহাদি উৎসবে, ভোজে ফয়তেয়াদিগকে নিমন্ত্রণ করাও বন্ধ করিয়া দিলেন! ফয়তেয়াদল তাহা করিল না। কিন্তু ফারাজীদল নিমন্ত্রিত হইয়াও তাঁহাদের গৃহে গমন করেনা! যে ফারাজী চোরের মত চুপেচুপে ফয়তেয়াদের নিমন্ত্রণ পালন করে, গ্রামের সর্দ্দার ও সভ্যগণ তাহার জন্য কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন! তাহাকে সকলের

* লেখক এই সকল গান সংগ্রহ করিয়া আমাদের নিকট প্রেরণ করিলে আমরা তাহা সাদরে পরিচারিকায় প্রকাশ করিব। সঃ

সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্বহস্তে কর্ণধারণ করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে হয়। অপরাধ গুরুতর হইল সর্ব্বসমক্ষে মাটীতে গড়াগড়ি দিতে হয়। মাতাপিতাকে যাহারা অপমানিত করে, তাহাদেরও এই শাস্তি। অপরাধ বিশেষে ১০।১৫ টাকা জরিমানা করাও হয়। এই জরিমানার টাকা গ্রামের সর্ব্ব সাধারণের ব্যবহারের জন্য ভোজের বৃহৎ বৃহৎ ডেগ্‌চা, সতরঞ্চ প্রভৃতি ক্রয়ে ব্যয়িত হয়। প্রত্যেক মুসলমানপল্লীতে দুইটী সমিতি আছে। একটী পুরুষদের অপরটী স্ত্রীলোকদের। প্রথমটীর নাম 'বড়পক্ষ'—অপরটীর নাম "ছোটপক্ষ"। ফয়তেয়াদলে 'ছোটপক্ষের' প্রভাব অধিক। ফারাজীদলে এই সমিতির অস্তিত্ব দিনদিন লোপ পাইতেছে।

বিবাহ-উৎসবে সমবেতা স্ত্রীমণ্ডলীর ভিতরে বেশ একটী মিলিত শক্তির অস্তিত্ব অনুভূত হয়। ইহাই 'ছোট পক্ষ'। কোন্ কোন্ স্ত্রীলোক দুষ্টা, দুশ্চরিত্রা, কে কাহার দ্বারা অপমানিতা হইয়াছে—সমবেতাদের ভিতরে কে কে স্বামীকে গালি দিয়াছে—এই সকল কথা ঐ উৎসবাবসরে অতি তীব্রভাবে আলোচিত হইতে থাকে। এই সমিতির নায়িকাগণের কোন কোন পুরুষ-প্রতিনিধি বহির্ব্বাটীতে সমবেত নিমন্ত্রিতবর্গের নিকট ঘোষণা করে—"ছোট পক্ষ বর-পক্ষের নিকট হইতে ৫৲ টাকা মিঠাইয়ের বাবদ দাবী করিতেছেন।" অনেক বাদানুবাদের পর এইরূপে ছোট পক্ষকে কয়েকটী টাকা দেওয়া হয়। আর ছোট পক্ষের ভিতরের আন্দোলন কোন কোন উৎসবে এমন ভীষণ হইয়া পড়ে যে শেষে গৃহকর্ত্তা যুক্তকরে রমণীমণ্ডলীর সম্মুখ দাঁড়াইয়া কৃপা ভিক্ষা করেন। অধিকাংশ বড় বড় ভোজে গৃহকর্ত্তার বহির্ব্বাটীতে ও অন্তর্ব্বাটীতে দুইটী সমিতির অধিবেশন হয়। ফলে নিমন্ত্রিতবর্গকে বাধ্য হইয়া দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিতে হয়। এইসব কারণে আমি এই সকল ভোজন-উৎসবে কদাচিৎ যোগদান করিয়া থাকি।

ক্রমশঃ—

শ্রীফয়েজউদ্দিন আহম্মদ।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)
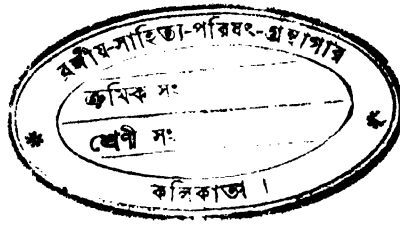
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৬ষ্ঠ বর্ষ। } আষাঢ়, ১৩২৯ সাল। { ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

প্রত্নতত্ত্ব।

অজয়ের তীরে ছোট গ্রামখানি
ভাঙ্গা মন্দির তাতে,
উৎসব হয় বছর বছর
ভাদ্র মাসের রাতে।
নাহি দেব দেবী শূন্য আসন
পাষাণেতে আছে ফুটি'
রমণী হিয়ার দৃঢ়তায় বাঁধা
একটী হাতের মুঠি।

ভাবিলাম আমি হয়ত রমণী
হবে কোনো বীর নারী,
দেখি যদি কোনো নূতন তত্ত্ব
বাহির করিতে পারি।
অজ্ঞাত কোনো ঝান্সীর রাণী
হতে পারে এই সতী,
ক্ষুদ্র পল্লী মিবারের কোনো
নামহীনা কৃষ্ণাবতী।

নব শিক্ষিত গ্রাম্য যুবক
গম্ভীর ভাবে বলে,
ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি রয়েছে
অঙ্কিত শিলাতলে।
স্বভাবসিদ্ধ অজ্ঞতা লয়ে
পূজারী বলিল মোরে
শ্মশান-কালীর মূর্ত্তি জেনেছি
কালিকা-পুরাণ পড়ে।
পূজারীর কথা ধরিল না মনে
সুধাই যাহারে পাই
শেষে বুড়া এক মোড়লের কাছে
পেলাম আমি যা চাই।

বহিল বৃদ্ধ দূর দূর যুগ
অজয়ে আসিল বান,
প্রলয় বন্যা ধুয়ে লয়ে গেল
ধন ধান সাথে প্রাণ।
একটী রমণী ভাসিতে ভাসিতে
লাগে হেতা এক গাছে
শিশুটী তাহার লোহার কড়ায়ে
যতনে শোয়ানো আছে।
দেহে প্রাণ নাই তবুও অটুট
জননীর দৃঢ় মুঠি !
বৃক্ষের শাখে লেগেছে কড়াই
শিশু কাঁদে জেগে উঠি।
মরণ টানিছে এক হাত তাঁর
আর হাত টানে ছেলে,
বিশ্বমাতার অংশ না হলে
এত কি শক্তি মেলে।

করুণ কাহিনী রটি গেল দেশে
ভরে গেল নদী তীর,
মা-হারা শিশুরে দেখিতে হইল
মহোৎসবের ভিড়।

সুদূর শিশুর সংবাদ পেয়ে
এলো আত্মীয় দল,
মাতৃ চিতায় স্থাপে মন্দির
জমাট অশ্রুর জল।
বর্দ্ধমানের রাণীর আদেশে
রাজ-ভাস্কর জুটি'
অমর করিয়া রাখে মর্ম্মরে
মায়ের হাতের মুঠি।
পূজার সময় এ পাষাণ বেদী
ভরে দিতে হয় জলে
দাঁড়ায় গ্রামের ছেলে বুড়া সবে
আসি অঙ্গন তলে।
এটী আমাদের মাতৃতীর্থ
এই মোরা জেনে রাখি
বলিতে বলিতে হ'ল ছলছল
বুড়ার যুগল আঁখি।
ধুয়ে মুছে গেল প্রত্নতত্ত্ব
কার স্মৃতি মনে আসে,
লিখে নিয়ে এনু নব অধ্যায়
বঙ্গের ইতিহাসে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

অবাক্।

(৮)

নিজেকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে দেখিতে বেগম নিজের অজ্ঞাতেই কখন যে নিতান্তই অসতর্ক ভাবে—আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সে জানে না।—যখন চমক ভাঙিল, তখন সরম সঙ্কুচিত চিত্তে অনুভব করিল, ইতিমধ্যেই সেই হাতের চিঠিগুলার মধ্যে খানকতক চিঠি বেগম পড়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছে!—

বেগম অপ্রস্তুত ভাবে একটু হাসিল। কৈফিয়তের সুরে, মনে মনেই বলিল, "কাজটা নেহাৎ-ই ভদ্রতা-বিরুদ্ধ হচ্ছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই পিতৃহীন নাবালক, আর অভিভাবকহীন বিধবার বৈষয়িক-বিপদের কথাগুলো জানতে পাওয়া, আমার পক্ষে বিশেষ কিছু লোকসান-জনক নয়, বরং সাংসারিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পক্ষে কল্যাণকর,—এটা আশা করি চিঠির মালিক-মশাই অস্বীকার করবেন না।"

কিন্তু চিঠির মালিক মহাশয়ের কোন সন্ধানই সেখানে ছিল না। সুতরাং বেগমের যুক্তি তর্কে তাঁহার মাথাব্যথা উৎপাদক কোনও দুশ্চিন্তা ঘটিল কি না সে খবর কেহই জানিতে পারিল না যদিচ, চিঠির মালিকের মাসতুতো ভাই—অর্থাৎ পত্র লেখক ভদ্রলোকটির নাবালক অবস্থায় তাঁহার জমিদারীর বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীরা কি সুন্দর দক্ষতার সহিত খাজনার টাকা বাকী ফেলিয়া নাবালক, কলেজের ছাত্র প্রভৃতির বিষয় সম্পত্তির কতকাংশ পাশের গ্রামের জমিদারটির দখল ভুক্ত করিয়া দিয়াছে, সে বিবরণ পড়িতে পড়িতে বেগমের বড়ই কষ্টবোধ হইল এবং তার চেয়েও বেশী কষ্টবোধ হইল যখন বেগম জানিতে পারিল যে উক্ত নাবালকটি শেষে বৈষয়িক গোলযোগের সঙ্কটে পড়িয়া অসময়ে কলেজের পড়া ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন, এবং সেটা না ছাড়া ভিন্ন তাঁহার বিষয় রক্ষার কোন উপায়ই ছিল না। কতকগুলা প্রতারক মানুষের উপরে বিশ্বাসস্থাপন করিয়া, এই নাবালক ছাত্র ও তাঁহার বিধবা জননীর বৈষয়িক ক্ষতি যে কি পরিমাণে হইয়া গিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত হিসাবটা

দেখিতে দেখিতে বেগমের দু চক্ষু জ্বলিয়া উঠিতেই চাহিতেছিল,—কিন্তু তবু বেগমের মন সসম্ভ্রম বিস্ময়ে না ভরিয়া উঠিয়া থাকিতে পারিল না, যখন সে দেখিল সেই ক্ষতির হিসাব আঁকিয়া, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিটি স্বয়ং তার নীচে লিখিতেছেন, "হাজার কতক বার্ষিক আয় নষ্ট হোল, হোক,--ওটা নেহাৎ-ই আমার নসীবে ছিল, না হয় স্বীকার করছি দায়ে পড়ে! কিন্তু যারা অম্লান বদনে স্বচ্ছন্দে আমাদের ঠকিয়ে চলে গেল, তাদের নৈতিক-উন্নতির ব্যবস্থা কিছু করে দেবার পথ পেলুম না,—এইটেই আমার ভয়ানক দুঃখ লাগ্‌ছে হে! বল তো ভাইজি, বাধা না পেলে, এই অন্ধ একজ্ঞায়ীর দল কি চরম অধঃপতনের শেষ সীমায় না পোঁছে ছাড়্‌বে?—এদের মনুষ্যত্বকে এরা কিসের দামে বিক্রী করছে,--সে হিসাবের দিকে এদের অনুভব-শক্তি যে কতখানি অচেতন হয়ে রয়েছে, সেটা ভেবে দেখ্‌তে গিয়ে, বাস্তবিকই আমার বুকে দরদ লাগ্‌ছে!—আমার বৈষয়িক ক্ষতিটা তার কাছে তুচ্ছ!"

কথাটা হয় তো খুব বড় কথা না-ও হইতে পারে, কিন্তু কি অবস্থায় দাঁড়াইয়া, ভদ্রলোকটি ঐ কথাটি বলিতে পারিতেছেন,—সেই অবস্থাটা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। বেগমের মনে হইল,—তাহার জীবনের পক্ষে আজকার দিনটা একটা বিশেষ রকম 'তাক্-লাগিবার' দিন!.........কোনও পরিচিত মানুষের আচরণে এতখানি শ্রদ্ধাপূর্ণ বিস্ময়-রহস্য বোধ করিবার অবসর তাহার সমস্ত জীবনটায় আর কোন দিন ঘটে নাই!—অন্ততঃ এ রকম নয়!

অন্যমনস্ক চিত্তে বেগম খানিকটা ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া থাকিয়া,—তারপর অন্য চিঠিগুলা খুলিয়া একে একে পড়িতে আরম্ভ করিল। বৈষয়িক ব্যাপার সম্বন্ধে সংবাদ ভরা চিঠিগুলার তারিখের প্রায় এক বৎসর পরের তারিখে এ চিঠিগুলা লেখা হইয়াছে:—

এলাহাবাদ,

১৩—৭—১৯১৪।

সালাম্,

সাবাস্ ভাইজি!—তোমার ওকালতী বিদ্যেখানা দেখে বাস্তবিকই অবাক্ হয়ে গেলুম! বলি, ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে, অকর্ম্ম কুকর্ম্ম সাধনের স্থান আর কোথাও পেলে না,--চুটিয়ে কোপ্ বসাতে উদ্যত হলে এই গরীবের গর্দ্দানের ওপর?—

হাঁ, আমি এবার অত্যন্তই চটেছি! এবং চুটিয়ে শোধ নেবার জন্য, তোমার ব্যবসাটাকে এবার আমি মুক্ত কণ্ঠেই গালাগালি দিতে বদ্ধ-পরিকর হয়েছি। কারণ, হিতাকাঙ্ক্ষী বড় ভাই তুমি,—তোমার বিচার শক্তির মধ্যে গোলযোগ দেখলে, তোমার ব্যবসায়িক পদমর্য্যাদার চরণেই, খুশী হয়ে ঘুসীর পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করতে আমি বাধ্য! যে হেতু আমি ছোট ভাই,—আমার হাতের নাগাল তার ওপরে পৌঁছানো দুঃসাধ্য!

তোমার অবিচার দেখে আমি, বাস্তবিক আশ্চর্য্য হয়ে গেছি!—বৈষয়িক-স্বার্থের অনুরোধে, বিবাহ সংঘটন করাবার—এমন উপাদেয় মন্ত্রণা, হঠাৎ তোমার মাথায় এল কি করে? আফিং টাফিং ধরেছ না কি?

যে লোক আমার দুঃসময়ে আমার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদের ছলে বলে বশীভূত করে আমার সঙ্গে সাংঘাতিক দাগাবাজী করে নিয়েছেন,—আমার ভবিষ্যৎ-উন্নতির পথটি পর্য্যন্ত মেরে দিয়েছেন, এখন পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে অপ্রকাশ্য-দুস্মনী চালাচ্ছেন,—আমায় আজ জামাই হতে হবে, তাঁর! খুব সুযুক্তির কথা বটে! বৈষয়িক পদ মর্য্যাদার মিলনটা অযোগ্য হতে পারে, তা অবশ্য বলছি না, জমিদারের ছেলে, জমিদারের মেয়ে,............'পরিচয় দেবার উপযুক্ত সম্বন্ধ'—তোমার কথায় আমিও সায় দিচ্ছি। কিন্তু ঐ "টাইরাণ্ট" স্বভাবের উৎকট-এ্যারিষ্টক্রেট্ জমিদার মহাশয়ের উপযুক্ত দুর্দ্দান্ত প্রতাপ জামাই হবার ক্ষমতাটা আমার আছে কি না,—সেটা ভেবে দেখেছ? ....না, বিয়ের পর পূজ্যপাদ গুরুজন মশাইটির ইতরামির অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হয়ে, যখন আমাকে.........।

কিন্তু "ফাঁসির পর বিচার" করবার সুযোগ তোমায় দিতে আমি রাজী নই।—আমি বিচারটা চাই,—সকলের আগে।

জমিদার-কম্যাটির' ভাল মন্দ সম্বন্ধে আমি কোন্ আপত্তি বিপত্তির কথা তুলতে সাহসী নই, কারণ তাঁর সম্বন্ধে এলাহাবাদের রাজপথের ওই এক্কাওলাটা যতটা খবর জানে,—আমিও জানি বোধহয় ঠিক ততটা। তাঁর রং সোনার মতই হোক, আর হীরের মতই হোক,—চাই কাঁচা কয়লার মতই হোক, আমার কোন দুঃখ নাই।—দুঃখ এই, আমি তাঁদের সঙ্গে সংশ্রব রাখবার অযোগ্য!—তা সে যত বড়ই বৈষয়িক স্বার্থের অনুরোধ থাক্ না,—কোন জমিদারের 'প্রবল প্রতাপ' জিনিসটাকে বা 'মহল মজকুর'টাকে আমি বিয়ে করতে রাজী নই!

Edgar Rice Burroughs সাহেবের Tarzan বাবাজীর অলৌকিক লীলাখেলার বইগুলা আনিয়ে ক' দিন থেকে পড়্ছি, আজ Jungle tales of Tarzan উপন্যাসের প্রথম চ্যাপ্টারে মনোযোগ করেছি, এমন সময় তোমার মধুর পত্রখানা এসে,—ব্রহ্ম-রন্ধ্রে ভূমিকম্প গোছ একটা ব্যাপার জাগিয়ে তুল্লে! কিন্তু এ চ্যাপ্টারে কি পড়লুম জানো? জংলী কাহিনীর রসান গুলো বাদ দিয়ে সার তত্বটাই এক নিঃশ্বেসে চট্ করে বলছি। ব্রিটিশ লর্ড সন্তান টার্জন জঙ্গলবাস কালে একদা একটি জংলী 'এপ' মহিলাকে (যদিও তিনি কাল লোম ঢাকা, পুচ্ছহীন বৃহৎ বানর বা গরিলা আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট একটি 'মোহন মুরতি'—) সঙ্গিনী রূপে পাবার জন্যে বড় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। দৈব দুর্ঘটনায় মহিলাটির উপযুক্ত আর এক 'এপ' মহাপুরুষ আবির্ভূত! দুই বীরে তখন খাম্চা খাম্চি কামড়া কাম্ড়ি রক্তা রক্তি যুদ্ধ,—অনেক—অনেক—মধুর—মধুর জংলী কাণ্ড! (পড়তে দিক্ ধরে যায় অবশ্য!) এমন অনেক কাণ্ড কারখানার পর, যুদ্ধজয়ী টার্জনের পক্ষেই—সেই 'বাঞ্ছিতা লাভ' ব্যাপারটা সহজ হোল। কিন্তু—তারপর রণশ্রান্তি দূর হলে, সুস্থ স্বচ্ছন্দ মনে—সেই কাল লোমের কোট ঢাকা, কমনীয় নারী স্কন্ধের ওপর নিজের লোম লেশহীন ধব্ ধবে শাদা হাতখানা রাখা, মোটেই মানানসই হবে না বলে টার্জন যখন হঠাৎ এক সময় স্পষ্ট বুঝ্তে পার্লে, তখন সে সহসা এক চোট্ হৃদয়বিদারক চীৎকার হেনে, রঙ্গমঞ্চ থেকে বিনা আপত্তিতে বিদায় নিলে। যাবার সময় মৃত্যুগ্রাস গত প্রতিদ্বন্দ্বীটিকে উদ্ধার করে এনে,—তার ওপর অনেকখানি উদার করুণা প্রকাশ করে, তার সম্পত্তি তাকে দান করে গেল। সে ভদ্রলোক তখন চক্ষুলজ্জার দায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন "টার্জন কি অন্য স্ত্রী পেয়েছেন তা হলে?—". উত্তরে টার্জন জবাব দিলে,—(এই জবাবটির জন্য, তার সমস্ত জংলী মূর্খতা গুলো আমি বিনা বাক্যে ক্ষমা কর্তে বাধ্য হলুম)—যে "না, মানুষের জন্য ঠিক সেই রকম মানুষী চাই। (কিন্তু হায়! এ্যাফ্রিকার জঙ্গলে তখন টার্জন ছাড়া অন্য শাদা মানুষের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই।) সিংহের জন্য যখন সিংহিনী, বাঘের জন্যে যখন বাঘিনী, হরিণের জন্যে যখন হরিণী, বাঁদরের জন্যে যখন বাঁদরী,.. "For all the beasts and the birds of the jungle is there a mate. Only for Tarzan of the apes is there none. 'Taug' (সেই প্রতিদ্বন্দ্বী ভদ্রলোক)

is a ape. Teeka (সেই ভদ্র মহিলা) is a ape, Go back to Teeka. Tarzan is a man. He will go alone."

আজ তোমাদের উদ্দেশে বিনীত ভাবে ঐ উক্তিটা ফিরিয়ে দিয়ে আমিও টার্জ্জনের ভাষায় সবিনয়ে বলছি,—'অনুগ্রহ করে আমাকেও সুতরাং একা চল্‌তে দাও !—

আশা করি এই বদ্‌খৎ বিয়ের সম্বন্ধটার পরমায়ু লোপ করবার পক্ষে, আমার নিদান শাস্ত্রোক্ত এই মুষ্টিযোগটাই যথেষ্ট হবে, কি বল ? আম্মাকে থামিয়ে দাও,— দাদা আমার ! তুমি চমৎকার সদাশয় লোক, এই কাযটি কর। নইলে স্বস্তিতে বাড়ীতে তিষ্ঠুতে পারব না, সে পাপটা তোমারি লাগ্‌বে জানলে ? মাতার চোখের জল, আমি সইতে পারিনে,— পারিনে ! বাঁচাও আমায় !—

আজ এই পর্য্যন্ত। এখানকার সব ভাল। তোমাদের কুশল লিখো। ছেলেদের সর্দ্দিজ্বর সেরেছে ? আম্মা তাদের খবরের জন্যে ভাবছেন, শীঘ্র চিঠি দিও। আদাব।

ইতি—

"তোমারি মন্নু।"

চিঠি পড়িয়া বেগম এবার বিরক্তি ভরে ভ্রূকুঞ্চিত করিল। দেশটার জল হাওয়ার গুণ কি চমৎকার !—সকল ঘরের সকল ছেলে মেয়ের সব অভিভাবকগুলির দুঃখ দুশ্চিন্তার যত কিছু কারণ—সে কেবল ঐ একটা যা হোক্‌ তা হোক্‌—উদ্ভুট্টে, উৎকট, রকমের বিবাহ ঘটানু ব্যাপারে ? ছেলে মেয়েদের জীবনের আর কোন দিককে তাঁহারা আদৌ লক্ষ্য করিতে চাহেন না, তাঁহারা চাহেন শুধু সকাল সকাল বিবাহের ভোজ !—ছেলে মেয়েরা তাহাদের; ভাবিবার মাথা, বুঝিবার হৃদয়,—এবং কায করিবার হাতগুলির শক্তি সামর্থ্যের কি উৎকর্ষ সাধন করিতেছে, কোন উন্নতি, কোন যোগ্যতা, কোন মনুষ্যত্ব লাভের জন্য নিজেকে কে কোন পথে চালাইতেছে—তার কোন সংবাদই কেউ রাখিতে চাহেন না, শুধু যে রকমেই হোক, বিবাহটা চট্‌পট্‌ সারিয়া দিতে পারিলেই সবাই নিশ্চিন্ত ! তারপর অযোগ্য দম্পতি, অসমর্থ অবস্থায়, বহু বহু অযোগ্য সন্তান ভারে প্রপীড়িত হইয়া যত পারে দুঃখভোগ করুক,— তখন তাহার খোঁজ লইবার জন্য কোনও হিতাকাঙ্খীর কিছু মাত্র সন্ধান পাওয়া যাইবে না।—কি চমৎকার মুরুব্বি-আনা প্রথা, আর কি সুন্দর বিবাহ-পদ্ধতি।

বেগম অনেকগুলি অযোগ্য-বিবাহের শোচনীয় পরিণাম স্বচক্ষে দেখিয়াছে। অযোগ্য অবস্থায় বিবাহ সম্পাদন ব্যাপারটার বিরুদ্ধে তাহার মন তীব্র বিতৃষ্ণায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। রান্নার কাযে দাঁড়ানো এবং আঁতুড় শয্যা বিছাইয়া বসিয়া থাকা ছাড়া যাঁহার জীবনে আর কোন কায করিবার প্রয়োজন হয় নাই, বা অবসর জুটে নাই,—এমন নারী সে অনেক দেখিয়াছে,—ইঁহাদের শারীরিক শক্তি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু মানসিক উন্নতির উৎকর্ষতায়?—বেগম নিপুণ মনোযোগ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে, দু একটি ক্ষেত্র ছাড়া বাকী সকল ক্ষেত্র,—এবং সে ক্ষেত্রের ফলগুলি সমস্তই দারুণ হতাশজনক! সে দুঃখের দায় ধাক্কা যাঁহাদের ভোগ করিতে হয় না, তাঁহারা স্বচ্ছন্দ-সন্তোষে, যা খুশী তাই বলিতে পারেন,—কারণ কার্যাক্ষেত্র হইতে দূরে দাঁড়াইয়া মনের আরামে বক্তৃতা উপদেশ দেওয়া বাস্তবিকই বড়ই সহজ কথা। কিন্তু সে পাপের অংশিক ফলও যাহাকে ভোগ করিতে হইয়াছে, সে জানে,—অযোগ্য-বিবাহের, যথেচ্ছাচারের, পরিণাম কি মর্ম্মন্তুদ!

পুরুষদের যোগ্যতার ওজন যাচাই সম্বন্ধে রং বেরং'-এর কষ্টি-পাথর ও দাঁড়িপাল্লা হইতে নিক্তির ওজন পর্যান্ত যে ভাবে চলিতেছে, তাতে বেগমের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চার অপরাধের হাড়কাঠে মাথা না দেওয়াই ভাল! বিশেষতঃ সোফিয়া শুনিলে নিশ্চয়ই রাগিয়া যাইবে, সুতরাং সে বিপদকে ডাকিয়া কায নাই। কিন্তু লম্বায় চওড়ায় খানিকটা বড় হইলেই যে মানুষ মাত্রেই বিবাহজীবনের যোগ্য হইয়া উঠে,—এ কথাটা স্বীকার করিতে বেগম আজ ভয় খায়!—কারণ, এই বয়সেই এমন গুটিকতক মানুষের আকৃতি প্রকৃতির চেহারা তাহার চোখে পড়িয়াছে, যাঁহাদের—অসময়ে অযোগ্য বিবাহ করার ফল দেখিয়া—এই কথাটাই গভীর বেদনার সহিত বারে বারে তাহার মনে পড়িয়াছে, যে এই লোকগুলি এমন ভাবে বিবাহিত-জীবনে না ঢুকিয়া যদি চিরজীবন অবিবাহিত থাকিতেন, তবে তাঁহাদের নিজের, ও চার পাশের আত্মীয়দের (এবং বোধ করি সূক্ষ্মভাবে হিসাব করিলে, সমস্ত পৃথিবীটার শুদ্ধ)—যৎকিঞ্চিৎ মঙ্গল করিবার অবকাশ পাইতেন! বেগম অনেকবার ইহাই ভাবিয়াছে, এবং তাঁহাদের কথা মনে পড়িলে আজও সে ইহা ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারে না।

আজ—এই পত্রলেখক লোকটির অবস্থার পরিচয়ে সে একদিকে যেমন বিষণ্ণতা-বোধ করিল, অন্যদিকে লোকটির মনের বলের পরিচয় পাইয়া সে তেমনি গভীর শ্রদ্ধা বোধ করিল!

হায় রে, এমন উচ্চ পথের পথিককে, সাধনপথে উৎসাহ দিবার মত সহৃদয় আত্মীয় জোটে না!—জোটে শুধু বাধা দিবার, দরদী!

উন্মনাভাবে খানিকটা নিস্তব্ধ থাকিয়া, বেগম অন্যান্য চিঠিগুলা দেখিতে লাগিল। এ-গুলায় ভদ্রলোকের নিজের কথা একটাও নাই। দেশের গরীব শ্রমজীবি ও কৃষি-তত্ত্বের উন্নতির জন্য, দেশের মানুষদের এখন কোন কোন বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য,—যথেষ্ট চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়া তিনি সেই সব বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। গরীবদের জন্য, লোক-দেখানে দরদ প্রকাশে তাঁহার উৎসাহ নাই,—কিন্তু ইহাদের আর্থিক,—এবং শরীর মন আত্মার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির উপায় বিধান করিবার চেষ্টায়—এই লোকটি এমন একটা অকপট আন্তরিক আগ্রহের ব্যথা অনুভব করিতেছেন, বোঝা গেল,—যে বেদনাবোধের সামনে ভক্তি ভরে নতশির হইতেই বেগমের ইচ্ছা হইল।

এই আলোচনার প্রসঙ্গে তিনি দেশের বুদ্ধিমান যুবকদের আমেরিকা প্রভৃতি পাঠাইয়া বিভিন্ন শ্রেণীর কার্যকরী বিদ্যা শিখাইয়া আনিবার কথা তুলিয়াছেন, এবং নিজেও সেই দল ভুক্ত হইয়া আমেরিকা গিয়া, বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কৃষি-বিদ্যা শিখিয়া আসিবার, এবং দেশে ফিরিয়া সে জ্ঞানকে কাযে খাটাইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গেই আবার,—যেন বেদনাভরা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ব্যঙ্গভরে পরিহাস করিয়া লিখিয়াছেন,—"কিন্তু সবই হয় তো শেষ পর্য্যন্ত শিয়ালের যুক্তিতে দাঁড়াবে ভাইজি! কারণ জমিদারীর দিক থেকে আমি দৃষ্ট সরালেই,—ওর ওপর শনির দৃষ্টি পড়বে! আমেরিকার মাটীতে পা দিয়েই হয়তো সুসংবাদ শুনব,—ও বস্তু একদম হস্তান্তর হয়ে গেছে! তখন, শিক্ষার ব্যয় জোটানো চুলোয় যাক্, উদরান্নের জন্যেই হয় তো রিভলবারের গুলী ভক্ষণ করা সৎপন্থা ঠাউরে বসব!"

"আমার চারদিকের অবস্থা ভেবে, আজ আমার সব চেয়ে বড় করে কোন অভাবটা বেশী লাগ্‌ছে জানো ভাইজি? সুযোগ্যা জননী না পাওয়ার অভাব!—চম্‌কে উঠো না!—আম্মাকে তোমরা বিলক্ষণ রকমেই জানো, স্নেহ, মমতা, দয়া মায়ায় তিনি শাপভ্রষ্টা দেবী,—এমন জননীর সন্তান হয়ে জন্মেছি বলে আমি গৌরব বোধ করি,—আর এও আমি কৃতজ্ঞ নত চিত্তে স্বীকার কর্‌ছি,—আমার মধ্যে যদি কিছুও এতটুকু ভাল থাকে, তবে সে আমারি

আত্মার সদ্‌গুণের ফল!—কিন্তু আমার মধ্যে এই যে ভয়, উদ্বেগ, আলস্যের দুর্ব্বলতা বাসা বেঁধে রয়েছে,—যে দুর্ব্বলতা আমার সমস্ত মঙ্গলের প্রতিবন্ধক,—এ দুর্ব্বলতা-ব্যাধি, এ টুকুও আমার ঐ আত্মার কাছ থেকেই পাওয়া!—পুরুষানুক্রমেই আমরা হয় তো জননীদের কাছ থেকে এই উদ্বেগ-ভীরুতার ব্যাধি গ্রহণ করে আসছি,—ঠাওর করবার ফুরসুৎ নেই! (অনুভব শক্তিও অতি প্রখর কি না!) কিন্তু এই জননীর সমস্ত সদ্‌গুণের সঙ্গে,—যদি সাহস সম্পন্না সুশিক্ষিতা আত্মা রূপে আমি আত্মাকে পেতুম, তা হলে শুধু এই আংশিক গৌরব মাত্র নয়,—আমি আজ জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনায় সম্পূর্ণ সফল-ক্রিয়, সৌভাগ্যবান বলে পৃথিবীতে পরিচিত হবার পথ পেতুম! আজ তা হলে পড়াশুনো দেখতে গিয়ে জমিদারী নষ্ট হোত না,—আর জমিদারী দেখার তাগাদায়, দেশের দশের আর নিজের উন্নতির পায়ে কুড়ুল মারবার অনিবার্য্য বাধা উপস্থিত হোত না। আজ বড় অভাবের মুখে পড়েই আমার ভয়ানক আক্ষেপ বোধ হচ্ছে,—এ জননীরা শুধু আঁতুড় ঘরের জন্যেই ছোট ছেলেকে মানুষ করবার শিক্ষা পেয়েছেন। বড় ছেলেকে বড় কার্য্যক্ষেত্রের জন্যে "মানুষ" করবার শিক্ষা এঁদের কৈ?—

রাগ কোর না। আমিও "রক্ষণশীল।" কিন্তু সাময়িক অভাব যে ভাই আমাকে ছেড়ে কথা কইছে না,—মন-রাখা মিথ্যে বলি কোন মুখে?—

মনের অবস্থা কিঞ্চিৎ 'অত্রাহি গোছ' হয়ে উঠেছে। কিছু ভাল লাগছে না,—কি করি কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে। ভেতর আর বাইরের জীবন অতিশয় অশান্তি উৎক্ষেপপূর্ণ লাগ্‌ছে, কি করি বল দেখি?

যুগলের জন্য সালাম্‌। ছেলেদের জন্যে আন্তরিক স্নেহপূর্ণ নীরব কল্যাণ কামনা।

ইতি—

তোমার স্নেহের

ভারী অস্বচ্ছন্দ—মন্নু।"

ঐ—"অত্রাহি" এবং "অস্বচ্ছন্দ" কথা দুটির মধ্যে কি সম্মোহন শক্তি ছিল, কে জানে,—মুহূর্ত্তে তার মূল ভাবার্থটা বেগমের মনের উপর যেন গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিল। অস্বস্তিপূর্ণ চিত্তে উঠিয়া, বেগম ঘরের মেঝের নিঃশব্দে পায়চারী করিতে লাগিল, তাহার মুখ চোখ সহসা শুকাইয়া গেল।

বাকী আর একখানি, প্রকাণ্ড খামে ভরা, সুবৃহৎ চিঠি। কিন্তু এটা খুলিয়া দেখিতে বেগমের আর সাহস হইল না।

পাশের ঘরে সুনীতি তখন মিষ্ট সুরে মধুর তাল রাখিয়া—করুণ কোমল কণ্ঠে গাহিতেছিল :—

"ওগো কাণ্ডারি, তুমি কে গো
কার হাসি কান্নার ধন !
ভেবে মরে মোর মন !—"

বেগম অধীর হইয়া উঠিল।—দূর হউক ছাই! পরের ভাবনা ভাবিয়া মরিতে গেলে,—শুধু মরাই সার হইবে, দুনীয়ার কোনও মানুষের তাহাতে কিছুমাত্র উপকার হইবে না, এটা ধ্রুব সত্য! কিন্তু এ পথে পা বাড়াইবে না বলিয়া বেগম চিরদিনের জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া আছে, এ পথ তাহার নয়! নয়!—হৃদয় হারানো? আল্লা বল!.........বেগমের তো খাইয়া ঘুমাইয়া আর কায নাই!

(৯)

কখন যে পাশের ঘরের হাসি গান গল্প থামিয়া গিয়াছিল, বেগম সে দিকে কিছুমাত্র মনোযোগ রাখে নাই। অনেকক্ষণ পরে কোন এক সময় হঠাৎ দুয়ারের বাহিরে সোফিয়ার ডাক শুনিয়া চমকিত হইয়া বলিল "আমায় ডাকছিস্ সোফি?"

সোফিয়া বাহির হইতেই হাসিয়া উত্তর দিল "না, তোমায় নয়, বাঁদীকে। কিন্তু তুই, দেখছি বই পড়তে পড়তে রাগটার কথা সবই ভুলে গেছিস্।—কথা বলে ফেল্লে যে?"

বেগম ভিতরে ভিতরে একটু সঙ্কোচ বোধ করিল। টেবিলের চিঠিগুলি ও ফটোখানা চটপট যথাস্থানে গুঁজিয়া রাখিতে রাখিতে অনেক কষ্টে ঠাট্টার সুরে বলিল "তোদের চেঁচামেচির হুড়ো হুড়িতে কি নিরীহ মানুষদের মৌন-ব্রত বজায় রাখবার যো আছে?"

কিন্তু তারপর সোফিয়া কি উত্তর দিল, সে দিকে বেগম কাণ দিতে পারিল না। সে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল,—সেই অপঠিত চিঠিখানা লইয়া! আশ্চর্য্য! এতক্ষণ চিঠিখানা হাতে লইয়া সে যে কি মাথামুণ্ড ভাবনায় অনর্থক সময় কাটাইয়াছে, কিছুই বুঝিবার যো

নাই। কিন্তু এতক্ষণের পর চিঠিখানা লুকাইয়া পড়িবার সুযোগটা যখন নিঃশব্দে পার হইয়া গেল, তখন কি না খেয়াল হইল........!

এখন উপায়? না পড়িয়া চিঠিখানা হাতছাড়া করা?..... না, সেটা হইতে পারে না। কিন্তু এখানে বসিয়া,..... পড়া, সেও আর নিরাপদ নয়। সোফিয়া ও সুনীতি এতক্ষণ অনামনস্ক ছিল, কিন্তু এবার তাহারা যখন বেগমের গন্ধ পাইয়াছে,—এখন, "হাঁউ মাঁউ খাঁউ" শব্দে, এই আসিয়া পড়ে আর কি!—হায়! কেনই যে বেগম সাড়া দিয়া ফেলিল!—

অতএব?......ঐ না পায়ের আওয়াজ? হাঁ, তো!—ঐ যে দুয়ারের কাছে!—

বিচার বিবেচনার অবসর আর জুটিল না!—চট্ করিয়া হাতখানা বুকের জামার ফাঁকে ঢুকিয়া পড়িল, এবং 'না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ' ব্যাপারটা নিমেষ মধ্যে বেমালুম সম্পাদিত হইয়া গেল!

ছেলে কোলে করিয়া, খাবারের রেকাবি হাতে লইয়া, সোফিয়া প্রসন্ন হাস্যোজ্জ্বল মুখে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "নে অনেকক্ষণ থেকে রাগ করে আছিস, অনেকটাই খিদে পেয়েছে, কি বল? এবার খা।—"

মন ও মুখের ত্রস্ত-উৎকণ্ঠিত ভাবটা প্রাণপণ চেষ্টায় দমন করিতে করিতে বেগম খুব হাল্কা ভাবে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল "যাঃ, যাঃ!—খুব বাবুর্চ্চিপণা শিখেছিস্! আমার এখন মোটেই খিদে লাগে নি।"

"ফের, মিথ্যে কথা?—তোর খুব খিদে পেয়েছে। গেল্ বল্‌ছি—"

"হাসালি সোফি! আমার খিদে নাই, তবু গিল্‌তে হবে?—সুনীতিকে দ্যাখ্, সুনীতিকে দ্যাখ্,—ও বেচারা অনেকক্ষণ থেকে গানটান গেয়ে চেঁচামেচি কর্‌ছে, খিদেটা দস্তুরমত ওকে, ওরই পাওয়া উচিত।—ওকে দেখ গে—"

"সে জন্যে তোমায় 'কেঁদে-কোকিয়ে' মর্‌তে হবে না,—তুমি নিজের চর্কায় তেল দাও। সে অনেকক্ষণ খোল ঠাণ্ডা হয়ে নিজের বাড়ীতে চলে গেছে।"

"চলে গেছে? বাঃ! কখন গেল?—"

"সাড়ে চারটের সময় তার গাড়ী এসেছিল।"

"বা রে! আমার সঙ্গে দেখা না করেই পালাল? দেখেছ আক্কেল!—"

"আক্কেল তার না তোর ? তুই রাগ করে এসে কোন চুলোয় কাঁথা চাপা দিয়ে পড়্লি তোর আর খোঁজ খবর নাই !—"

বাধা দিয়া অপ্রতিভ হাস্যে বেগম বলিল "আহা চুলোটা তোরই শোবার ঘরের পাশে ছিল সোফি,—তুই কোন—"

"আমার তো গরজ নেই ! তুইও রাগ করে চলে এলি, তোর বন্ধুও কেন-না রাগ করে চলে যাবে ? আলবৎ সে রাগ করে চলে যাবে।"

"সে রাগ করে গেছে ?—" বেগম হাসিল। মাথা নাড়িয়া বলিল "এটা নিশ্চয়ই তোর শিক্ষা, সংসর্গের ফল। অচ্ছা, কাল তাকে দেখে নেব। কিছু খেয়ে গেছে ?—"

"শুধু একগ্লাশ লেমনেড্, আর দুটি ফল।"

সন্তুষ্ট-ভাবে মাথা নাড়িয়া বেগম বলিল—"ও ছাড়া সে এ সময় কিছু খায় না, আমি জানি। অাচ্ছা সোফি সত্যি বল তো, আমার সঙ্গে দেখা করে গেল না কেন ? নিশ্চয় তুই শিখিয়ে দিয়েছিস্ ?—"

"ঐ নাও ! 'যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন কেষ্টা ব্যাটাই চোর !—' সব তালই সোফির ঘাড়ে ! বলি এখন খেতে বসবি কি না বল ? একজন রাগ করে গেছে, এবার আমি শুদ্ধ—"

"দোহাই তোমার ! দাও খাচ্ছি !—কিন্তু এ আখ্রোট্ কাথ্রোট্ সরাও, এত ড্রাই ফ্রুট আমার চল্বে না। ওগুলো তুই খা, বাকীগুলো আমি খাই। অচ্ছা—কৈ ? চা, দিবি নি ?—"

হাসিয়া সোফিয়া বলিল "তাই ভাব্‌ছি যে কতক্ষণে তোর মনে পড়ে !—এগুলো ততক্ষণ খা, চা তৈরী করে আন্‌ছে। তোমার জন্যে গরম জল না হলে চলে না, সে আমার মনে আছে।—সুনীতি বেশ, চা, কা, খায় না।"

—ব্যঙ্গস্বরে বেগম বলিল "আর সোফিয়াও অতি উত্তম মেয়ে,—গরম জল দেখ্‌লেই তার গা জ্বলে ওঠে ! কিন্তু হায়, আমি যে তোদের মত 'পিত্তির ধাত' কিছুতেই যোগাড় কর্‌তে পারলুম না। না হলে, আমিও তোদের মত লক্ষী মেয়ে হতুম !"

খাইতে খাইতে বেগম বলিল "আচ্ছা সোফি, ছুলা ভাই কবে ফির্‌বেন ঠিক জানিস্ ?—"

সোফিয়া বলিল "বাবাজীর সঙ্গেই চার পাঁচ দিন পরে ফের্‌বার কথা। তবে মাঝখানে যদি এলাহাবাদে নেমে দু একদিন আড্ডা দিয়ে আসেন।"

"এলাহাবাদ!"—বেগম চমকিয়া উঠিল! খাবারের রেকাবির উপর অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া, অস্ফুট স্বরে বলিল "সেখানেও কি মামলা-টামলা আছে না কি?—"

একটু বিষণ্ণভাবে সোফিয়া বলিল "না রে,—এলাহাবাদে তোর সেই 'ফুটবল-খেলওয়াড়' লোকটি রয়েছে যে। সে ছেলে আবার এক মুস্কিল বাধিয়েছে, আমেরিকা পালাবার জন্যে খেপে উঠেছে।"

নিরীহ ভাবে বেগম বলিল "তাই নাকি? তা মুস্কিলটা কিসের?—"

"মার এক ছেলে। সে ছেলে বিয়ে করবে না, ঘর সংসারী হবে না, কোথা আমেরিকা, কোথা আফ্রিকা এই সব হুজুগ নিয়ে; ছুটোপাটি করে বেড়াবে, এ কি মার সয়? মা আপ্‌সে আপ্‌সে সারা হচ্ছেন, কত দুঃখ করে তোর দুলা ভাইকে চিঠি লিখেছেন যে "মন্নু যদি একান্তই যায়, যাক। ওকে বিয়ে করে তারপর যেতে বল।"

বেগম অধোমুখে নিরুত্তরে খাবারগুলা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

সোফিয়া নিজ মনেই বলিতে লাগিল "এদের কাণ্ডগুলা কি রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে জানিস্? চাচাজীকে বিলেত পাঠানোর সময় আমাদের গোষ্ঠির মধ্যে যে রকম ব্যাপার ঘটেছিল, ঠিক তেমনি! ভাইকে পড়তে পাঠাবার জন্যে,—বাপজান কি দুঃখুই না-ভোগ করেছিলেন, শুনেছিস্ তো সব?"

হাত ধুইয়া উঠিয়া পড়িয়া বেগম বলিল "শুনেছি বৈ কি। ছেলের লেখাপড়ায় যাতে আর মন না থাকে, সেই কামনাই পীরের দরগায় সিন্নি চড়াতেও দাদি কুণ্ঠিত হন নি। বাস্‌ রে, তখনকার দিনের মাগুলি কি মজার লোক ছিলেন!—" বেগম মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

সোফিয়া বলিল "তাই তো সেদিন ও বাড়ীর ছোট দিদি কি কথায় আমাকে বল্লেন,—যে 'বাপ্‌রে, এখনকার দিনের এই খুদে খুদে মাগুলোর বুকে যদি একটুকু ভয় ডর আছে!—লেখাপড়ার জন্যে স্বচ্ছন্দে ছেলেগুলোকে বোর্ডিং'এ পাঠিয়ে, হোষ্টেলে পাঠিয়ে, দিব্যি নিশ্চিন্দি হয়ে থাকে। আমরা তো বাপু, তা মোটেই পারি নি। আমাদের মনে হোত লেখাপড়া না

হয়, নেই হোক, তবু ছেলে কাছে থাক,—চোখের ওপর থাক দা'ক,—আমার তো—জানটা ঠাণ্ডা থাক্‌বে।' "

"তা বৈ কি! ছেলেকে শুধু কাঁথা চাপা দিয়ে কোলে শুইয়ে রাখ্‌লেই ছেলের সর্ব্বাঙ্গীন্ মঙ্গল হয়, সব আপদ বিপদ কেটে যায়!—পৃথিবীর খোলা হাওয়া, আলো, আকাশের নীচে তাকে গা মেলে খাট্‌তে দিলে, খেল্‌তে দিলেই, তার জীবনীশক্তি সমস্তই নষ্ট হয়! বুক্তি মন্দ নয়!—আচ্ছা সোফি, তোর এই ছেলেটা যদি দেশ বিদেশ চরে ঘুরে মানুষ হতে চায়, তুই নিশ্চয়ই ঠ্যাং ছড়িয়ে কাঁদতে বস্‌বি, কি বলিস্?"

সোফিয়া সকরুণ দৃষ্টিতে একবার ছেলেটির দিকে চাহিল। তারপর উদাস-করুণ কণ্ঠে বলিল "তা হলে তুমি কি রক্ষে রাখ্‌বে? আমার সন্তঃ সন্তঃ আছ্‌ড়ে মেরে দেবে না?—"

"আরে না না, আমার আছাড়ের খাতিরে নয়। তোর নিজের খুসী মাফিক সত্যি কথাই বল। কাজের জন্যে ছেলেদের দূরে পাঠাতে হলেই কান্নাকাটি করবি তো?"

"তা মন কেমন করে না বাপু? তোর করবে না, তুই বল?"

বেগম নিরুত্তরে একটু হাসিয়া ছেলেটিকে সোফিয়ার কোল হইতে লইয়া,—বুকে ফেলিয়া সস্নেহে চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিল "এটাকে দান করে দিবি আমায়? বড়টা আর বাকী সব কটা তোর থাক। শুধু এইটে আমায় লেখাপড়া করে দে, পারবি?"

"সস্‌চন্দে। শুধু ওটাকে কেন ওর বাপকে শুদ্ধু!—"

"দেব মুখে এক থাবড়া বসিয়ে!—আহাম্মক কোথাকার! যত সব চাষাড়ে ঠাট্টা! আচ্ছা সোফি, তোর কি চল্‌তে বল্‌তে একটুও পায় মুখে বাধে না?"

"অস্তঃঃ, দুনীয়ার দুজন মানুষের কাছে নয়! এক তুই—আর তোর দুলাভাই।"

বেগম কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু দাসী সেই সময় চা লইয়া ঘরে ঢুকিল, কাজেই জবাবটা সামলাইয়া লইতে হইল। চায়ের পাত্র লইয়া চুমুক দিয়া, দাসীর দিকে চাহিয়া বলিল "এমন মোলায়েম 'কড়া' চা বানাতে তোমায় শেখালে কে? তোমার এই মোলায়েম-ধাতের বিবি-সাহেবা?—"

দাসী থতমত খাইয়া বলিল "না হজরৎ, আমাদের সাহেবজী তো এই রকম চা—'ই পছন্দ করেন। আপনার কি কড়া লাগছে? পাৎলা করে চা এনে দেব?"

"আর তোমায় কষ্ট করতে হবে না, যাও। আজকের মত, আমি এইটেই চালিয়ে নিচ্ছি। যেন্দা এবার যখন আমায় চা দেবে, তখন তোমার সাহেবজীর মত কড়া ধাতের চা আমায় দিও না, সে দিও তোমার ঐ বিবি-সাহেবাকে! বুঝলে? সেটা সহ্য হবে ভাল-রকম, ওঁর-ই!"

সোফিয়া তখন টেবিলের কাছে গিয়া, অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত কি একটা জিনিষ খুঁজিতে-ছিল, ইহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না, কিন্তু ব্যস্ততার ফাঁকে,—ঐ একটুখানি—'সাহেব-জী" নামটা কোনক্রমে তাহার কানে ঢুকিয়া পড়িল! বাস্, আর নিশ্চন্ততা চলিল না!—তৎক্ষণাৎ ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া অতিশয় অপ্রসন্নতার সহিত বলিয়া ফেলিল "ও লোকটির কথা আর বলিস্ নি বাপু! হাড়জ্বালানে মানুষ! যত রাজ্যের জঞ্জাল এই টেবিলটার ওপর বিছিয়ে রাখবে, আর,—কাজের জিনিসগুলো যে কে কোথায় যায়, কারুর সন্ধান মেলে না! এই কাল দেখলুম ফটোখানা এখানে রয়েছে—আর আজ যে সেটা কোথায় গেল,—"

বেগম সন্ত্রস্ত হইয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল "কি? ফটো? কার?"

নিরতিশয় গাম্ভীর্য্য সহকারে সোফিয়া বলিল "সে একটা লোকের। এদ্দিন সেটা এই সামনে, দিব্বি অসাবধানে পড়েছিল,—তুলে রাখবার ফুরসুৎ হয় নি।—আর আজ সেটার দরকার কিনা অমি তাকে সাবধান করে তুলে রেখে যাওয়া হয়েছে।—যেন পড়ে থাকলে কেউ ছবিখানাকে খেয়ে ফেলত!"

বেগম সহসা নিঝুম নিরুত্তর হইয়া গেল! মনে তাহার লেশমাত্রও সন্দেহ রহিল না, যে সোফিয়া কোন্ ছবিখানা খুঁজিতেছে—এবং বুঝিতেও তাহার কিছুমাত্র বাকী রহিল না যে সোফিয়া কেমন নিখুঁত নিশ্চয়তার সহিত, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চড়াইতেছে!—অত্যন্তই হাসি পাইতেছিল,—কষ্টে স্মৃষ্টে সেটা সামলাইয়া লইয়া, সোফিয়ার ছেলেটিকে হাঁটুর উপর দাঁড় করাইয়া—অত্যন্ত মনোযোগের সহিত শিশুর দৃষ্টি লক্ষ্যে—মুক অভিনয় সুরু করিয়া দিল। খোলা পাইয়া শিশুটি আনন্দে উচ্ছসিত হইয়া অত্যন্ত খুসির সহিত হাসিয়া কাঁদিয়া হেলিয়া দুলিয়া, রীতিমত অস্থির হইয়া উঠিল।—অন্বেষণ নিরত সোফিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়াও দেখিল না, নচেৎ দেখিলে,—দেখিতে পাইত তাহার কৌতুকতৎপরা

বোন মহাশয়া, কেমন সুন্দর নিপুণতার সহিত এ‍কমনে খেলা করিতে করিতে সতর্ক বক্র কটাক্ষে সোফিয়ার কাযের দিকেই কি সুন্দর ভাবে নজর ঠিক' রাখিয়াছে !—

হঠাৎ সোফিয়া সানন্দে চেঁচাইয়া বলিল,—"এই যে, পেয়েছি ! এইখানেই ছিল রে !—"

উদাসীন ভাবে বেগম মন্তব্য প্রকাশ করিল "ওটা পাওয়া না পাওয়ার জন্যে কিছু এসে যায় না। যে কোন ছুতায় হোক, একটা নিরীহ লোকের ঘাড়ের ওপর নিরাপদে রাগের ঝাল বর্ষণ করতে সুযোগ পাওয়াই,—তোমার পক্ষে আসল স্বস্তিদায়ক ব্যাপার, না সোফি ?—আচ্ছা ছেলেটাকে এবার ধর,—আমায় এবার স্বস্থানে প্রস্থান করতে হবে।—"

"দাঁড়া আর একটু—আজ তোকে একটা মজার জিনিস দেখাব।—" বলিয়াই, সোফিয়া দাসীকে নিজের কাজে যাইবার জন্য আদেশ করিল ।

দাসী প্রস্থানোদ্যত হইতেই বেগম শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "দাঁড়াও, দাঁড়াও,— আমার এই বই কখানা ও-বাড়ীতে পৌছে দিয়ে আসবে চল দেখি ! আর ওঘরে থার্ম্মমেটার আর একখানা বই আছে, সেটাও নাও।"

দাসী নির্দ্দেশিত বইগুলি তুলিয়া লইয়া ওঘরের বই থার্ম্মমেটার আনিতে গেল।

সোফিয়া দ্রুত চরণে বেগমের দিকে আসিতে ছিল, হাতে সেই ফটো !—বেগম আর-চোখে একবার চাহিয়া দেখিল, তারপর চক্ষের নিমেষে ধাঁ করিয়া ছেলেটিকে পাশের সোফার উপর শোয়াইয়া দিয়া,—চট্ করিয়া চৌকাঠের বাহির হইয়া পড়িয়া বলিল "আজ চল্লুম সোফি,—কিছু মনে-টনে করিস্ নে।"

"এই,—এই, একবার দাঁড়', একটা জিনিস দেখে যা—"

বেগম চলিতে চলিতেই উত্তর দিল, "অনেকক্ষণ থেকেই বই দেখে দেখে চোখ টাটিয়ে উঠে'ছে, আর এখন কিছু দেখা—টেখা পোষাবে না।—"

"খোদার কসম্ ! একবার দাঁড়া, চেয়ে দ্যাখ্।"

হাসিমুখে বেগম ফিরিয়া দাঁড়াইল ; ছবির নীচের সেই লেখাটুকুর উপর হাত চাপা দিয়া সোফিয়া বলিল "এই সুন্দর চেহারার লোকটি, কে জানিস ?—"

চকিত দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া বেগম স্মিতমুখে বলিল "খোদার সৃষ্টির কেউ হবেন, আর কি জান্‌ব ?—"

গম্ভীর হইয়া সোফিয়া বলিল "অতদূর থেকে দেখা নয়, কাছে সরে এসে দ্যাখ,—এ লোকটির সম্বন্ধে অনেক পরিচয়ই তোর জানতে বাকী আছে।—"

"থাক, আমার তাতে কোন আপত্তি নাই।"

"কিন্তু আমাদের আছে ভাই,—" সোফিয়ার কণ্ঠস্বর অনুনয় পূর্ণ। মিনতি করুণ স্বরে সে বলিল "ভাল করে দ্যাখ ভাই।"

"হাসালি সোফি !—তোর কাতরতা দেখে আমার অত্যন্ত মায়া লাগ্‌ছে ! স্যর, ফিলিপ সিড়নীর মতই উদার করুণা প্রকাশ করে বল্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে,—'দাই—নেসেসিটি ইজ্‌ গ্রেটার দ্যান্ মাইন্ !—"

কিন্তু ঠাট্টাটা ঐ পর্য্যন্তই রহিল। মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই, হঠাৎ বেগম নিজের মুখটা ফিরাইয়া লইয়া,—দ্রুত অন্তর্দ্ধান করিল।—

নিরীহ সোফিয়া বুঝিতে পারিল না, বেগমের এই আকস্মিক-বিচলিত ভাবটার কারণ কি ?—

ক্রমশঃ—

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

নারী।

—:০:—

(হুইটিয়ার্।)

তুমি নারী বিধাতার অভিশপ্ত সৃষ্টি এ ধরায়
আবৃত মিথ্যায়।
একবার হও দেখি প্রকটিত পবিত্র মায়ায়
স্বর্গ-সুষমায়।
ভেদি তব ছদ্মবেশ বাহিরিছে আসল নারীর
গরিমা গভীর,
অন্তরে তোমার ওকি পূতিগন্ধ কুৎসিত ভীষণ
কৃত্রিম জীবন?
লজ্জা ওকে নাহি বলে, ভাণ সে তো, নাহি বিন্দু কুণ্ঠা
খোল' অবগুণ্ঠা—
মুখোস্ খুলিয়া, কর', ঝাড়িয়া দেহের ধূলিরাশ,
আপনা প্রকাশ।
যীশুর আদেশে যথা উঠেছিল মেরী সেইদিন
শুভ্র পাপহীন—
আন' ফিরে হারাণো সে আত্মাখানি সুন্দর পরম
ত্যজ' এ ভরম।
নাহি শক্তি? সেকি কথা? দিবে শক্তি সেই শক্তিমান
অনন্ত মহান্!

ভয় ? ওই শুন' গান, ধরণীর ত্রাতাকণ্ঠে গীত,—
"হও আনন্দিত !"
কে তোমারে করে নিন্দা ? দেবতার এই মহাবাণী—
"হও ধরারাণী !"
তাঁর প্রিয় সন্তানেরে কে দূষিবে ? কে করিবে ঘৃণা ?
"হও আত্মাধীনা !"

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

উচ্চারণ সমস্যা।

কালিদাস লিখিয়াছেন উমার জন্ম হইলে তাঁহাদ্বারা তাঁহার পিতা হিমালয় এরূপ ভাবে পূত ও বিভূষিত হইলেন যেরূপ বিদ্বানেরা শুদ্ধীকৃত কথন দ্বারা পূত ও বিভূষিত হইয়া থাকেন—সংস্কারবত্যেব গিরা মনীষী তয়া স পূতশ্চ বিভূষিতশ্চ। সংস্কারযুক্ত কথনের মধ্যে শুদ্ধীকৃত উচ্চারণ অবশ্যই পড়ে। ভারতবর্ষের মধ্যেই বঙ্গদেশের পশ্চিমে যেথানেই গিয়াছি সেখানেই দেখিয়াছি যে কি হিন্দু কি মুসলমান যাঁহারাই হিন্দী, সংস্কৃত, উর্দ্দু এবং পারসী শিক্ষা করেন তাঁহারাই যথাসাধ্য শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করেন। ইংরেজী উচ্চারণ তাঁহাদের তেমন ভাল হয় না যেহেতু তাঁহারা ইংরেজী all, oil, tall প্রভৃতি শব্দে যে অ আছে তাহা উচ্চারণ করিতে পারেন না। তাঁহাদের ভাষার অকারের সেরূপ উচ্চারণ নাই। তাঁহাদের ভাষার যে অ আছে তাহার উচ্চারণ সংবৃত আকারের মতন। তাহাই তাঁহারা জন্ম হইতে

শুনিয়াছেন সুতরাং যখন কিছু বড় হইয়া ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করেন তখন তাঁহারা বাঙ্গালা "অ"র উচ্চারণ হয় চেষ্টা করিয়াও করিতে পারেন না নতুবা কেহ তাঁহাদিগকে পীড়াপীড়ি করিয়া সে উচ্চারণ শেখায়ও না। বাঙ্গালীরাও ইংরেজীর দুই একটা উচ্চারণ অক্ষমতা বশত করিতে পারেন না যথা would, wool, wood এইগুলিকে বাঙ্গালীরা অনেকেই উড্, উল এবং উড্ রূপে উচ্চারণ করেন। ইংরেজী woo এবং বাঙ্গলা উ অভেদ ভাবিয়া পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা উমেশ, উমাচরণ নাম Woomes ! Woomacharan রূপে লিখিতেন কিন্তু অনায়াসে উচ্চার্য্য কোন কোন শব্দও বাঙ্গালীরা শিক্ষিত ইংরেজের উচ্চারণ মনোযোগ দিয়া শুনেন না এবং dictionary দেখেন না বলিয়া অশুদ্ধ উচ্চারণ করেন। Parliament শব্দটাকে বাঙ্গালীরা কেহ পার্লিয়ামেণ্ট কেহ পার্লামেণ্ট রূপে উচ্চারণ করিয়া থাকেন। প্রবাসীর সম্পাদকীয় লেখায় পার্লামেণ্ট দেখিতে পাই। কিন্তু কেহই শুদ্ধ করিয়া পার্লিমেণ্ট বলেন না বা বাঙ্গলায় লেখেন না। Brooch শব্দটাকে বাঙ্গালীরা ব্রুচ্ বলেন এবং অলঙ্কারের বিজ্ঞাপনেও ব্রুচ্ দেখিতে পাই। কিন্তু শব্দটার উচ্চারণ ব্রোচ্। Onion শব্দটা বাঙ্গালীর মুখে ওনিয়ন্ শুনিতে পাই কিন্তু তাহার শুদ্ধ উচ্চারণ অনিয়ন্ (union), Destroy, prescription, respect প্রভৃতি শব্দগুলিকে অনেক বিলাত ফেরত বাঙ্গালীর মুখেও ডেসট্রয় প্রেস্ক্রিপশন্ রেস্পেক্ট শুনিতে পাই অনেকেই সেগুলিকে শুদ্ধরূপে ডিট্রয়, প্রিস্ক্রিপ্শন্, রিস্পেক্ট বলেন না। দুই চারিজন মহাবিদ্বান্ বাঙ্গালীকেও This school এই দুইটা শব্দের উভয় Sকেই উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করিতে গিয়া দিস্ ইস্কুল্ বলিতে শুনিয়াছি। ইংরেজীতে এমন দুইটা শব্দ যদি পর পর থাকে যাহার প্রথমটার শেষে S এবং দ্বিতীয়টার প্রথমে S আছে তাহা হইলে ইহার একটা S এর যে উচ্চারণ হইবে না তাহা অনেকে জানেন না। এই জন্যই বোধহয় Sayce তাঁহার বিজ্ঞান পুস্তকে লিখিয়াছেন যে শিক্ষিত বাঙ্গালীরা স্কুলকে ইস্কুল বলেন। বাঙ্গালীরা যে কেবল ইংরেজী উচ্চারণ বিষয়ে অসাবধান তাহা নহে। তাঁহারা জানিয়া শুনিয়াও সংস্কৃত শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করেন না। বিসর্গের উচ্চারণ তাঁহারা মোটেই করিতে পারেন না। তাঁহাদের কদর্য্য উচ্চারণ শুনিয়া এবং সংস্কৃতে কথা কহিবার অক্ষমতা দেখিয়াই দয়ানন্দ সরস্বতী একবার বলিয়াছিলেন যে বঙ্গদেশে সংস্কৃত বিদ্যায়াঃ প্রচার এব নাস্তি। বাঙ্গালীরা নিজের ভাষারও কোন কোন শব্দ অশুদ্ধরূপে উচ্চারণ করেন—

সদৃশ, মসৃণ, সরীসৃপ, জতুগৃহ প্রভৃতি শব্দকে সদ্রিশ, মস্রিণ, সরীস্রিপ, জতুগ্রিহ রূপে উচ্চারণ করেন।

কিন্তু প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়িয়া আমার মনে একটা প্রশ্নের উদয় হইয়াছে। আমরা যে সকল বিদেশী শব্দ প্রধানত ইংরেজদের নিকট হইতে শিখি সেই শব্দ সকলের ইংরেজী বিকৃত উচ্চারণ করিব—না সেগুলির প্রকৃত উচ্চারণ করিব? সরকার মহাশয়ের প্রবন্ধে দেখিতে পাই ফ্রান্সে Henryর উচ্চারণ আঁরি এবং জর্ম্মানিতে Berlin এর উচ্চারণ বের্লি'ন। এখন আমরা বাঙ্গালীরা কি বলিব? বর্লি'ন বলিব না বের্লি'ন বলিব? খ্রীষ্ট বলিব না খ্রীস্ত বলিব? হেন্‌রি বলিব না আঁরি বলিব? Achilles কে অ'ক্লিস্ বলিব না একিলিস্ বলিব? Michael কে মাইকেল বলিব না মিখায়েল বলিব? আমার বোধ হয় আমাদের পক্ষে ইংরেজদের মত উচ্চারণ করাই উচিত নতুবা যেন বড় বিদ্যা ফলান হইবে। কেবল ইহাই নহে, ইংরেজেরা আমাদের দেশের স্থানের নাম যে রূপে উচ্চারণ করেন, ইংরাজীতে কথা কহিবার সময়ে আমাদেরও সেইরূপ করা উচিত ক্যালকাটা, মিড্‌নাপুর প্রভৃতি বলা উচিত। বহু বৎসর গত হইল এক দিন কেশব চন্দ্র সেনের বাটীতে তাঁহার সহিত কে, এম্, ব্যানার্জ্জির ইংরেজীতে আলাপের সময়ে উভয়কেই পাট্‌নাকে প্যাট্‌না বলিতে শুনিয়াছিলাম। তখন বড়ই খারাপ লাগিয়াছিল। দুই বৎসর গত হইল বিহারে গিয়া দুইজন সুশিক্ষিত বিহারী ভদ্রলোককে ইংরেজীতে কথা কহিবার সময়ে প্যাট্‌না বলিতে শুনিয়াছি। আমার বোধ হয় সেইরূপ করাই উচিত। যদি ইংরেজীতে কথা কহিবার সময়ে ক্যাল্‌কাটা বলিতে হয় তাহা হইলে প্যাট্‌না বলিব না কেন?

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

তটিনী

:০:—

(১৮)

ছয় মাস বিদেশে বিদেশে কাটাইয়া তারিণীবাবুর মন আবার কাজের জন্য ব্যস্ত হইল, তিনি বাসায় ফিরিতে চাহিলেন।

এই সুদীর্ঘ ছয়টী মাস কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া দেশ ভ্রমণ তারিণীবাবুর একেবারে প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। তিনি কখনও কাজ ছাড়া হইয়া থাকিতে পারিতেন না বলিয়াই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এক দেশে কাটাইতে হইত।

কিন্তু এবারে যে তিনি এতদিন নিজের ব্যাবসার ক্ষতি করিয়াও ঘুরিয়া বেড়াইলেন দেশ ভ্রমণের আগ্রহই যে তার একমাত্র কারণ তাও ঠিক বলা যায় না।

তটিনী দেখিল এইবারে ফিরিতে হইবে। কিন্তু তারিণীবাবু সর্ব্বত্র বেড়াইয়া আসিয়াও কাশী যাইবার নামও করিলেন না তটিনী ভাবিয়াছিল যে ঠাকুমার সঙ্গে একবার দেখা হওয়া সম্ভব। কিন্তু এবার দেখিল তারিণীবাবুর বিমুখ-মন এখনও মায়ের প্রতি প্রসন্ন হয় নাই। অথবা তটিনীকে সঙ্গে করিয়া কাশী যাইতে তিনি সাহসী নন।

কিন্তু নিতাই এবারে চটিয়া উঠিল। তারিণীবাবুর গম্ভীর মুখের সুমুখেই সে যুক্তকরে দাঁড়াইয়া বলিল "আমি ছুটী চাই, হুজুর।"

তারিণীবাবু ঘাড় তুলিয়া সবিস্ময়ে বলিল "সে কি নিতাই ?"

"একবার বাবা বিশ্বনাথের চরণ দর্শন ক'রে আসতে চাই হুজুর!"

"ওঃ তাই বল্। তা আগে বল্‌লে হ'তে পারতো, এখন যে আমি ফিরে যেতে চাই, এখন সময় হবে না তো!"

"আমি এখন যেতে পারবো না, পরে যাবো।"

"তা হয় না। তুই-ই তো একজন আছিস পুরাণো লোক। তুই না থাক্‌লে চ'লবে না।"

"এত দূরে এসে বাবা বিশ্বনাথ না দেখে আমি ফিরতে পারবো না। আমার হুকুম

করুন, আমি সাত দিনের ভেতর ফিরে আস্‌বো।"

"কি বিপদ! বিশ্বনাথ কি পালিয়ে যাচ্চেন রে?"

নিতাই বিপন্ন ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারিণীবাবু তাকিয়া বালিশ ঠেলিয়া সোজা হইয়া বসিলেন। বালিশটা ফরাস ছাড়িয়া মাটীতে গড়াইয়া পড়িল।

সেটীকে আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া নিতাই বলিল "হুকুম পেলে আমি আজই চ'লে যাই! সেখানে মা ঠাকরুণ আছেন—"

"হ্যাঁ। আজই যাবি? আজই?"

"অনর্থক আর দেরী ক'রবো কেন?"

"না। আজ যেতে পাবি নে। যা তিনুমাকে ডেকে দিয়ে যা!"

অল্পক্ষণ পরেই তটিনী আসিয়া দাঁড়াইল। তারিণীবাবু তার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "তিনু এ নিতাই তো আচ্ছা গোলমাল ক'রচে!"

তটিনী একটু হাসিল।

তারিণীবাবু বলিলেন "ও বোধহয় কথা শুনবে না!"

"বোধহয় না ও সেখানে থেকে এই লোভেই এসেচে আর আপনিও তো বলেছিলেন যে কাশী যাবেন।"

"তাই তো ভাবচি,—নিতাই যদি নিতান্তই না ছাড়ে তা হলে কাশী হয়েই বাসায় ফিরবো। মাও বারংবার লিখছেন যাবার জন্যে।"

তটিনী মাথা নামাইয়া চুপ করিয়া রহিল। তারিণীবাবুর মন স্বাভাবিকই জননীর প্রাণের আহ্বানে কাশীর দিকেই ঝুঁকিয়াছিল। কিন্তু পাছে মা তাঁর বয়োচিত বৃদ্ধ প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া পাঁচটা পুরাতন প্রসঙ্গ তুলিয়া তটিনীর মনে আন্দোলন জাগাইয়া তোলেন এই আশঙ্কায় তিনি থামিয়াছিলেন। নিতাই তাঁর এই অনিচ্ছাকৃত থামিয়া যাওয়া ঘুচাইয়া দিল, না হইলে তাঁর ইচ্ছার দৃঢ়তা এত লঘুতর ছিল না যে, শুধু নিতাই-এর জন্য তাঁর মতি বিভিন্ন পথে ফিরিতে পারে।

দিন তিনেক পরে একদিন উত্তীর্ণ প্রায় সন্ধ্যার সময়ে আধ ঘোর ঘোর অন্ধকারে প্রণতা তটিনীকে দেখিয়া তার ঠাকুমার ক্ষীণজ্যোতিঃ চক্ষু তাকে চিনিতে পারিল না।

তিনি যখন আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "ওমা ! আমি যে চিন্‌তে পারচিনে গো ! কোথা থেকে আসচো ?"

তাঁর মনে হইতেছিল যে কোনো নূতন লোক পথ ভুলিয়া তাঁর এ বাড়ীতে আসিয়া উঠিয়াছে,—এখনি এই ভুল বুঝিতে পারিবে ! সেই মল্লিকা শুভ্রকান্তি ক্ষুদ্র বালিকাটীকেই তাঁর মনে ছিল। এই তরুণ যৌবনশ্রীদীপ্তা সুন্দরীর স্বাস্থ্য সবল দীর্ঘ সুগোল দেহখানি ও তার শান্ত গভীর দৃষ্টির সঙ্গে সে বালিকার কোনো মিল ছিল না। কেমন করিয়া তিনি চিনিতে পারিবেন ?

গাড়ী ও মুটের পাওনা মিটাইয়া দিয়া তারিণীবাবু বাড়ী ঢুকিয়া বহুদিন পরে ডাকিলেন "মা !"

কতদিন ! কতদিন পরে সহসা এই 'মা' ডাক শুনিয়া বিহ্বল ভাবে তিনি মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"কে,—তারু ? ও ! না, উমা ?"

"আমাকে চিন্‌তে পারচো না মা ?"

জননীর দু চোখ বহিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িল। নিজের চক্ষুকেও অবিশ্বাস করিয়াই না তিনি উমাকান্তের নাম করিয়া ডাকিলেন, তারিণীর নাম করিতে সাহস হয় নাই ! যদি আবার ভুল ভাঙ্গার বেদনা বহিতে হয় !

মায়ের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া তারিণীবাবু কন্যার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "ঠাকুমাকে প্রণাম করেছ তিনু ?"

তটিনীর মাথাটা বুকে টানিয়া লইয়া তার ঠাকুমা বিগলিতকণ্ঠে বলিলেন "তিনু ? এই তিনু ! সেই ছোট্ট তিনু ! উঃ কতদিন দেখি নি !"

তারিণীবাবু অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ঢোক গিলিলেন। কপি ও কলাইসুঁটী বোঝাই করা একটী ঝুড়ি লইয়া নিতাই আসিয়া ঝুড়িটা র'কে নামাইয়া রাখিল ও ঠাকুমাকে প্রণাম করিল। তাকে চিনিতে তাঁর কোনো কষ্ট হইল না। ঠাকুমা তখন তটিনীকে বলিতেছিলেন "ওঃ কি পাষাণী তুই তিনু—শুনেচি তুই নাকি অনেক লেখা পড়া শিখেচিস্, কিন্তু কখনো কি আমাকে তোর মনে প'ড়তো না ! এতকালের মধ্যে একখানি চিঠিও কখনো দিতে পারিস নি ?"

তটিনী নিরুত্তরে নতমুখে দাঁড়াইয়াছিল। তিনি বলিলেন "তোরই জন্যে আমার ছেলে অবধি পর হ'য়ে—"

তারিণীবাবু চেঁচাইয়া উঠিলেন "চুপ কর—চুপ ক'র মা!"

তটিনী একবার চারদিক চাহিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। তারিণীবাবু সহসা মাতার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন "মা! আমাকে ক্ষমা কর মা, ওর সুমুখে কোনো কথা বলো না, এইটুকু দয়া কর আমায়।"

"সে কি কথা বাবা। ও কি আমার কেউ নয়,—তাই ওকে ব্যথা দেব আমি?"

বাস্তবিক যে কয়েক দিন তারা কাশীতে থাকিল তটিনীর পিতামহী তাকে কোনো কথাই বলিলেন না। কিন্তু তটিনীর কুমারী বেশও তাঁর ভাল লাগিল না।

তিনিই যে বিবাহ দিয়াছিলেন এর জন্য উমাকান্তর মত তিনি নিজেও চিরদিন অনুতপ্ত ছিলেন। একদিন দেখিলেন তাঁর পুরাণো মহাভারতখানি লইয়া তটিনী পড়িতেছে। তিনি বলিলেন "তিনু মহাভারত পড়েছিস্?"

"কতবার!"

"সেখানে তোদের মহাভারত আছে?"

"আছে। বাবার তিন চার রকম মহাভারত আছে।"

"মহাভারতের সাবিত্রী উপাখ্যান পড়েছিস্?"

তটিনী মুখ নামাইয়া একটু হাসিল, বলিল "পড়েছি।"

"কেমন লাগে তোর?"

তটিনীর বদ্ধ ওষ্ঠে হাসি লাগিয়াই ছিল, সে ক্ষীণ হাসি হাসিয়াই সংক্ষেপে বলিল "বেশ্!"

"বেশ! তোরা আর ওসব উপাখ্যানের মর্ম্ম কি বুঝ্‌বি? সেকালে 'সাবিত্রী' সমান হও ব'লে মেয়েকে আশীর্ব্বাদ ক'রতো!"

"একালেও তো করে।"

"তা করে বই কি! কিন্তু সাবিত্রীর মত মেয়ে কি আর একালে জন্মায়?"

তটিনী হাসিমুখে ঠাকুমার মুখপানে চাহিল। বুঝিল এই সব প্রসঙ্গের ভিতর দিয়া তিনি এমন কোনো কথার দিকে চলিতেছেন যে এক কথায় তা বলিয়া ফেলিতে তিনি চেষ্টা করিয়াও পারিতেছেন না।

কিন্তু সে কথা তিনি আনিতে চাহেন, তা তটিনীর অজানা কিছু নয়, কিন্তু এই সব আন্দোলনের পর যে অবসাদ ভোগ অনিবার্য্য ছিল, তটিনী সেটুকু পছন্দ করিত না। তাই সে নিজের সাধ্য মত সাবধানে এই তীব্র অথচ সুতীক্ষ্ণ কাঁটা এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিত।

তরুণ পদ্মকোরক যেমন তার জীবনের প্রথম প্রভাতে আলোক সম্পাতে অম্লান পল্লব দলগুলি পাতিয়া ফুটিয়া উঠে, তেমনি এই কুমারীর অমল হৃদয় মুকুল, বিকাশে সুখ দেখিয়াও সে দুচক্ষু মুদিয়া ইহাকে শুকাইয়া বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

কিন্তু সেই মুদিত নয়নের মধ্যেও এই ফুলের মদির মধুর গন্ধ তাকে মধ্যে মধ্যে সংগ্রামের আহ্বান জানাইত। তথাপি তার আবাল্যের সুশাসিত সুদৃঢ় মনমন্দিরের দুয়ারখানি কাঁপিয়া কাঁপিয়াই অধিকতর কঠিনতার আশ্রয় লইতেছিল। নিজকে অবিবাহিতা বলিয়া জানিতে সে এত বেশী দিন অভ্যস্থা, যে সহসা বিপরীত কিছু মনে আনাও স্পষ্টভাবে তার দ্বারা সম্ভব ছিল না।

তাই উদয়ের আলোর কণা যখন নীরব প্রভাপে দ্বার ভাঙ্গিয়া তার আঁধার ঘরের কোণে হাসির ছটা বিকীর্ণ করিতে যাইতেছিল তখনও সে বিদ্রূপ হাস্যে দ্বার রুদ্ধ করিতে ব্যস্ত।

নিতান্ত নিজের জিনিষ বলিয়া না বুঝিলে সে কেন আমল দিবে? তা আলোই হউক, বা আঁধারই হউক।

(১৯)

প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এক বৎসর হইতে মহেশ্বরী পক্ষাঘাত মত হইয়া শয্যাগত হইয়া আছেন। কাজেই সংসারের ছোট বড় অনেকগুলি কর্ত্তব্যের সঙ্গে একজন রোগীর ভারও তটিনীর হাতে আসিয়া পড়িয়াছে।

ঘরের মেঝেয় বসিয়া মায়া তার দামাল ছেলেটীকে ধরিয়া বাঁধিয়া দুধ খাওয়াইতেছিল। চঞ্চল শিশু পায়ে ঠেলিয়া একবাটী দুধ ঘরময় ঢালিয়া ফেলিল। মায়ের ধমক খাইয়া গলার স্বর বাড়াইয়া দিল।

তটিনী ঘরে ঢুকিয়া হাসিয়া বলিল "এত কান্নাকাটী কেন ?"

মায়া মেঝের দুধ বাটীতে তুলিতে তুলিতে বলিল "দ্যাখ না ভাই হতভাগা ছেলের কীর্ত্তি।"

"ওমা তাই তো !"

বলিয়া তটিনী শিশুকে বুকে তুলিয়া লইয়া বলিল "আহা তাই তো! মা কাঁদিয়ে দিয়েচে যে! দুধটার এ কি দশা হয়েছে—"

শিশু সান্ত্বনা পাইয়া বলিল "মা"

"মা ফেলেছে বুঝি? ঠিক কথা!"

"ঠিক কথা বই কি?" মায়া হাসিয়া বলিল "অমন সত্যিবাদী আর কোথাও মিল্‌বে না।"

মিল্‌বে না ই তো! নে, তোর ছেলে নে মায়া, আমি যাই।"

"কেন ব'স না একটু! আগে তো তুমি আমাকে ভালও বাস্‌তে তিনুদি—"

"সে কবে?

"কেন,—যখন আমি ছোট ছিলাম,—মনে নেই বুঝি?"

"যাঃ—আমি কোনো জন্মে তোদের মত কাউকে ভাল-টাল বাসতে যাই নে।"

"জোর ক'রে যদি অস্বীকার কর তা হ'লে আর কি বলবো বল, নইলে আমি তো বুঝতাম তুমিও ভাল বাস—"

"কাকে? কাকে আমি ভাল বাসি?"

"যাকে খুব ভাবো। কিংবা তোমায় খুব ভাবে যে তাকে"

"কে সে? এই বেবি-টা তো! তা ব'য়ে গেছে আমার তোর ছেলেকে ভাল-বাস্‌তে—"

"যাও যাও, চালাকী করো না। ওই বেবিটার কথাই যেন আমি ব'লচি। এখনো আমি কচি খুকীটি আছি কি না?"

তটিনীর মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল তবু সে পরিহাসের স্বরেই বলিল "না। এই দু'বছরে তুমি একেবারে অন্তর্যামী হ'য়ে গিয়েছ, নয়?

"'অন্তর্যামী' কি ক'রে হবো, তবু কতক কতক চোখ বুঝি ফোটে নি?—আচ্ছা ভাই তিমুদি—"

তটিনীর ফুল্ল গোলাপের মত মুখখানি একবার প্রবল শোনিতোচ্ছ্বাসে রাঙা হইয়া পরমুহূর্ত্তেই সাদা হইয়া গেল। সে একটা ধমক দিয়া বলিল "থাম্ মায়া, চুপ কর্,—চুপ্ কর তুই!"

মায়া কুণ্ঠিত হইয়া সত্যই থামিল। ননদ সম্পর্ক যখন হয় নাই তখনও তটিনীর ধমককে সে ভয় করিত। ননদ সম্পর্ক হইবার পর এই প্রথম সে এ বাড়ীতে তটিনীর সঙ্গে একত্রে ঘর করিতে আসিয়াছে। এর পূর্ব্বে মায়ার পিতামাতার সম্মতি থাকিলেও তারিণীবাবু মায়াকে আনিবার কোনো আগ্রহ দেখান নাই।

তটিনী কিছুক্ষণ খোকার সঙ্গে খেলা করিয়া তাকে নাচাইয়া হাসাইয়া মায়ার দিকে চাহিয়া দেখিল সে মাথা নীচু করিয়া দুধের বাটী নাড়িতেছে, তটিনী কোমল স্নিগ্ধ স্বরে বলিল "ওই সব কথা তুলে আমায় আর কখনও ঠাট্টা করো না মায়া!"

মায়া মাথা নামাইয়াই একটু হাসিল। তটিনী বলিল "আবার হাসে!"

"তবে কি তোমার মত কেবল কাঁদবো না কি?"

"আজ তোর কি হয়েছে রে? আমি বুঝি কেবল কাঁদি?"

"কাঁদো না? চুপি চুপি?"

"বড় আস্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে তোর!" বলিয়া মায়ার মাথাটি খুব জোরে ঝাঁকাইয়া দিয়া তটিনী ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। মনে মনে ভাবিল এই ভীরু বালিকা ময়াটাকে শাসাইয়া দিবার মত শক্তিও কি সে হারাইয়া বসিয়াছে না কি?

কোনো শিশুকে নাড়া চাড়া করিবার সুযোগ তটিনী যে যাবৎ পায় নাই তাই কচি ছেলের নামেই যে একটা অজানা আতঙ্ক তা'র ছিল, মায়ার ছেলে বড় হইতেই সেটুকু ঘুচিয়া গেল। অল্প দিন কয়েকের মধ্যেই এই ছেলেটিকে সে ভালবাসিয়া ফেলিল।

তারিণী বাবু কিন্তু এ শিশুটির দিকেই চোখ তুলিয়া চাহিতেন না। অনেকগুলি ঘা খাইয়া খাইয়া তাঁর মনে অস্থায়ী বলিয়া যতগুলি জিনিষের ধারণা ছিল তার মধ্যে এই শিশু-গুলিই সর্ব্বপ্রধান। এজন্য তটিনী তারিণীর সম্মুখে এই শিশুটিকে আদর করিতেও

কুণ্ঠিত হইত! কিন্তু অল্প দু'চার পা হাঁটিতে শিখিবার পর আর তাকে দূরে সরাইয়া রাখা চলিত না।

সেদিন নিতায়ের জ্বর হইয়াছিল বলিয়া অন্য একজন চাকর আসিয়া বলিল "কর্ত্তার চশমা তিনি তাঁর শোবার ঘরের কোথাও ফেলে গেছেন, খুঁজে দিতে বল্লেন।"

অন্য দিন এসব ঠিক রাখিত নিতাই। তাই কিছু খুঁজিতে হইত না। তটিনী বালিসের নীচে, বিছানার এদিক ওদিক যখন চশমা খুঁজিতেছিল সেই অবসরে তাদের ক্ষুদ্র দস্যুটি চেয়ারে উঠিয়া টেবিলের উপরকার দোয়াতদানী উল্টাইয়া মেঝেয় ফেলিয়া দিল।

তটিনী সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল "যাঃ! কি কর্‌লি ডাকাত!"

টবিলের কাগজপত্র সব কালী মাখামাখি হইয়া গেল। ঘরের ম্যাটিংএর উপরও খুব খানিকটা কালী ছড়াইয়া পড়িল, এই সব দেখিয়া তটিনী তার পিতার অসন্তোষের ভয়ে যখন শঙ্কিত, তখনও খোকা দু'হাত ঘুরাইয়া হাসিমুখে বলিতেছে—"যাঃ! যাঃ!"

তটিনী তার গাল টিপিয়া আদর করিয়া বলিল 'আবার যাঃ যাঃ!'

মায়া আসিয়া ছেলের কাজ দেখিয়া ভয়ে মুখ বিবর্ণ করিয়া বলিল "কি হবে তিনুদি, মামা ভয়ানক রাগ করবেন যে, ছেলে মাকে দেখিয়া আরো হাসিয়া বুকে পেটে কালি মাখিয়া তার শুভ্র সুন্দর হাত দিয়া পেট চাপড়াইতে লাগিল। তটিনী মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "পাগল আর কি? বাবা আর বুঝবেন না বুঝি যে, কোন বুদ্ধিমান মানুষটীর কাজ!"

তারিণী বাবুর কোর্ট হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই শিশু দস্যুটীর উৎপাতের চিহ্ন বড় বেশী কিছু দেখিতে পান নাই। কেন না তটিনীর সতর্ক হাত আগেই সমস্ত পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু ম্যাটিংএ কালীর ছোপ দেখিয়া ও সমস্ত শুনিয়া তিনি একটু হাসিলেন। এই ক্ষীণ হাসির মাঝে একটুও রাগের উষ্ণতা ছিল না।

এই দিনই বেড়াইতে যাইবার সময় তিনি তাঁর ছড়ির আগা দিয়া খোকার মাথায় মৃদু ঘা দিয়া হাসিয়া বলিলেন "কি হে,—আমার ঘরেও যাওয়া আসা সুরু করেছ বুঝি?"

সে এমন আদর ইতি পূর্ব্বে কোনদিন পায় নাই। প্রথমে দুমিনিট বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল, তারপর তার নিজের হাতের রঙীন ছোট লাঠি গাছটী তুলিয়া দেখাইয়া বলিল "মাঃ"

তারিণী বাবু আরো একটু হাসিয়া চলিয়া গেলেন। খানিকটা দূরে গিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, লাঠি ফেলিয়া দিয়া সে তখন তার কোমল ছোট ছোট হাত দুখানি বাড়াইয়া দিয়া তাঁকে 'আয়' 'আয়' করিয়া ডাকিতেছে !

সহসা তারিণী বাবুর মুখের হাসির দীপ্তি নিভিয়া গেল।

দিন কতক পরে একদিন খবর আসিল মায়ার পিতা মারা গিয়াছে। তিনি বহু দিনকার রুগ্ন ছিলেন। বাঁচিবেন না ইহা সকলেই জানিত, অতুল নিজেই এ খবর সঙ্গে করিয়া কলিকাতা হইতে আসিয়া মায়াকে শুনাইল। পিতৃশোকাহতা মায়া খুবই কাতর হইয়া ক'দিন অবিশ্রাম কাঁদিতেছিল ! তার বেদনা কাতর মুখ দেখিয়া তটিনী তাকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইত না।

ভোরে ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিয়া তটিনী নিজের ঘরের জানালা খুলিবামাত্র দেখিল এই প্রত্যুষেই মায়ারও ঘরের জানালা খোলা।

আবরণহীন খালি তক্তপোষের উপর অতুল বসিয়া আছে আর ব্যাথিতা মায়া তার লুণ্ঠিত মাথাটী স্বামীর বুকে অর্পণ করিয়া দিয়াছে !

তটিনী সরিয়া আসিয়া নিজের বিছানার উপরেই আলস্যে শুইয়া পড়িল! অতুল বলিতেছিল "কেঁদ না মায়া। বাপ্ মা কি কারু চিরদিন থাকে ? পিতৃহীন সবাইকেই হ'তে হয়—"

নিস্তব্ধ প্রাতের কথা বলিয়াই কথাগুলি তটিনীর অনিচ্ছাতেও তার কানে আসিয়া বাজিল। সে অকারণ কেমন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। পিতৃহীন সকলকেই হইতে হইবে ? একি ভয়ানক কথা !

আচ্ছা ! তবে ঐযে অজস্র চুম্বনবর্ষী সান্ত্বনাদায়ক স্বামী ! উনিই কি তবে—?

অকস্মাৎ আর একখানি শুভ্র বরণ মুখ মনে করিয়া তার আপাদ মস্তক একটা বেদনাময় বিদ্যুৎশিখা বহিয়া তাকে অবশ করিয়া দিয়া গেল !

মরণ তো মানুষ মাত্রেরই আছে। মৃত্যু বিচারে শৈশব, কৈশোর যৌবন বার্দ্ধক্য কোনো প্রভেদ নাই। নাই-ই তো।

তা হইলে? সেই সুদুর্গম দূরদেশে,—স্বজাতীয় দূরের কথা, একজন স্বদেশীয় বন্ধুও হয় তো কোথাও কেহ নাই! মৃত্যুরই সে লীলাক্ষেত্র! তটিনীর মাথার কাছে খোলা জান্‌লার পাশ দিয়া এক ঝাঁক কাক বিটক চিৎকার করিয়া উড়িয়া গেল।

তটিনী কেমন আবিষ্টের মত মুখে হাত চাপা দিয়া পড়িয়াছিল। মায়ার ঘরে ছেলে জাগিয়া কান্নকাটি করিয়া আবার শান্ত হইয়া চুপ করিল।

সুপ্ত বাড়ীখানায় জাগরণের সাড়ায় আবার দৈনন্দিন কাজের তাড়া হুড়ার স্রোত চলিল। সামনের দালানে কর্ত্তার চটি জুতার শব্দ নীচে অবধি নামিয়া গেল, উঠি উঠি করিয়াও তটিনী উঠিতেছিল না!

যখন তপ্ত আলোর ঝলক তার পর্দ্দাগুলির ফাঁক দিয়া আসিয়া চোখকে পীড়িত করিয়া তুলিল, তখনই সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিল।

(২০)

অতুল বাসায় ছিল না। মায়াও তার পিতার মৃত্যুর পরই বাপের বাড়ী গিয়াছিল। অতুল কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিল। কিন্তু বেড়াইতে বাহির হইলে সে প্রায় সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাসায় ফিরিতে জানিত না।

তটিনী আবার নীরব নির্জ্জনে একা একা দিন কাটাইতেছিল। তবে দু'দিনকার আনন্দ চর্চ্চার অভাবে মাঝে মাঝে কেমন অশান্তি মনে করিত।

একটা সেলাই শেষ করিয়া তার সুতা কাটিবার জন্য সে কাঁচি খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। নিজের আলমারী দেরাজ বা সেলাইএর বাক্সে যখন খুঁজিয়া পাইল না, তখন তার মনে পড়িল যে কাঁচিখানা মায়া একদিন লইয়াছিল বটে! তবে তার ঘরেই থাকা সম্ভব।

অতুলের ঘরের টেবিলে খুঁজিলে অনেক জিনিষই মিলিত। তটিনী ঘরে ঢুকিয়াই টেবিল খুঁজিল। কিন্তু টেবিলে কাঁচি মিলিল না। উঁচু শেল্‌ফের উপর একটা শ্বেত পাথরের পরী মূর্ত্তির পাশ দিয়া কতকটা লাল ফিতা ঝুলিতেছিল।

তটিনী ফিতা ধরিয়া টানিলে একখানি চিঠি ও কাঁচিখানা ঘরের মেঝের পড়িল! চিঠিখানার অষ্টে পৃষ্ঠে 'শিল' করা দেখিয়া তটিনী একবার সেখানার উপর চোখ বুলাইয়া দেখিল। একখানি কার্ড মাত্র!

অপরিচিত হস্তাক্ষর। তটিনী পড়িল লেখা আছে—

"মহাশয়!

আমি আপনার অপরিচিত। কিন্তু আমার বন্ধু পীড়িত ডাক্তার বারীন্দ্র সেনের সহিত বোধ হয় আপনার পরিচয় আছে! তিনি এখন পীড়িতাবস্থায় চৈতন্যহীন। তাঁহার কোনো আত্মীয়কে আমরা জানি না। তাঁর নিকট আপনার লিখিত দু একখানি পত্র দেখিয়াছি সেজন্য আমরা অনুমান করি আপনিই হয় তো তাঁর আত্মীয় হইবেন অথবা তাঁর কোনো আত্মীয়ের সহিত আপনার পরিচয় আছে। সেই জন্য ইঁহার সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ একমাত্র আপনাকেই জানাইতেছি। ইনি যে কাজের জন্য আসিয়াছিলেন তাহা শেষ করিয়া সরকারী কাজে ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইবার সময় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন—

তটিনীর পা দুখানা অকস্মাৎ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল সে জানলার গরাদে চাপিয়া শূন্য দৃষ্টি মেলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল! প্রখর দিনের আলোকরশ্মি তার চোখ ধাঁধিয়া কালো হইয়া উঠিল!

সে কেহই না হউক,—না হয় সে একজন নিঃসম্পর্কিত পর, তবু তো একজন পরিজন-হীন নিঃসহায় রোগী এখন! হয় তো বা সেই তরুণ প্রাণটী শুশ্রূষার অভাবে আগ্রহের অভাবে অসময় নষ্ট হইয়া যাইবে। কেহ ভ্রূক্ষেপও করিবে না। কাহারো কোনো ক্ষতি তো তাতে নাই! তাঁর যে কেহ আপনার নাই!

কাঁচি হাতে করিয়া তটিনী উপরে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল।

শাসনসংযত মনকে শান্ত করিয়া আবার কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ক্রমাগত সেলাইতে ভুল হইয়া যাওয়ায় সে বিরক্ত হইয়া সেলাই তুলিয়া ফেলিল। পশ্চিমে দিনান্তের রাঙা আলো ক্রমে ম্লান হইয়া নিবিয়া আসিতেছিল দেখিয়া সে তারিণীবাবুর জন্য জলখাবারের ফল কাটিয়া দিতে গেল।

সে দিন সেই ভারাক্রান্ত মন লইয়া সে আর পিতার নিকট যাইতে সাহস করিল না।

যদি মনের দাগ কিছু মুখের উপর ফুটিয়া উঠে তো সে তো মিথ্যা বলিয়া ঢাকিতে পারিবে না!

মিথ্যা কথা বলিয়া পিতাকে ফাঁকি দিবে? ছিঃ ছিঃ, অতখানি হীনতা সে স্বীকার করিতে পারিল না। আর সত্য বলিতে গেলেই বা সে কি বলিবে? সত্য যাহা তা যে সে নিজেও ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না।

রাত্রে পিতার আহারের পর রুগ্না মহেশ্বরীকে কিছু খাওয়াইয়া ঝি চাকরদের খাইয়া লইবার আদেশ দিয়া তটিনী নিজেকে বিছানার মধ্যে ফেলিয়া যখন একটু আরামের নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল মনে করিতেছে সেই সময় তুলসীয়া আসিয়া ডাকিল।

"দিদিমণি, আজ খাবেন না?"

তটিনী মৃদুকণ্ঠে বলিল "না, না, তুই যা। এক কথা একশোবার না বললে তোরা শুনতে পারিস্‌নে না কি?"

তুলসী একটু থতমত খাইয়া আবার বলিল "খাবেন না তা হলে?"

"না, যা তুই।"

পাশের ঘর হইতে তারিণীবাবু বলিলেন "কেন, তিনু মা, তোমার শরীর ভাল নেই বুঝি?"

তাঁর স্বর যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। তটিনী একটু কুণ্ঠিত ভাবে বলিল "না, না, ভালই আছি বাবা! খিদে ছিল না বলেই খেতে ইচ্ছে করচে না।"

"তাই তো! শরীর ভাল আছে তো. খিদে কেন হল না? তা হলে থাক্‌, আজ আর কিছু খেওনা।"

তুলসী চলিয়া গেল। তটিনীর তিক্ত মনে ভাবিল এত গোলমাল হইবে জানিলে সে খাওয়াটা চুকাইয়াই আসিত! কিন্তু অন্য পক্ষে অত্যন্ত অস্ফুট একটা সংশয় জাগিল, যে এই আহারটার অধিকার তার এখনো আছে কি না কে জানে?

সমস্ত দেহ বারংবার শিহরিয়া উঠিয়া তটিনী বিনিদ্র চোখ দুটী জলের অভাবে কেবল জ্বালা করিতে লাগিল। সে নিজে মনের এই দুর্ব্বলতাকে একটা বিরাট বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া ভাবিতে চেষ্টা করিল। পিতার অতুল স্নেহ অগাধ বিশ্বাসের সে একি প্রতিদান

বসিয়াছে? ভূমিকম্পের অনতিপূর্ব্বে শান্ত ধরিত্রীর গর্ভে যে একটা উতপ্ত বিপ্লব উর্দ্ধমুখে ফুটিয়া উঠিবার জন্য ঠেলাঠেলি করে, তেমনি অন্তরুদ্ধ বাষ্পোচ্ছ্বাসের বিপ্লব তটিনীকে দহন করিতেছিল। এমন আগুণ নির্ব্বাণের জন্য যে ধারাভিষেকের একান্ত দরকার, কোথায় সেই স্নিগ্ধ সুশীতল জলের ধারা?"

অনেক রাত্রি অবধি জাগিয়া তারিণীবাবু পড়াশুনা করিতেন। অল্পরাত্রে আহার করিয়া অর্দ্ধরাত্রি জাগরণ তাঁর অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। বিছানায় শুইয়াই তিনি পড়িতেছিলেন। সঙ্কুচিত পদে অতুল আসিয়া খাটের কাছে দাঁড়াইল। তিনি চোখ তুলিয়া তার দিকে চাহিলেন।

অতুল নিজের ঘাড়ে হাত বুলাইয়া, একটু কাসিয়া বলিল "আপনি একবার বারীনের খবর জান্‌তে চেয়ে ছিলেন,—তাই—"

"কি, তাই? সে খবরে আর তো কোনো কাজ নেই, আবার, কোনো নতুন খবর আছে না কি?"

"নতুন? তা ঠিক নয়,—বারীনের খুব শক্ত ব্যারাম ব'লে তার কে একজন বন্ধু চিঠি দিয়েছেন—"

"কাকে? আমাকে? আমাকে কেন চিঠি দিতে গেল সে?"

"আজ্ঞে না আমাকে লিখেছে,—এই যে চিঠিখানা⋯"

"ও আর আমি কি দেখবো।"

বলিয়া তারিণীবাবু মুখ ফিরাইয়া লইবার আগেই অতুল চিঠিখানা তাঁর বালিশের উপর রাখিয়া দিল তিনি কি ভাবিয়া চিঠিখানা পড়িয়া দেখিলেন। "হুঁ"—

কিছুক্ষণ তিনি স্থির ভাবে কি যেন ভাবিলেন। অতুল ফিরিতেছিল দেখিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া ডাকিলেন "শোন অতুল!"

অতুল ফিরিয়া দাঁড়াইল। তারিণীবাবু বলিলেন "দ্যাখ এ চিঠির খবর তোমার মাকে কিংবা তিনুকে যেন কিছু বলো না।"

"আচ্ছা।"

"আচ্ছা অতুল, তোমার কি মনে হয় বল তো?"

অতুল খুব আশ্চর্য্য ভাবে চাহিয়া রহিল,—যেন প্রশ্নটা ঠিক তার মাথায় ঢোকে নাই !

তারিণীবাবু আবার বলিলেন: "তোমার কি মনে হয় যে বারীনের অবস্থা খুব খারাপ, অথবা —"

"না তা মনে হয় না। এ চিঠিখানাতে ঠিকানার গোল ছিল ব'লে অনেক ঘুরে এসেছে,—এতদিনে হয় তো সে সেরে গিয়েছে।"

তারিণীবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া সহসা গভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন "কি শত্রুতাই যে আমার দাদা করে রেখেছেন !

অতুল নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সহসা সেই ঠাণ্ডার দিনেও তারিণীবাবু হাত পাখাখানা তুলিয়া লইলেন। তাঁর কপালের উপর অল্প ঘাম ফুটিয়া উঠিতেছিল। তিনি একটু থামিয়া বলিলেন "তুমি পারো তো আর একবার নয় জেনো যে সে—না, না এ চিঠিখানা সত্যি কি না ?

"যাবার সময় নীচে থেকে নিতাই কে ডেকে দিয়ে যেও বলো যেন এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল নিয়ে আসে।"

অতুল নামিয়া গেল। নিতাই জল আনিলে এক নিশ্বাসে সমস্ত জলটা খাইয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন। নিতাই তাড়াতাড়ি বইগুলি সরাইয়া আলো কমাইয়া দিয়া গেল। এমন অসময়ে কর্ত্তা যে নিদ্রার আয়োজন করিবেন সে তাহা বুঝিতে পারে নাই।

সে সবিস্ময়ে ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল মাত্র সাড়ে নয়টা।

বিছানায় চক্ষু মুদিয়া শুইয়া পড়িয়া যখন কর্ত্তা প্রতিকার উপায়হীন ভাবনায় ডুবিয়াছিলেন, তখন তাঁর দরিদ্র ভৃত্য নিতাই নিশ্চিন্ত মনে ভূমিশয্যায় গভীর নিদ্রার সুখ উপভোগ করিতেছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীনীহারবালা দেবী।

আহুতি

জীবন-বেদীর' পরে স্মৃতিবহ্নি জ্বালি
যে যজ্ঞ করিছ, হোতা, দিলাম গো ঢালি
এ প্রাণ আহুতি তাহে ; জ্বলুক অনল—
শিখা তার হোক ব্যাপ্ত ত্রিলোক মণ্ডল !
সরবস্ব তুমি মম ; আমি তোমা ছাড়া—
জলহীন নদী, যেন চক্ষু দৃষ্টিহারা !
অন্তর হতেই এসেছিলে বাহিরিয়া,
গিয়েছ গো পুন সেই অন্তরে ফিরিয়া !
এ জীবন—প্রতি দিবসের পাত্র ভরি,
যতনে তোমার তাই অধরেতে ধরি ;
কর তুমি কর পান, প্রাণের দেবতা,
হউক সফল মোর সর্ব্ব ব্যাকুলতা !
যেমন চন্দন হয় ঘর্ষণে সফল,
ধূপের জীবন, মরি, অনলে কেবল !

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ।

স্বাস্থ্যের কথা।

——:•:——

রোগ হয় কেন ?

রোগের প্রথম কারণ--পৈতৃক কারণে অস্বাস্থ্যতা অর্থাৎ ধাতু বা রক্তগত দোষের জন্য। কাহারো সর্দ্দি ধাতু, কাহারো কুৎসিত ব্যারামের ধাতু, কাহারো পৈতৃক নেশা করার ফলে মৃগীর ব্যারাম হয়। মনে রাখিতে হইবে; পিতা মাতা হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রোগের বীজ অতি অল্পই সংক্রামিত হয়—রোগী রোগপ্রবণতা প্রাপ্ত হয় মাত্র; অর্থাৎ জন্মের পূর্ব্বে পিতামাতার ক্ষয়কাশের ব্যারাম থাকিলে পুত্র নিজ দেহে ক্ষয়কাশ বা ক্ষয়কাশের রোগের বীজ লইয়া জন্মে না—সে সেই রোগপ্রবণতা লইয়া জন্মায় মাত্র। অপর পাঁচজন যেখানে বা যে অবস্থায় থাকিলে ক্ষয়কাশ হয় না, সে ব্যক্তির সে অবস্থায় ক্ষয়কাশ হইবার খুব সম্ভব।

রোগের দ্বিতীয় কারণ—যথেষ্ট আহারের অভাব। দু'বেলা পেট ভরিয়া টাট্‌কা আহারীয় খাইতে পাইলেই যথেষ্ট। যে যে খাদ্য অভ্যস্ত, সে সেই খাদ্য খাইয়া যদি দেহের বল ও পরিশ্রম করিবার সামর্থ বজায় রাখিয়া বেশ স্ফূর্ত্তিতে থাকিতে পায়, তবে সেই খাদ্যই তাহার যথার্থ ও যথেষ্ট খাদ্য। যে কোনও গতিকে দেহটীকে বজায় রাখাই যথেষ্ট নহে;—নিজের ন্যায্য পরিশ্রম করিবার যথেষ্ট সামর্থ্য দেয় এবং পরিশ্রম করিবার পরও শরীরে স্ফূর্ত্তি জন্মায়—এমন ভাবের খাদ্য পাওয়া চাই। যে দেশের লোকেরা বেশ খাইতে পায়, সে দেশে ব্যারাম খুবই কম—এবং সে দেশের লোকের ব্যারাম ধরিলে, তাহারা ভোগেও খুব কম। আমাদের দেশে সকলে পেট পুরিয়া দুবেলা খাইতে পায় না—এই জন্য আমাদের দেশে ব্যারামে পঙ্গপালের মত লোকে মরিয়া যায়। এই একই কারণে গরীব দুঃখীরাই বেশী বেশী মারা পড়ে। কোনও খাদ্য কোনও লোকের পক্ষে যথেষ্ট কি না, তাহা বুঝিবার উপায় কি কি, তাহা উপরে বলিয়াছি—শরীরের সামর্থ্য পরিশ্রমের ক্ষমতা ও শরীরের স্ফূর্ত্তি। কি কি গুণ থাকিলে খাদ্য উপকারী হয় তাহার স্থূল কথা এই—খাদ্য যথাসম্ভব টাট্‌কা হওয়া চাই, সহজে হজম হওয়া চাই, দুধ, ঘি, শাকসজী তাহার মধ্যে থাকিলে ভাল হয়। আমাদের এদেশে

খাদ্যসম্বন্ধে সাধারণে যেমন উদাসীন, ডাক্তারেরাও তেমনি মূর্খ। শেষের কথাটী আমি বেশ জোর গলায় বলিতেছি। সাধারণ লোকের মধ্যে যাঁহারা ঔদরিক, তাঁহারা খাবারের আস্বাদ, আকৃতি ও গঠন এবং পরিমাণ সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত হইলেও, খাদ্য দ্রব্যের উপাদান সম্বন্ধে উদাসীন। এবং কি রোগীর পথ্য, কি গর্ভিণীর পথ্য, কি জনসাধারণের পথ্য—এই সকল অবস্থাতেই সাধারণের ঔদাসীন্য দোষাবহ। খাওয়াটা একটা আপদ-বালাই, খাওয়া মানে পেটের গর্ত্ত বুজান—এই দুইটী আমাদের দেশের লোকের ধারণা; এমন কি, তথাকথিত শিক্ষিত লোকের ধারণা! আর ডাক্তার প্রভুরা—তাঁহারা বিলাতী পুস্তকে যে সকল আহার্য্যের বিবরণ আছে, তাহাও যথার্থরূপে শিখেন না এবং দেশীয় খাদ্য সম্বন্ধে সগর্ব্বে অজ্ঞতা ও অবজ্ঞা দেখান। অথচ খাদ্যই দেহ ধারণের ও দেহ-পুষ্টির ও দেহ-রক্ষার প্রধান সহায়;—যে ব্যক্তি ভাল খায় তাহার রোগ কোথায়?

রোগের তৃতীয় কারণ—কুসংস্কার। যে দেশে যত কুসংস্কার, সে দেশে তত রোগের বাহুল্য। আঁতুর হইতে আরম্ভ করিয়া চিতাশয্যা পর্য্যন্ত আচার ও রীতিনীতির ঠেলা আমাদের দেশে বড় কম নয়। আঁতুরে ময়লা রাখার জন্য পেঁচোয় পাওয়া (ধনুষ্টঙ্কার), ঘরের গ্যাসে (কার্ব্বনিক অ্যাসিড দ্বারা) বিষাক্ত হইয়া মারা পড়া, প্রসূতির বাঁকা জ্বর (পিউরার পারাল ফিভার) এদেশে ভূরি ভূরি দেখা যায়। শৈশবে, খাওয়ানর দোষে যকৃতদোষ বা আমাশয় বা পেটের অসুখ; যৌবনে লেখাপড়ার চাপে, যৌবনসুলভ কুৎসিত অভ্যাসের ফলে—এবং রমণীদিগের পক্ষে পিঞ্জরাবদ্ধ থাকিয়া, বৎসরে বৎসরে সন্তান প্রসব করিয়া ও নিত্য দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া; বার্দ্ধক্যে হঠাৎ ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার উদ্দেশ্যে আহারাদির আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া বা অহিফেন বা মাদক দ্রব্য সেবনের ফলে;—এই সকল কারণে কত লোকই অকালে জরা ব্যাধিগ্রস্ত হয়! একমাত্র উদাসীনতাই আমাদিগের সর্ব্বনাশের মূল! এ দেশে সকলেই কতক কতক বিষয়ে এক একটী ক্ষুদ্র সন্ন্যাসী। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এ ক্ষণভঙ্গুর দেহের চিন্তা, এ অস্থায়ীর জন্য স্থায়ী চিন্তা—কি বিষম ঘৃণার কথা। ধর্ম্মভূম ভারত-ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া তুচ্ছ দেহকে ভাল রাখিবার চিন্তা অতীব পাপ কার্য। আবার আর এক দিক দেখুন;—দেহ ভাল ও নীরোগ রাখিবার জন্য চিন্তা ত কেহ করেনই না—কিন্তু আপনার এতটুকু সামান্য রোগ হইতে শিবের অসাধ্য যে কোনও রোগ হউক

দেখি, আপনি আপনার, গণ্ডগ্রামেও দশ সহস্র উপযাচক চিকিৎসক ও ব্যবস্থাপক পাইবেন। অথচ আমাদিগের অজ্ঞতা আকাশচুম্বী। আমরা জলকে নারায়ণ বলি; কিন্তু যে জল পান করি, সেই জলেই শৌচত্যাগ করি। আমরা বাতাসকে জীবন বলি; কিন্তু ঘরের জানালার বদলে গবাক্ষমাত্র এবং সেই জানালাও সর্ব্ব-বিধায়ে বন্ধ করিয়া রাখি। আমরা কাপড় ছাড়ি কথায় কথায়—কিন্তু ময়লা কাপড়ের পরিবর্ত্তে ময়লা কাপড়ই ব্যবহার করি। কোথাও ভাত সমেত থালা বসাইলে মাত্র সে জায়গা এঁটো হয় বলিয়া মনে করি; কিন্তু সমস্ত সহরের ধূলি যে মিষ্টান্নের উপরে মিনিটে মিনিটে জমিতেছে, সেই রাস্তা ও নর্দ্দামার ধূলিমাখা সন্দেশ রসগোল্লা নিজেরাও খাই এবং অপর লোককে খাওয়াইয়া তাহাকে সম্মানিত করি। কলিকাতায় বাস করিয়া যাঁহারা পাচক ও দাসী রাখেন, তাঁহারা যে নিত্যই বারবণিতা ও তৎসহজাত যাবতীয় কুৎসিত দ্রব্যাদির সঙ্গ করিয়া ধন্য হন, এ কথা তাঁহারা সকলেই সুস্পষ্ট ভাবে জানিলেও, চোখ বুজিয়া সহিয়া যান। এ সকলকে সংস্কার বলিব, না অজ্ঞতা বলিব, না ভোগ-বিলাসিতাজনিত কাপুরুষতা বলিব, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ফল কথা, এই ভাবে অসংখ্য কারণ-নিচয় অহরহ সমস্ত দেশ জুড়িয়া ঘটিতেছে; এবং তাহার ফলে নিত্য রোগ বাঙ্গলার নিত্য বিগ্রহ স্বরূপ হইয়া ভোগরাগ আরতি গ্রহণ করিতেছে।

রোগের চতুর্থ কারণ—জ্ঞানকৃত পাপ। চুরুট হইতে চরস পর্য্যন্ত এবং চা হইতে মদের প্যাঁচন (Punch) পর্য্যন্ত লোকে স্বেচ্ছায় সেবন করিতেছে। গৃহে সতীলক্ষ্মী থাকিতেও এবং অর্থাভাবের অজুহাতে "আইবড়" (?) কার্ত্তিক থাকিয়া, লোকে নানা রকম কুৎসিত ব্যারামকে স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন প্রদান করিতেছে। যে-সে হুঁকায় ধূমপান করা, যে-সে পাত্রে চা-পান করা, যে-সে সানকিতে যা-তা মাংস ভোজন করা, যে-সে মুখামৃত পান করা— এ সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হইয়া যায় না। ক্ষুধার সময়ে না খাইয়া, অক্ষুধার উপরে অর্দ্ধ-সিদ্ধ খাদ্য খাইয়া, ইংরাজের গোলামী করিয়া, অর্দ্ধাহারে বা পূর্ণাহারের পর হাঁপাইতে হাঁপাইতে রেলেরগাড়ী ধরিতে যাওয়া, বাবুয়ানির খাতিরে গরমের সময়ে দুপুরবেলা মর্কট সাজা (aping the European is dress,) লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ভোজনে হিন্দু-সাহেবী ও মোগলাই রন্ধনের বিবিধ ভোজ্য খাওয়া, কথায় কথায় নিজের মতে ঔষধ সেবন করা—

শরীরের উপরে আর কত অত্যাচারের তালিকা দিব? এই সকল অভ্যাসের ফল কবির কথায় শুনুন—

বিলাস, ব্যসনে সুখ, কিন্তু প্রাণ যয়!
ভোজনে ব্যারাম, পানে বিষ দেহে যায়
বিবেকে চাপিয়া উঠে আনন্দ তুফান;—
ক্রমে সেই বিবেকের না থাকে সন্ধান!

রোগের পঞ্চম কারণ—মন। দেহ নষ্ট হইলেও মন নষ্ট হয় না; সংস্কার ও প্রারব্ধ কর্ম্ম হইতেই মনের সৃষ্টি। সেই মনের যে কতদূর ব্যাপকতা ও শক্তি তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। পাশ্চাত্য জগৎ আজও মনকে যথার্থ সমাদর করিতে শিখে নাই। এ দেশের শিক্ষা ও চিকিৎসা-পদ্ধতি, যাহা ইংরাজ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত, তাহাতে মনের সত্ত্বা ও স্থান কোথায়, তাহা ত জানিতে দেওয়া হয়ই না,—পরন্তু, জানাইবারও কোনও সুযোগ পর্য্যন্ত রাখা হয় নাই। আমরা তাই মনের দিকে মন না দিয়া, ভোগায়তন এই শরীরটাকেই সর্ব্বস্ব করিয়াছি। অথচ মন যতটা শরীরের উপরে কায করে, তেমন খুব কমই জিনিষ করে। আমরা সহজে ভয় পাই, আশা বা আকাঙ্ক্ষা করিতে শিখি নাই, সহ্য করিবার ক্ষমতা হারাইয়াছি। মনের দুর্ব্বলতাই রোগের মূল। মন সবল থাকিলে, দেহ ভাল থাকে। মনের জোরে কদভ্যাস দূর করা ত যায়ই, ব্যারামকেও অনেক সময়ে দূর করা যায়। হিষ্টিরিয়া বা বায়ুরোগ ত ধরিতে গেলে ষোলআনাই মনের ব্যাধি। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য (Neurasthenia)ও অনেকটা মনের উপরে নির্ভর করে। এই মনকে লক্ষ্য করিয়াই হিন্দু কত কায করিয়াছেন; আর আজ আমরা নূতন করিয়া কাঁচা কথায় পাশ্চাত্যদিগের নিকটে সে কথা শুনিয়া ধন্য হইতেছি।

'স্বাস্থ্যসমাচার'　　　　শ্রীরমেশচন্দ্র রায়।

কর্দ্দম স্নান।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ নির্ধনীগণই স্নানের সময় কাদা মাখিয়া স্নান করে, তাহা ছাড়া অনেক ধর্ম্মপরায়ণ লোকেও গঙ্গাতীরে পলিমাটি মাখিতে দেখা যায়। কাদা মাখিয়া স্নান করায় ও ঘসার জন্য শরীরের অনেক ময়লা বাহির হইয়া যায় এবং এই জন্য কাদা মাখায় যে উপকার হয় বলিয়া বিশ্বাস আছে তাহা অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। পুরুষ পরম্পরা অন্যান্য ঔষধাদির ন্যায় এই চিকিৎসা চলিয়া আসিতেছে এবং বর্ত্তমান চিকিৎসকগণও ইহার গুণ আছে বলিয়া থাকেন। রোম সাম্রাজ্য যখন বিস্তৃত ও ধনী হইয়া পড়িয়াছিল তখন তথাকার বিখ্যাত ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের শরীর সুঠাম রাখিবার জন্য প্রায়ই কাদা মাখিতেন। আজ পর্য্যন্তও নানা প্রকার রোগী এই প্রকার চিকিৎসা করিয়া থাকে। যে মাটিতে নানা প্রকার রাসায়নিক ও খনিজ দ্রব্য মিশিয়া আছে সেই সকল কাদায় ঔষধের গুণ আছে। কোন প্রস্রবণ যাহার জলে অনেক খনিজ দ্রব্য মিশ্রিত আছে বা কোন পাহাড় যে স্থান হইতে গরম কাদা বাহির হইতেছে তথাকার কাদা বা মাটি উপকারী। এই সকল মাটি মাখিয়া স্নান করিলে বাত, মূত্রগ্রন্থির রোগ ও অন্যান্য রোগ আরাম হয় বলিয়া চিকিৎসকগণ বলেন।

শরীরের লোমকূপগুলি খুলিয়া পরিষ্কার হয় এবং তজ্জন্য খুব ঘাম হয় এবং সেই জন্য শরীর হইতে দূষিত পদার্থ সকল এবং রোগোৎপাদক বিষ সকল মূত্রগ্রন্থি এবং অন্যান্য যন্ত্রের মধ্য দিয়া বাহির না হইয়া ঘামের সহিত বাহির হয়। কোন কোন রকম কাদা একবার মাখিলেই গায়ের চামড়া নরম, মসৃণ এবং স্বাস্থ্যপূর্ণ হয় অন্য কোন প্রকার স্নানে এরূপ হইতে দেখা যায় নাই।

অনেকেই মনে করেন যে কাদা মাখিয়া স্নান করিলে ঐ কাদার যে সকল রাসায়নিক এবং খনিজ দ্রব্য ছিল তাহা লোমকূপের মধ্য দিয়া চর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে কিন্তু সম্ভবতঃ এ কথার কোন ভিত্তি নাই। চামড়ার আকর্ষণী শক্তি এত কম যে উপকার হইতে পারে এতটা জিনিষ গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু যে পাহাড় হইতে কাদা বাহির হয় এবং যে প্রস্রবণে খনিজ দ্রব্য আছে তাহার নিকটের কাদায় যে সকল রাসায়নিক ও খনিজ দ্রব্য সকল

আছে তাহা লোমকূপ ও ঘাম হইবার গ্রন্থি সকলকে উত্তেজিত ও শক্তি সম্পন্ন করিতে পারে ইহা সম্ভব।

যে সকল পাহাড় হইতে গরম কাদা বাহির হইতে থাকে তাহা খনিজ দ্রব্য পরিপূর্ণ। কত শত বৎসর ধরিয়া সেই কাদা নানা প্রকার বাষ্প, এসিড এবং গ্যাসের মধ্যে ফুটিতেছে তাহার ঠিক নাই। এই কাদায় অবশ্য অনেক পরিমাণ লৌহ, গন্ধক এবং অন্যান্য খনিজ দ্রব্য আছে এবং তাহায় রোগ উপশমের গুণ আছে। আগ্নেয় গিরির যে কাদা হয় তাহা তথায় ত পাওয়াই যায় কিন্তু যে সকল স্থানে আগ্নেয় গিরি এখন নাই সেখানেও কাদা পাওয়া যায়। পৃথিবীতে এই কাদা যথেষ্ট পরিমাণে আছে এবং যখনই কোন আগ্নেয়গিরি ফাটিয়া গিয়াছে তখন সহস্র সহস্র মণ কাদা বাহির হইয়াছে বলিয়া এই কাদায় মানুষের যতটা প্রয়োজন তাহা আর কমিবে না।

কাদা দেখিতে বিশ্রী, পিছল, এই জিনিষ গায়ে মাখিতে কিম্বা কাদার কুণ্ড নামিতে প্রথম প্রথম অত্যন্ত খারাপ লাগে কিন্তু যাহারা কাদার কুণ্ডে নামিয়াছে তাহারা বলে যে প্রথমবার ভাবটা দূর হইলে ইহাতে খুব আরাম বোধ ও আনন্দ অনুভব হইতে থাকে। পৃথিবীর নানা স্থানে স্নানের জন্য কর্দ্দম কুণ্ড আছে তাহাকে যে কাদা ব্যবহার হইয়া থাকে তাহাতে পলি ও গাছ পাতা পড়িয়া যে মাটি হইয়াছে তাহা খনিজ দ্রব্য যুক্ত প্রস্রবণের জলের সহিত মিশিয়া প্রস্তুত হয়। হেমন্ত কালে ইহা মাটি হইতে খুঁড়িয়া বাহির করা হয় এবং বসন্ত কাল পর্য্যন্ত রৌদ্রে স্তূপ করিয়া রাখা হয়। ইহা যখন শুকাইয়া আসে তখন এই মাটির রং বাদামী হয় এবং ইহাতে যে দুর্গন্ধ ছিল তাহা দূর হইয়া যায়। আফ্রিকার অন্তর্গত বোহেমিয়াতে এই মাটি পিসিয়া অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ করা হয় এবং তাহার সহিত যাহাতে খনিজ দ্রব্য আছে এমন প্রস্রবণের জল মিশান হয় এবং যে পর্য্যন্ত না উপযুক্ত মত কাদা হয় সে পর্য্যন্ত মিশান হইতে থাকে।

নানা দেশের কর্দ্দম স্নান নানা প্রকার, আমাদিগের দেশে কাদা সমস্ত গায়ে ও মাথায় মাখা হয়। সুইডেনে রোগীকে গরম জলে প্রথমে স্নান করান হয় তাহার পরে গরম কাদা দিয়া সমস্ত শরীর ঢাকিয়া দেওয়া হয় এই সময়ে একজন লোক সমস্ত গাত্র মলিয়া ও মাজিয়া দেয়, ইহা ধুইয়া ফেলিয়া দ্বিতীয়বার কাদা লাগান হয় এবং যে স্থানে রোগ তথায় ভাল

করিয়া ঘষা হয়। এখানকার কাদায় সমুদ্রজল মিশান হয়। তৎপরে আরও অধিক গরম জল দিয়া সমস্ত কাদা ধোওয়া হয় ও খনিজ পদার্থ মিশ্রিত প্রস্রবণের জল লইয়াও সমুদ্রের আগাছা দ্বারা ঘষিয়া দিয়া স্নান করাইয়া দেওয়া হয়।

কাদা দিয়া স্নান করিলে মানুষের স্নায়ুর খুবই উপকার হয়, একবার কাদার প্রতি ঘৃণা দূর হইলে কাদা স্নানে অনেক উপকার হয়। অনেক চিকিৎসকগণ মনে করেন যে কাদা মাখিয়া স্নান করিলে ইহা লোমকূপ খুলিয়া দেওয়া ও ঘাম নিঃসরণের কূপ সকল উত্তেজিত হওয়া ব্যতীত ক্ষুদ্র ধমনী সকলের এবং রক্ত সঞ্চালনের উপকার হয়। কোন বিখ্যাত চিকিৎসক বলেন যে সর্ব্বত্র রক্ত সঞ্চালন করিতে কর্দ্দম স্নানে যেরূপ হয় অমন আর কিছুতে হয় না। যখন সমস্ত শরীর কাদা দ্বারা ঢাকা থাকে যেমন পুলটিস দিলে হয় তখন শরীরের এক দিক হইতে অপর দিক পর্য্যন্ত রক্ত সঞ্চালন হইয়া থাকে এবং সম ক্ষুদ্র অংশে পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে পারে। এই গরম পুলটিশ লোমকূপ খুলিয়, অদৃশ্যরূপে ঘর্ম্ম নিঃস ণ করে যাহা স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে এত প্রয়োজন হয়।

ক্যান্সার রোগ ও খাদ্য

লণ্ডনের বিখ্যাত ডাক্তার এফ, ডব্লিউ, আলেকজাণ্ডার সম্প্রতি একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি ক্যানসার রোগকে বাধা দেওয়া যাইতে পারে কিনা সেই সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ তাঁহার মনে সন্দেহ হয় যে পনিরের উপরে যে একপ্রকার উদ্ভিজ্জজাতীয় পদার্থ সঞ্চিত হয়, এইসকল বীজাণু হইতে মানুষের শরীরে ক্যানসারের সঞ্চার হইতে পারে কিনা। কিন্তু বহু পরীক্ষা করিয়াও তিনি ইহার কোন মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

ডাক্তার রস বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, ক্যান্সার রক্তের ব্যাধি নহে। কিন্তু নরদেহের যে সকল কোষ পটাসিয়াম জাতীয় লবণ গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে সেই সকল

কোষ যদি রক্ত হইতে সেই লবণ যথোপযুক্ত পরিমাণে না পায় তাহা হইলেই কোষগুলি মৃত্যু মুখে পতিত হইয়া ক্যান্সারের সৃষ্টি করে।

খাদ্যের গুণাগুণের উপরেই মানুষের স্বাস্থ্য প্রধানতঃ নির্ভর করে কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আহার্য্য প্রস্তুতের প্রণালী এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে এইভাবে প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করিয়া দেহ গঠনকারী এই সকল কোষ জীবিত থাকিতে পারেনা। খাদ্য গ্রহণ বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা দরকার যে তাহাতে প্রচুর পরিমাণে লবণ জাতীয় পদার্থ আছে কি না।

যাঁহারা অধিক পরিমাণে মাংস আহার করেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রচুর পরিমাণে শাক সবজী এবং সুপক্ক ফল আহার করা একান্ত কর্ত্তব্য। শাক সবজী রান্না করিবার সময়ে অধিক জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল ফেলিয়া দিলে, তাহার লবণাক্ত পদার্থ চলিয়া যায়। এই ভাবে যে খাদ্য রান্না করা হয়, তাহা সুস্বাদু হইতে পারে, কিন্তু তাহার কোষ পরিপোষক পদার্থ বিনষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য শাক সবজী রাঁধিবার সময়ে অল্প জলে সিদ্ধ করিবে, এবং সেই জল জ্বাল দিয়া শুকাইয়া ফেলিবে। তরকারিতে জল না দিয়া যদি ষ্টিমে রান্না করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে দেহের কোষ পরিপোষক পদার্থ অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। গোল আলুর খোষা ফেলিয়া দেওয়া হয়, ইহাতে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী অংশটাই বর্জ্জন করা হয়। সুতরাং খোষা শুদ্ধই আলু আহার করা উচিত। আলু রাঁধিবার পূর্ব্বে অধিক্ষণ ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখিলেও তাহার গুণ নষ্ট হইয়া যায়; তাহাতে তাহার শ্বেত সার জাতীয় অংশ মোম জাতীয় পদার্থে পরিণত হয়।

মোটের উপর কথা এই, (১) দেহের কোষগুলির পোষণের জন্য পটাসিনাম জাতীয় লবণের প্রয়োজন; (২) শাক সবজী ও ফলে এই জাতীয় লবণ প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান; (৩) সুতরাং শাক সবজী ও ফল যথেষ্ট পরিমাণে আহার করা কর্ত্তব্য; (৪) শাক সবজী রাঁধিবার সময়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, ইহার অন্তর্গত লবণ জাতীয় পদার্থ বিনষ্ট অথবা বর্জ্জিত না হয়।

'সঞ্জীবনী'

বৃষ্টিশেষের রৌদ্র

—:o:—

বাহিরে বরষা, নিজ-গৃহ-কোণে
বসিয়াছিলাম চুপ,
সহসা উঠিল সোণালী রৌদ্র
পুলকিল রোমকূপ !
সিক্ত-পাদপ বনজ-লতিকা
সোণার আখরে লিখিল কথিকা,
(মরি !) পাতায় পাতায় সলিলবিন্দু
ধরিল মুকুতা রূপ !

নারিকেল-শিরে পাতাগুলি নাচে
সোণার বরণে মাজা,
দিকে দিকে জাগে নবীন চেতনা
উজল সরস তাজা,
তরীগুলি চলে মৃদুমন্থর
সুখের বেসাতে ভরা অন্তর,—
(যেন) সহসা সকলি সোণা হ'য়ে গেল
রূপ-নদে দিয়ে ডুব !

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

কুচবিহার পল্লী।

—:o:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১। ফকরেরাদিগের আল্লারছুলে বিশ্বাস আছে অপত্য সন্তান কামনা—বিপদব্যাধিমুক্তি প্রভৃতির জন্য সত্যপীর বা গাজীর সিরিনি দিয়া থাকে। দুধ, চিনি, ময়দা ও কলা এই সিরিনির উপকরণ। কলেরা, ক্ষিপ্ত কুকুর শৃগাল প্রভৃতির আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য পাগলাপীরের সিরিনি দেয়। দুধ, আতপতণ্ডুল, চিনির প্রস্তুত ক্ষীর এই সিরিনি। পুত্র কন্যার ভাবী অমঙ্গল নিবারণার্থ 'কাল' নামক প্রেতের কৃপাভিক্ষার জন্য কুক্কুট মানস করিয়া থাকে।

হিন্দুদের ন্যায় বিষহরি ও মদনকামের পূজা করিয়া থাকে। মৃতবৎসা নারীর সন্তান রক্ষার জন্য 'জখা' নামক প্রেতেরও কৃপা কামনা ইহারা করে।

২। মহরমে তাজিয়া দেয়। বাদ্য, নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়, মহরমের চাঁদের প্রথম তারিখ হইতে দশ তারিখ পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া থাকে। এই কয়েক দিবস মৎস্য ও কবুতর মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। গৃহিণী ঐ কয়েক দিবস অন্য গৃহে নূতন পাত্রে রান্না করেন।

৩। আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিবার জন্য প্রায় দশ দিন মাছ মাংস ভক্ষণে বিরত থাকে। নির্দ্দিষ্ট দিন গত হইলে মাটীর পাত্রাদি ফেলিয়া দেয়।

৪। বিবাহে গান বাজনা করে। বিবাহে স্ত্রীলোকেরা কপালে সিন্দুর পরে। বিবাহ-রাত্রে বর কন্যা গুটী লইয়া জলপূর্ণ পাত্রে একরূপ ক্রীড়া করে। ক্রীড়ায় জয় পরাজয় আছে। বিবাহের পরদিন বর কন্যা এক শয্যায় শয়ন করে। ঠিক ফুল শয্যার মত। কন্যার পিতা বরের পিতার নিকট হইতে পণ স্বরূপ টাকা লয়।

বিবাহের পর দিন উৎসব গৃহের প্রাঙ্গনে ক্ষুদ্র একটী বর্গক্ষেত্রের চারিকোণে চারিটী কদলী বৃক্ষ পুঁতিয়া অতি সুন্দররূপে লতা, পাতা, ফুলে সজ্জিত করে। কেন্দ্রস্থানে বর কন্যা উপবেশন করে। আর তাহাদিগকে ঘিরিয়া প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা নাচিয়া নাচিয়া

প্রেমোদ্দীপক গানে উৎসবালয় মুখরিত করিয়া অদ্ভুত ও অশ্লীল অভিনয় করিয়া থাকে। পুরুষ তখন অন্তর্ব্বাটীতে প্রবেশ করে না। দুষ্ট বালকেরা বেড়ার ফাঁক দিয়া বা নিকটবর্ত্তী বৃক্ষে আরোহণ করিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া থাকে। ঐ চতুষ্কোণ বর্গক্ষেত্রের নাম 'মাড়োয়া।'

৫। কুসীদ গ্রহণ প্রকাশ্য ভাবে ইহাদের ভিতরে প্রচলিত।

৬। মৃত মাতা পিতার আত্মার মঙ্গল কামনায় হিন্দুর শ্রাদ্ধের আদর্শে 'ফয়তে' করিয়া থাকে। 'ফয়তে' করার জন্যই ইহাদের নাম 'ফতেয়া।' নিম্নলিখিত প্রণালীতে ফয়তে অনুষ্ঠিত হয়।

ফয়তে প্রতি বৎসর পিতা বা মাতার মৃত্যু-উৎসব উপলক্ষ করিয়া গৃহকর্ত্তা একজন মোল্লাকে ডাকিয়া আনেন। রাত্রি দুই চারিজন নিমন্ত্রিত 'ফয়তেয়া' প্রতিবেশী আগমন করিলে, আহারীয়াদি প্রস্তুত হইয়া আসিলে গৃহিণী গৃহ-প্রাঙ্গনে কতকটা স্থান লেপিয়া একটু পূর্ব্বদিকে মোল্লার নমাজের চাদর পাতিয়া দেন। অতঃপর ঐ লেপা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিন্ন কদলী পত্র বিছাইয়া দেন এবং কর্ত্তার পিতৃ-পুরুষের তালিকার সংখ্যা অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পাতার উপরে অল্প অল্প করিয়া দুধ, চিনি ও আতপ তণ্ডুলের পায়স ন্যস্ত করেন। মোল্লা ঐ সকল দ্রব্যকে সম্মুখে রাখিয়া বসিয়া বসিয়া দুই রেকাত নমাজ পড়েন। নামাজে দুইটী প্রণিপাতে এক রেকাত হয়। তাহপর গৃহকর্ত্তার পিতৃ-পুরুষকে দোয়া করিয়া স্বয়ং কিঞ্চিৎ সিরনির স্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক ফয়তে সমাপ্তির ইঙ্গিত করেন। তখন বাড়ীর গৃহিণী, কর্ত্তা, বালক বালিকা সকলেই জানু পাতিয়া একে একে পশ্চিম মুখে ছেজদা বা প্রণিপাত করে।

এই অদ্ভুত কার্য্যটীর জন্য ইমানদার মুসলমানগণ ইহাদিগকে ফয়তেয়া নাম দিয়াছেন।

ফারাজীগণ উপরের বর্ণিত যাবতীয় অনুষ্ঠানকেই ঘৃণা করেন। ফারাজী স্ত্রীলোকেরা কপালে সিন্দুর দেওয়াকে জঘন্য কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করে। সিন্দুরকে তাহারা শূকরের রক্ত বলিয়া থাকে। গান বাজনা, তাজিয়া দেওয়া, সুদ গ্রহণ, পীরপূজা, বিবাহে বাজনা, ফয়তে, মৃত ব্যক্তির শোক প্রকাশের জন্য মাছ মাংস ভক্ষণ না করা, প্রভৃতি কার্য্যকে ফারাজীরা ঘৃণা করেন। ফারাজী দলের কেহ ঐ সকল কার্য্যে ফয়তেয়াদের সহিত যোগদান করিলে, কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হন। গ্রামের প্রধানগণই দণ্ডদাতা ও বিচারক।

কোচবিহারে হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে রাজবংশীর সংখ্যাই প্রায় চৌদ্দ আনা। ইহারা ও বঙ্গের রাজবংশীগণ এক জাতী নহে। রাজবংশী ব্যতীত এখানে অন্য শঙ্কর জাতিও রাজবংশী বলিয়া পরিচয় দেয়। বর্ত্তমানে হিন্দু—দুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন! এতদিন এক বিশ্বাস পোষণ করিয়া এক আচার ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও সম্প্রতি কতকগুলি হিন্দু ক্ষাত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেছেন! আমি ইঁহাদের নিন্দাও করিব না—প্রশংসাও করিব না! তবে আমি দেখিতে পাইতেছি, একদিন যাঁহারা পরস্পর আত্মীয় কুটুম্ব ছিলেন, যাঁহাদের ভিতরে বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল উৎসবাদিতে সময় অসময়ে পরস্পারের গৃহে সানন্দে ভোজন করিতেন—আজ তাঁহাদের মধ্যে একটি বিচ্ছেদ আসিয়াছে, একতা ভাঙ্গিয়াছে—কেহ কাহারও গৃহে ভোজন করে না, উৎসবে যোগ দেয় না, বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিঁড়িয়া গিয়াছে—হাটে পৈতধারী ক্ষত্রিয়গণ 'দাস' আত্মীয় কুটুম্বগণের দধি দুগ্ধ ক্রয় করে না। এক হুঁকায় তামাক পর্য্যন্ত খায় না!

যাহাই হউক এই নূতন ক্ষত্রিয় দলে বেশ একটা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দেখা যাইতেছে! ক্ষত্রিয় ছাত্রদলে একতা ও মমতা জাগিয়া উঠিয়াছে! ইঁহাদের সমাজ শুধু কুচবিহারে সীমাবদ্ধ নহে—উত্তর বঙ্গের বহু স্থানে ইহাঁদের ভ্রাতৃত্বের পরিধি বিস্তৃত হইয়াছে। রঙ্গপুর ও ধুবড়িতে ক্ষত্রিয় সমিতির নিয়মিত অধিবেশন হইতেছে! বলিতে কি, ইঁহাদের ভিতরে একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে! এ জাগরণটা ছাত্রসমাজেই সীমাবদ্ধ! গ্রাম্য পৈতধারী ক্ষত্রিয়গণ গোড়ামী ছাড়া বড় একটা কোন আদর্শের সাড়া পায় নাই! প্রাতিবেশী আত্মীয় কুটুম্ব 'দাস' ভ্রাতৃগণের গৃহে ভোজন না করা, এক হুঁকায় তামাক না খাওয়া ইত্যাদি ব্যতীত তাহাদের সংস্কারও বিশ্বাস পূর্ব্ববৎ রহিয়া গিয়াছে,—উন্নত চিন্তা তাহাদের মধ্যে প্রকাশ পায় নাই। পৈতাধারী ক্ষত্রিয় ও 'দাস' প্রকৃত পক্ষে একই রহিয়া গিয়াছে। কুচবিহারের উৎসবাদির আয়োজনে উভয় দলেই সমউৎসাহশীল।

১। এখানে হিন্দুদিগের মধ্যে মদনপূজায় বড় ধুম।—মুসলমানের 'সয়তান' আর এই 'মদন' প্রায় একই স্বভাব বিশেষ্ট! উভয়েই মানুষকে অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি দেয়, সাধারণের ইহাই বিশ্বাস! সয়তান মুসলমানের ঘৃণিত! শিক্ষিত হিন্দুগণও মদনকে ঘৃণা করেন! কিন্তু কুচবিহারবাসী হিন্দুগণ মদনের বড়ই ভক্ত!

চৈত্রমাসে এই মদন বা কামদেবের পূজা হইয়া থাকে! যেমন দেবতা, পূজাও তেমনি অদ্ভুত, অশ্লীল, পাপজনক! ঐ উৎসবের কয়েক দিবস কি বালক, কি বৃদ্ধ কি যুবক সকলেই নেংটী পরিয়া গায়ে কালিমাখিয়া, পুরাণো বস্তা, কম্বা প্রভৃতি কোমরে বাঁধিয়া অশ্লীল, অশ্রাব্য গানে দশদিক মুখরিত করিয়া দলবদ্ধ হইয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়, স্থানীয় হাটে বহুদল একত্র হইয়া বিকট ভঙ্গীতে নৃত্য করিয়া গ্রামের গুপ্ত-ব্যভিচার-কাহিনী ছন্দে গান করিয়া নীচ প্রকৃতির শ্রোতৃগুলীর আনন্দোৎপাদন করিয়া থাকে! এই সময়ে ভদ্র ও পবিত্রচেতা পল্লীবাসীগণ হাট হইতে দ্রুত গৃহে চলিয়া যান! বাড়ীর নিকটেও কোন কোন গ্রামে এইরূপ মিছিল হইয়া থাকে। তখন স্থানীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের অনেক লোক দল বাঁধিয়া এই সকল উন্মত্ত লোককে আক্রমণ করিতে আসেন! আমি নিজ চক্ষে এই বৎসর এইরূপ একটী তুমুল বিবাদ দেখিয়াছি! আমি বালসুলভ চপলতা হেতু নির্লজ্জের ন্যায় কোন কোন বৎসর ঐ সকল মিছিল দেখিতে যাই!

এই উৎসবের ফলে অল্প বয়সের ছেলেগুলিও অশ্লীল কথা ও ঘৃণিত কার্য্য শিখিবার সুযোগ পায়! এ উৎসবের প্রতিহার এযুগে নিতান্ত আবশ্যক।

২। কার্ত্তিকপূজা—কার্ত্তিক ঠাকুর চিরকুমার! সকল দেবতাই বিবাহিত! কার্ত্তিক ঠাকুর একলা, পবিত্র কৌমার্য্য ব্রতধারী! কার্ত্তিক পূজা হইয়া গেল, পুরুষেরা পূজা-প্রাঙ্গন পরিত্যাগ করে। তখন গ্রামের স্ত্রীলোকেরা তথায় মিলিত হইয়া গোপনে নিভৃত স্থানে রাত্রিতে কার্ত্তিক ঠাকুরের নীরস ব্রতে আনন্দের উৎসব করেন! যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা পূজা নামের অযোগ্য! উৎসব রাত্রিতে বালক, বৃদ্ধ যুবক গৃহে স্থির থাকেন—রমণীগণ একত্র হইয়া একটী নব-নির্ম্মিত কুশ-বেষ্টনীর ভিতরে কুমার কার্ত্তিক-সমক্ষে যে অভিনয় করিয়া থাকে, তাহা প্রতিবেশী দুষ্ট বালক-বন্ধুদের মুখে শুনিয়াছি! তাহারা ঐ রাত্রি নীরবে, অন্ধকারে বৃক্ষে আরোহণ করিয়া, প্রতিবেশিনীদের আনন্দ-বাজারের লীলা ভালরূপে দেখিয়াছে।

অথা—এটী একটী প্রেত! ইহার প্রেতনীর নাম অথ্‌নী। এই প্রেত বা প্রেতনী যে স্ত্রীলোককে আশ্রয় করে, তাহার সন্তান গর্ভেই মরিয়া যায় বা ভূমিষ্ট হইবার পর মারা যায়!

অশিক্ষিত হিন্দু ও ফরাতেয়াদলের মুসলমানেরা এই প্রেতকে পূজা করে!

বারুক ঠাকুর—ছাগ, বাছুর এই ঠাকুর চুরি করিয়া লুকাইয়া রাখে, তাহা পুনঃ প্রাপ্তির জন্য অনেকেই এই ঠাকুরের নামে পিষ্টক মানস করে!

বুড়ীঠাকুরাণী—অনেক ফরাতেয়া মুসলমান ও হিন্দুই এক বৎসর বা তাহার অধিককাল ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে সন্তানের মাথার চুল রাখিয়া দেয়। নির্দিষ্ট সময়ের পরে বুড়ীর পূজা করিয়া ঐ চুলগুলি কাটিয়া দেয়!

৭। হুদুমদেও—নামটাই অদ্ভুত! অনাবৃষ্টি হইলে পল্লীর হিন্দুগৃহিণী সকলে মিলিয়া ঢেঁকিতে মিছামিছি জল ভানে! ইহাই হুদুমের পূজা! এই পূজার ফলে বৃষ্টি হয়!

৮। মাষাণ—এটী কোপন স্বভাব অপ-দেবতা। এ যাহাকে আশ্রয় করে, তাহার বাঁচার ভরসা কম! ওঝার পরামর্শে মাষাণের পূজা করা হয়।

ইহা ব্যতীত আরও কত কুসংস্কারদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে।

স্ত্রীলোক রোগীকে ঔষধ সেবন করাইতে পারে না। করাইলে কোন ফল হয় না। কোন কোন পরিবারে পিতা ও পুত্র কন্যাকে ঔষধ সেবন করান না! অন্য লোককে ডাকিয়া আনা হয় শুধু ঔষধ সেবনের জন্য।

হিন্দুদের মধ্যে এরূপ প্রথা যে কেহ ভাগিনেয়-বধূর সহিত কথা বলিতে পারিবে না, তাহার দিকে চাহিবে না বা তাহার হাত হইতে কোন দ্রব্য গ্রহণ করিবে না।

পল্লীর মুসলমানদের মধ্যে ভাদ্র-বধূর হাত হইতে কোন দ্রব্য গ্রহণ করা মহাপাপ। বাড়ীর ভিতরে সকল স্ত্রীলোক খালি মাথায় বেড়াইতে পারে—কিন্তু ভাদ্র-বধূ ভাসুর সম্মুখে কখনও ঘোমটা না দিয়া বেড়াইতে পারে না। অবস্থা এমন দাঁড়ায়, ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর হয় ত এমন অসুখ যে বাঁচেনা, সকলেই তাহাকে দেখিবার জন্য তাহার গৃহে প্রবেশ করিতেছে—কিন্তু ভাসুর মহাশয় অদ্ভুত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া অশ্রুমোচন করিতে থাকেন! কোন বিদ্রোহী ভাসুর বাধা না মানিয়া যদি ভাদ্র-বধূর গৃহে প্রবেশ করেন, তবে ঐ শোক ও বিলাপের মধ্যেও তাহাকে তিরস্কৃত হইতে হয়!

এমন কি হঠাৎ যদি ভাসুর ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে ছুঁইয়া ফেলেন, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত আছে। সেই দিন ভাসুর ছাহেব উপবাস করিয়া রাত্রিতে কয়েকটা আকাশের তারা গণিয়া অন্ন গ্রহণ করেন।

পিতা, পিতামহ যে বৃক্ষ রোপন করেন নাই, বা যে ফসল আবাদ করেন নাই, বাধ্য পিতৃভক্ত সন্তানেরা কোন বিপদ আপদের ভয়ে ঐ বৃক্ষ রোপণ করে না—এইজন্য অনেকেই মালভোগ কলা রোপণ করে না। আমি নিজ চক্ষে দেখিয়াছি, আমাদের জনৈক প্রতিবেশী পীড়ায় শয্যাগত ছিলেন। বাঁচিবার আশা ছিল না! এমন সময়ে একজনে বলিল, তোমাদের বংশের কেহ শাকালুর চাষ করে নাই—আর তোমরা এবার বাড়ীর পিছনে শাকালু লাগাইয়াছ! তৎক্ষণাৎ একজনে গিয়া শাকালুগুলি সমূলে উৎপাটিত করিয়া দূরে ফেলিয়া আসিল।

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে আমি একটা মারাত্মক অভ্যাস দেখিতে পাই! স্নানের সময় তাহারা মাথা ভিজায় না! ছোট ছোট বালিকারা মাসের মধ্যে দুই এক বার যখন সাবান ব্যবহার করে, তখনই মাথার চুল ভিজায়। আর অবশিষ্টদিন মাথায় জল পড়ে না! যুবতী, বর্ষীয়সী রমণীগণ কোন কারণ বশতঃ মাসের মধ্যে তিন চারিটি দিন ভালরূপে স্নান করে—মাথা ভিজায় কিন্তু অবশিষ্ট দিনগুলি চুলগুলি কবরী-বদ্ধ থাকে! কেশের সহিত জলের সাক্ষাৎ আদৌ হয় না!

স্বামীমহোদয়গণ এ সম্বন্ধে কোনই তত্ত্ব লন না। নিজেরাই অধিকাংশ সময়ে কাকস্নান করিয়া থাকেন! অথচ আমাদের হাদিছে আছে, শরীরের একটী কেশ শুষ্ক থাকিলে স্নান জায়েজ বা ঠিক হইবে না!

বিশেষ দিন দেখিয়া আমাদের মা ও ভগিনীগণ সাবান বা ক্ষার দ্বারা মাথার চুল পরিষ্কার করেন! রবিবারে সাবান বা ক্ষার ব্যবহার নিষিদ্ধ! সংক্রান্তির দিবস কাবরী-বন্ধন মুক্ত করা ভয়ের কারণ! পুত্র কন্যার জন্মতারিখে মাথায় জল দেওয়া আরও গুরুতর দোষের বিষয়। এইবার আর একটী অদ্ভুত ও ভীষণ সংস্কারের উল্লেখ করিব!

গাও ছুয়া করা—কথার বিষ দৃষ্টিতে যে সকল স্ত্রীলোকে মৃতবৎসা হইয়াছে—সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া অল্পদিন পরে মারা যায়,—সেই ক্ষেত্রে দূরদর্শী পিতৃমহোদয়গণের বিশ্বাস, সন্তানকে

সত্বর বিবাহ দিলে আর সে মরিবে না। এইজন্যই এই কুচবিহারে দুই তিন মাস বা দুই তিন বছরের বহু বালক বালিকার বিবাহ হইতেছে! এই বিবাহকে বলে 'গাও ছুয়া করা'। আকাশের সূর্য্য যেমন সত্য আমার এই কথাও তদ্রূপ সত্য! কিছু দিন পূর্ব্বে আঠারকোঠা গ্রাম হইতে একটি নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম। সেটী বিবাহ-উৎসব বরের বয়স দুই বৎসর—কন্যার বয়স নয়মাস! ঘৃণায় সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে! শুধু প্রত্যাখ্যান নয়, বরের-পিতার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সহিত আমি গায়ে পড়িয়া ঐ বিষয় লইয়া ঝগড়া করিয়াছি! আমি যে দুই একখানি ইংরাজী কেতাব পড়িয়া মাটী হইয়া যাইতেছি এসম্বন্ধে সকলেই সমস্বরে নানা সাক্ষ্য দিতে লাগিল। পল্লী সমাজের আধুনিক শিক্ষার প্রতি অতিশয় অনাস্থা। তাহার এই সকল প্রথাকে কুসংস্কার বলিয়া ভাবিতেই পারে না এতই অন্ধকারে আজও ইহারা রহিয়াছেন। কোচবিহার পল্লীতে পল্লীতে শিক্ষা বিস্তার এখন অতি আবশ্যক। সহরের দুইচারিজন শিক্ষিতকে দেখিয়া দেশের প্রকৃত অবস্থা অনুমিত হইবার নয়! অনেক সময় দেখি শিক্ষিতগণ কেহ কেহ দেশের প্রকৃত অবস্থা ঢাকিয়া দেশের উন্নত অবস্থা বর্ণনা করিতে ভালবাসেন। ইহাতে আত্মপ্রসাদ লাভ হইতে পারে দেশের ভবিষ্যত উন্নতি কিছুতেই সাধিত হইবে না। এই মন্ত্রের রাজ্যে মন্ত্রের প্রভাবই প্রবল থাকিবে। এখানে এখন সবই মন্ত্রবলে সম্পন্ন হয়! শস্যক্ষেত্রে কীট ধরিয়াছে, কেহ জ্বরে ছট ফট করিতেছে, গায়ে দুর্বিষহ বেদনা, চক্ষু উঠিয়াছে, অঙ্গ ফাটিয়া গিয়াছে রক্ত পড়িতেছে, পীড়ায় রোগিণী অস্থির প্রলাপ বকিতেছে—এসবই মন্ত্রবলে ভাল হইবে! প্রকৃত পক্ষে ইহাদের কয়টি যে ভাল হয় তাহার খোজ কয়জন রাখেন? কত শত শত নিউমোনীয়া রোগী গর্ভ-ঠাকুরাণী আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া ঠাণ্ডা ঔষধ প্রয়োগে জীবন লীলা শেষ করিতেছে যে কে তার খবর রাখেন? এই সকল জীবনমরণ ব্যাপার, ইহার ঔষধ মন্ত্র নহে, শিক্ষার ব্যবস্থা দ্বারা এ সকল কুসংস্কার এ যুগে অপনোদন করা অতি আবশ্যক।

শ্রীফয়েজউদ্দিন আহম্মদ।

সত্যেন্দ্র-স্মৃতি।

-:•:--

সত্যেন্দ্র নাই—সহসা এ সংবাদ বঙ্গের গৃহে গৃহে যে শোক সন্তাপের, চাঞ্চল্যের সঞ্চার করিয়াছে, তাহা সত্যই মর্ম্মস্পর্শী,—অমর কবি বাঙ্গালী পাঠকের প্রাণে কতখানি স্থান অধিকার করিয়াছেন তাহার পরিচায়ক। কীর্ত্তিতে যিনি অমর, অমরধামে তাঁহার মহাপ্রস্থান শোকের নহে, প্রাণ বোঝে—কিন্তু মন ত মানে না—আত্মীয়বিয়োগজনিত শোকে হৃদয় শতধা করিয়া ফেলে। যিনি মহাপ্রস্থান করেন তিনি ত চিরশান্তিনিকেতন স্বর্গে চিরসুখী, কিন্তু এ মরধামে পড়িয়া থাকে যারা, স্বার্থরত তারা প্রবোধ মানে আর কোন প্রাণে! কবি যে অতুল অনাবিল আনন্দ প্রাণে প্রাণে ঢালিয়া দিয়াছেন সে উৎস অকালে এত সত্বর শুষ্ক হইয়া গেল! পাঠকপাঠিকার অতৃপ্ত-বঞ্চিত প্রাণ কি করিয়া তাহা সহ্য করিবে!

মৃত্যু কষ্টিপাথর। স্বর্গগতের গুণাগুণের পরিমাপক মহাকাল! যিনি কালের প্রভাবের অতীত,—কীর্ত্তিতে অমর তিনিই জগতে ধন্য। সত্যেন্দ্র ধন্য; অমৃত-আস্বাদী হইয়া তিনি জগতকে যে আনন্দ দান করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তাঁহার পিতামহ অক্ষয়কুমার তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তির জন্য অমর হইয়া রহিয়াছেন, সত্যেন্দ্রনাথও স্বাভাবিক কবিত্বে,—চরিত্রের ঔদার্য্যের জন্য বাঙ্গালীর প্রাণে চিরজাগরূক থাকিবেন। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় স্থান কোথায় তাহার বিচারের সময় এ নহে। যিনিই তাঁহার কবিতার রসাস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহাকেই এই বর্ত্তমান-যুগের ছন্দসম্রাটের প্রেরণায় আত্মহারা হইয়া ইঁহার অতুল কবিত্বে মুগ্ধ হইতে হইয়াছে। এমন খাঁটি, অনাড়ম্বর অনাবিল ভাবস্রোতের সহিত শব্দ-ঝঙ্কারের সমাবেশ খুব কমই দেখা যায়, স্বদেশপ্রাণতায় সত্যেন্দ্র সত্যই সত্যগ্রাহী ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কুলীনিগ্রহে, দামোদরের বন্যা উপলক্ষে রচিত কবিতায় তাঁর দেশপ্রাণতার যে পূর্ণ পরিচয়, তাহা অতুলনীয়। তাহার সুর আজও প্রাণে ঝঙ্কৃত হইতেছে। কে জানিত এত সত্বর অকালে এই সত্যিকার অমর কবি সত্যেন্দ্র মহাপ্রস্থান করিবেন। ১০ই আষাঢ় শনিবার

রাত্রি ২॥৹টার সময় জননী ও সহধর্ম্মিণীকে অকূল শোকসাগরে মগ্ন করিয়া কবির মহাপ্রস্থান। যিনি জগতের শোক দুঃখের একমাত্র সান্ত্বনাদাতা, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা মঙ্গলময় বিধাতা অমর কবির শোকাতুরা জননী ও সাধ্বী সহধর্ম্মিণীকে সান্ত্বনা দান করুন। সত্যেন্দ্র তাঁহাদের মরেন নাই, অমরধামে অনন্ত সুখ, চিরশান্তিতে অমর সত্যেন্দ্র আজ বিরাজিত! আজ মনে পড়িতেছে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের শোকসভায় স্বর্গগত কান্তকবি গাহিয়াছিলেন,—

"তবে কেন শোক!
যদি রে আনন্দময় পুণ্য পরলোক।
যে দেশে গেছেন ভাই,
সে দেশে বিষাদ নাই
সদানন্দ, সদা হাসি চিরসুখস্রোত।"

সে দেশে আজ অমর কবিগণের বরেণ্য সত্যেন্দ্র নিশ্চয়ই আদৃত,'—তবে কেন শোক!'

শোক-সভায় উদ্বোধন সঙ্গীত।

মোহন তোমার কোমল করের অঙ্গুলি
বুলিয়ে গেছে ফলিয়ে গোলাপ রঙগুলি
'ফুলের ফসল' স্বপন বোনে কুঞ্জবনের গন্ধে
'কুহু কেকার' 'বেণুবীণা' গুঞ্জরণের ছন্দে
—কোন তরুণীর দৃষ্টিখানির অঞ্জলি।

ছন্দে চপল চুম্‌কী-চুমো কুঙ্কুমেরি রঞ্জনে
বিশ্ব-বাণী বাজে বীণে পুষ্পপাখীর গুঞ্জনে
সন্ধ্যা এসে ডাক দিয়েছে গৈরিক আর ইঙ্গিতে
ক্লান্ত বাঁশী হারিয়ে গেছে মিলিয়ে নিখিল সঙ্গীতে
—রিশটিতে বিষ হিয়ায় উঠে চঞ্চলি ॥

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কবি সত্যেন্দ্রনাথ *

—:o:—

আজ এই শ্রাদ্ধবাসরে আমরা সকলে মিলিত হয়েছি আমাদের কবি সত্যেন্দ্রনাথের পরলোকগত আত্মার প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। এ হৃদয়ে তাঁর অকাল মৃত্যুর জন্য বেদনা এখনও নূতন হয়ে আছে, এখনও তার আত্মীয় স্বজন ও ভক্ত দেশবাসীর নয়ন হতে অশ্রুধারা শুষ্ক হয়ে যায় নাই। এরই মধ্যে তার শোকসভায় যোগদান করতে এসে মনে ভয় হয় যে আমাদের দেশবাসীর নিকট হতে তার যতখানি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রাপ্য ততখানি যদি আজ আমরা তাঁকে না দিতে পারি, অজ্ঞানতা বশতঃ যদি তাঁর যথার্থ সম্মান তাঁকে দেখাতে আজ আমরা কুণ্ঠিত হই, তবে যে দিন এ অপরাধ বুঝব সে দিনের কোনও ওজরই অনুশোচনার দহন থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। কিম্বা যদি অত্যধিক ভাবের বশে যতখানি তাঁর প্রাপ্য না, তাই তাঁকে দিতে উদ্যত হই তা হলেও জীবনের অপর পারে বসে তিনি কেমন অস্বস্তি বোধ করবেন, আমাদের এই সশ্রদ্ধ নিবেদন তিনি অসঙ্কোচে গ্রহণ করতে পারবেন না। জানি ভাষাহীন, নীরব শ্রদ্ধানিবেদনের স্থানও

* ২৮শে আষাঢ় কবি সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতিসভায় পঠিত।

এ সংসারে আছে, কিন্তু আজ আমরা যে স্মৃতিসভায় আহূত হয়েছি সেখানে সে নিবেদনের স্থান নাই। অসীম নীরবতায় যাঁকে ছেয়ে ফেলেছে তাঁর স্মৃতির অর্চ্চনা নীরবতায় যদিও সুন্দর সার্থক হয় তবুও আজ এ শোকসভার নিয়মানুযায়ী আমাদের নীরব থাকলে চলবে না, প্রাণমন খুলে শ্রদ্ধাভাজনের শ্রদ্ধা পাবার যোগ্যতার আলোচনা করতে হবে।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ যে শুধু তাঁর কবিত্বের বলেই দেশবাসীর মনে কতকখানি আসন জুড়ে বসেছিলেন তাতে কোন সন্দেহই নাই—তা না হলে, বাংলার সহরে সহরে পল্লীতে পল্লীতে তার মৃত্যুতে শোকাশ্রু বর্ষিতে হবে কেন, তা না হলে সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে আমাদের প্রাণে একটা প্রকাণ্ড অভাবের গহ্বর সৃষ্ট হবে কেন? আর তাঁর "তুলির আলপনার" আলেখ্যমালা কোমল, পরিপাটী মনোরম হয়ে আমাদের হৃদয়ে আনন্দের উৎস জাগাবে না, আর তাঁর বসন্তের "কুহু", নিবিড় বর্ষার "কেকা" ছন্দের দোলায় কোমল ও কঠোরে মিলে গিয়ে মরমে অব্যক্ত নিগূঢ় পুলকের শীহরণ তুলবে না—আর তার সাত সমুদ্রের আহৃত "তীর্থসলিলের" পূতধারায় বঙ্গভাষার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হবে না—একি আমাদের কম দুঃখের কথা। যা তিনি আমাদের দান করে গেছেন তা, সুন্দর হলেও অসম্পূর্ণ—এই "অসম্পূর্ণ আরম্ভের সফল পরিণাম "দেখাবার মত সময় যে তিনি পেলেন না এ চিন্তাই আমাদের দুঃখকে আরও তীব্র করে তুলেছে—এক অসহায় ক্ষোভের উচ্ছ্বাসে কণ্ঠ অবরুদ্ধ করেছে। কবির জীবনে ত সন্ধ্যা এসেছিল না তবুও তাকে যেতে হল। সকল তীর্থের স্বর্ণরেণুগুলি আহরণ করবার পূর্ব্বেই, "ফুলের ফসলের" বাগানখানি নানান ফুলের সুমিষ্ট গন্ধে ভরে তোলবার পূর্ব্বেই তাকে ওপারে পাড়ি দিতে হল—জানি না কোন মহাসাগরের সঙ্গীত তার এই মধ্যাহ্ন জীবনে তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছিল—জানি না ছন্দোময়ী ভাষার দোলায় নাচাতে নাচাতে কাল পয়োধির করাল তরঙ্গের ক্রোড়ে নৃত্য করতে তার আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল কিনা শুধু জানি যে আমাদের সত্যেন্দ্রনাথ আর নাই। ভাষার ঐন্দ্রজালিক সত্যেন্দ্রনাথ—ছন্দের অপরূপ শতভঙ্গিমার চঞ্চল নর্ত্তনে ছিল যার আনন্দ, সহজ সলীল ছন্দ প্রবাহে যে ভাবকে ডুবিয়ে দিয়ে এক সবুজ নবীনতার সৃষ্টি করত—সে সত্যেন্দ্রনাথ আর নাই। তাই সত্যেন্দ্রনাথের প্রয়াণে বিচ্ছেদ বেদনার সঙ্গে আমাদের সাহিত্যের দিকের ক্ষতির কথাও বিশেষ রকম প্রাণে জাগচে।

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলাসাহিত্যের নবীন যুগের কবি। রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক কবি-প্রতিভাবে আশ্রয় করে যে যুগের গীতিকাব্য গড়ে উঠেছে, সে যুগেরই আলো ও বাতাসের মধ্যে তাঁর জন্ম, সে যুগের শিক্ষা ও দীক্ষার মাঝে আজন্মবর্দ্ধিত ও প্রতিপালিত। এ যুগ অতি বড় যুগ; এ যুগেই ইউরোপের Renaissance যুগের মত মুক্তির এক উদার অবাধ হাওয়া কর্ম্মভাব চিন্তা ও তাদের প্রকাশের রূপকে বন্ধন হতে বিমুক্ত করে এক অভিনব বিচিত্র অজানার সাগরে ছেড়ে দিয়েছিল। ঐ মুক্তির কথা নিয়েই সে সময়ের সকল কবি আসরে নেমেছিলনে—কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান, যতীন্দ্রনাথ ও আমাদের সত্যেন্দ্রনাথ। কবিবর রবীন্দ্রনাথের আশীষ মাথায় করে বাংলাকে শুনাতে আসলেন তারা মুক্তির কথা, ভাবের কথা ভাবে মুক্তি, প্রকাশে মুক্তি গীতি কাব্যের সঙ্গীতের অংশ সুর, তাল, ছন্দ, ধ্বনি প্রভৃতির সংস্কার ও মুক্তিসাধনের এক ভগবদ্দত্ত অনুপ্রেরণা নিয়ে এসেছিলেন বিশেষভাবে আমাদের সত্যেন্দ্রনাথই। যদিও এ যুগের মর্ম্মের কথা রবীন্দ্রনাথের বিশ্বানুভূতির গভীরতা ও স্থৈর্য্য তাঁর কাব্যে আমরা তেমন পাই না, যদিও কল্পনা ও কবিপ্রেরণার আনন্দোদ্বেল মুহূর্ত্ত তাঁকে জগতের বিরাট রহস্য যবনিকার অন্তরাল্স্থিত অনন্ত সত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে দেয় নাই তবুও ছন্দের বাধামুক্ত বিচিত্র লীলা তাঁর কাব্যে এমন অপরূপ সুন্দর সহজ ঝঙ্কারের সৃষ্টি করেছে যে বাঙ্গালীর হৃদয়-বীণায় সে ঝঙ্কারের শেষ-রেশটুকুর প্রতিধ্বনি চিরদিনের জন্য বাজবেই বাজবে, সে ঝঙ্কার কখনও চঞ্চল, কখনও বা ক্ষীণালস—সেই ছন্দের মাঝে ফুটে উঠেছে কখনও বা আমাদের অন্তরের সখেদ-ক্রন্দন, আবার কখনও মন্দাকিনীতীর-পরিক্রমণশীলা সুন্দরী অপ্সরীর চপল চরণে মধুর নূপুরশিঞ্জিনী, কখনও বা গিরিতটলীলা নির্ঝরের করুণ ব্যথা আবার কখনও অসীম অপার মহাসাগরের প্রবল আন্দোলনলীলা। এইখানেই কবি সত্যেন্দ্রনাথের কবিত্বের বিশেষত্ব। এই বিশ্বের যেখানে যেখানে গতি পরিস্ফুট—যা আমাদের চোখের আলোয় ধরা পড়ে—তারই সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের কেমন যেন এক যোগ ছিল—বিশ্বের সেই স্পন্দনধারাতে ছন্দের মাঝে ধ্বনিত করাই ছিল যেন তার সাধনা—তাই তাঁর কবিতাতে আমরা শুনি "পাগলা ঝোরার" উচ্ছল কলগান আবার গ্রামের পথে পাল্‌কীবাহার গমনানুকারী সঙ্গীত। এই হল সত্যেন্দ্রনাথের কবি-জীবনের সাধনা। এ সাধনায় "সুরের পূজায়" তিনি সফল হয়েছেন সন্দেহ নাই—কোমল

অঙ্গুলির টানে যে সুরের মোহন জাল তিনি রচনা করে গেছেন বাংলা ভাষায় তার দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সুরের বা ছন্দের মিষ্টিক। সুর-সাধনাতেই তিনি 'আনন্দরূপমমৃতম্' কে লাভ করবার প্রয়াসী হয়েছিলেন। সুরের সাধনাতেই তিনি শ্রুতির অগোচর বিশ্বের মর্ম্ম স্থলের সঙ্গীতধারার ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করেছিলেন, আমাদের এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের উপর সুরের আলো ফেলে এক অতীন্দ্রিয়তার আভাস দিতে চেয়েছিলেন। তাই তার ছন্দ ভাব সাগরের উপর দিয়ে পাল-খাটান তরীর মত শতকল্লোলের সৃষ্টি করতে করতে অকুল পাড়ির গান গাইবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথের যে Mysticismএর পূর্ণ-বিকাশ সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য তারই যেন একটু স্পর্শ লাভ করেছে মনে হয়।

সত্যেন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার সাফল্যের দিক আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্চে যে তার কাব্যসাধনা কতকগুলি বিশেষ দিক হতে অসম্পূর্ণ ও পঙ্গু। আজ এই স্মৃতিসভায় দাঁড়িয়ে তার সাধনার ব্যর্থতার কথা বলতে কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে আসছে। এস্থান তার কাব্য সমালোচনার যথার্থ স্থান নয়। যে গুণাবলী তার পূত স্মৃতিকে আমাদের প্রাণে চিরনবীন করে রাখবে তার কথাই বলে আজ ক্ষান্ত হলাম। কবির জীবনের কোনও ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই তাই সে সম্বন্ধে আমি কিছুই বলতে পারবো না। তবে কবির কাব্যের মধ্য দিয়ে সরস সহানুভূতিপূর্ণ কখনও বা কুসুমের মত মৃদু কখনও বা সিংহশিশুর মত নির্ভীক তার হৃদয়খানির যে পরিচয় পেয়েছি তাতে মানুষ হিসাবে তাকে হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণ না করে থাকতে পারছি না। ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রকার আন্দোলনের সঙ্গেই কবির প্রাণের সংযোগ ছিল তার এই অকাল মৃত্যুতে আজ দেশবাসী সে দিক হতেও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হল।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ সতীশচন্দ্রের অকাল মৃত্যু প্রসঙ্গে যে কথা বলে ছিলেন সে কথা বলেই আজ শেষ করব।

"জীবনে যে ভাগ্যবান্ পুরুষ সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছে মৃত্যুতে তাহার পরিচয় উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে। তাহাকে যেমন হারাই তেমনি লাভও করি। মৃত্যু তাহার

চারিদিকে যে অবকাশ রচনা করিয়া দেয়—তাহাতে তাহার চরিত্র তাহার কীর্ত্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেব প্রতিমার মত সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।"

আজ এই শোকের দিনে উপরের কথাগুলিতে সত্যই যেন প্রাণে কেমন একটু সান্ত্বনা পাচ্ছি—কবি সত্যেন্দ্রনাথকে যেমন আমরা হারিয়েছি তেমন আবার তাঁকে ফিরে পাব। এ বড়ই আশার কথা—আজ আমাদের এই প্রার্থনা যে দেশবাসীর স্মৃতিমন্দিরে কবি সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতি চিরনবীন থাকুক, তাহার চরিত্র ও তাহার কীর্ত্তি দিনের পর দিন অতিবাহিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেবপ্রতিমার মত সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হোক।

শ্রীঅশ্রুমান্ দাশগুপ্ত।

অভয়।

—:*:—

(১)

মরণের ভেরী শুনেরে অবোধ
শঙ্কিত তোর চিত্ত,
মৃত্যুরাজের দণ্ড দেখিয়া
শিহরি' উঠিস নিত্য!
কি যে অমরতা মরণের মাঝে
কি যে আশ্বাস ঐখানে রাজে;
ও নহে মরণ—জীবনের শেষ,
তবে কেন তোর চিত্ত
মৃত্যুর ঘন কাল-ছায়া দেখি'—
শিহরি' উঠিছে নিত্য?

(২)

মরণ সে নহে জীবনের লয়,
নহে জীবনেব সাঙ্গ,
মৃত্যু সে আসি জীবনের খেলা
করে নাক কভু ভঙ্গ।
সে আসিয়া কভু জীবনের খেলা
ভেঙ্গে নাহি দেয় মরতের মেলা
সে আসিয়া কভু জীবনের সাথে
করে না নিঠুর রঙ্গ ;
জীবনের খেলা মরণ আসিয়া
করে নাক কভু ভঙ্গ।

(৩)

মৃত্যু সে যে রে জীবনের সাথে
স্নেহ-শৃঙ্খল বদ্ধ,
সে যে জীবনের মাঝখানে আছে
চিরদিন অবরুদ্ধ ;
মৃত্যু নহে রে জীবনের শেষ,
নবজীবনের নব-উন্মেষ
ফুটে ওঠে ঐ দামামার তালে
ঐ উঠে তার শব্দ ;
মৃত্যু সে আছে জীবনের মাঝে
চিরদিন অবরুদ্ধ।

(৪)

মৃত্যু সে করে নব জীবনের
নব-গঠনের সৃষ্টি ;
ও রে অবোধ, বারেক সে দিকে
ফিরা রে ভতের দৃষ্টি ।
মরণের মাঝে ঐ শুনা যায়
নব-জীবনের নব-পরিচয়
সে রোষ-কুটিল নয়ন মেলিয়া
করে না অনল বৃষ্টি,
সে সদাই ঐ করুণ নয়নে
করিছে অভয় দৃষ্টি ।

(৫)

তবে কেন ও রে অবোধ অন্ধ
শঙ্কিত তোর চিত্ত ?
তবে কেন তুই মরণের নামে
শিহরি' উঠিস্ নিত্য ?
মরণ সে শুধু জীবনের 'পরে
নব-জীবনের নব-বেশ ধরে
আসে ফিরে ফিরে, চলে যায় পুন
এমনি করিয়া নিত্য ;
এসকল দেখি তবু রে অবোধ
শঙ্কিত কেন চিত্ত ?
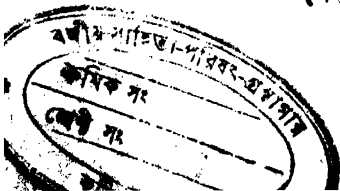
শ্রীপবিত্রকুমার গাঙ্গুলি

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৬ষ্ঠ বর্ষ। | শ্রাবণ, ১৩২৯ সাল। | ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা।

সতী।

—:*:—

ত্রিদিব মর্ত্ত্য মিলিয়াছে আজি দক্ষরাজার যজ্ঞভূমে,
জাগে আনন্দ, জাগে কলরোল, সঙ্গীত-ধ্বনি গগনচুমে।
আসেনিক শুধু উমাপতি শিব, আসে নি দক্ষ-তনয়া সতী,
তুচ্ছ ভিখারী যোগী আহ্বানে দক্ষরাজার নাহিক মতি।
হবে কি পূর্ণ শিবহীন যাগ? দেবতা মানব শিহরি' ওঠে;
দক্ষ শুনিয়া ফিরায় আনন, ঘৃণায় হাস্য অধরে ফোটে।
প্রাসাদ-কক্ষে কাঁদে গিরিরাণী, আমার স্নেহের দুলালী কই!
এল কি আমার অভাগিনী উমা, পরাণ-পুতলী এল কি ওই।

কৈলাসপুরে হর পাদ-পাশে কাঁদিয়া উঠিল সতীর হিয়া,
চলিল মায়ের স্নেহ ক্রোড় লাগি' পতিঅপমান বিস্মরিয়া।
প্রবেশিল বালা গিরিরাজপুরে অনাহূতা বেশ-ভূষণহীনা,
বাঁকায়ে আনন হাসে পুরজন হেরি' গিরিরাজ-তনয়া দীনা।
আসে আলুলিত কেশ সম্বরি' ছুটে আসে রাণী সজল আঁখি,
অভিমানে উমা উঠিল কাঁদিয়া মায়ের বক্ষে আনন ঢাকি'।

* * *

বাজে ভেরীকারা, বাজে দুন্দুভি, সঙ্গীত ওঠে অযুত সুরে,
ঋষির কণ্ঠে বাজে সামগান ধূম্র-আঁধার আকাশ জুড়ে।
বিরাট যজ্ঞ-সভামণ্ডপে প্রবেশিল উমা সলাজগতি,
দাঁড়ায়ে উঠিল যত সভাজন নেহারিয়া হর-গেহিণী সতী।
ক্রোধে থরথরি কাঁপিল দক্ষ, হিংসায় জ্বলি গরজি কহে,—
রাজার আলয়ে এসেছ সবাই, শ্মশানচারীর কুটীরে নহে!
কহিল উমায়,—কে পাঠাল তোরে? কেমনে আসিলি শরমহীনা?
রাজার প্রাসাদে ভিখারীজায়ায় কে পাঠাল রাজ-আদেশ বিনা?
—ক্ষমা কর পিতা, কাঁদি কহে উমা, লাজ-অভিমান-আনত শিরে,
নীরব বিশাল যজ্ঞ-সভায় ভাসে বিষাদিনী নয়ননীরে।
জ্বলি' ওঠে রাজা হুতাশন-প্রায়, নিন্দিল শিবে পরুষ-ভাষে,
শিব-নিন্দায় সভাজন সবে অশিব গণিয়া কাঁদিল ত্রাসে।
দক্ষের বাণী সতীর পরাণে বাজিল কঠিন শেলের মত,
সভার মাঝারে পতি-অপমান সহিবে কি সতী নীরব নত?

হেরে আঁখি মুদি হিয়ার মাঝারে জাগে ঝলমল স্বামীর ছবি,
আঁখির পলকে সৃজন প্রলয়, চরণে মূরছে অযুত রবি।
ঢল ঢল চারু দেহের লাবনী আলু থালু বেশ বিভল ভোলা,
চির-অমিয়ার মাধুরী-নেশায় নর্ত্তন তালে দোদুল দোলা!
কাঁপে পার্ব্বতি হরষ-আকুল হেরি সে মূরতি ভুবনজয়ী,
প্রেমের সায়রে হারাল চেতন ধ্যান-সমাহিতা মহিমময়ী;
ধীরে ধীরে আঁখি হারাল আলোক, শ্রবণ হারাল রাগিণী যত,
পতি-অপমান-বিষ-জর্জ্জর অঙ্গ এলায় লতার মত;
লাজ-অপমান-ব্যথায় পরাণ—ছুটিল পতির চরণ-আশে,
জীবন বিহীন চারু দেহলতা লুটাল ধূলায় সভার পাশে।
হাহাকার করি' ওঠে সভাজন হায় হায় করে নগরবাসী,
থামিল পলকে কল-কোলাহল, লুকালো নিমেষে হরষ-হাসি।

একি গর্জ্জন মুখরি' আকাশ, একি কম্পন ভুবন জুড়ি!
প্রলয়-ঝঞ্ঝা-মেঘমণ্ডলে আবরে বুঝি বা দক্ষপুরী!
থর থর থর কাঁপে গিরি বন, ছুটি ছুটি ফিরে শ্বাপদ যত,
গুরু গুরু গুরু গরজে গগন, ভূমিতে লুটায় পাদপ শত!
খসি পড়ে গিরি পাষাণ-শৃঙ্গ, উথলিয়া উঠে তটিনী-বারি,
শঙ্কা-আকুল নিখিল ভুবন, ভয়-মুর্চ্ছিত পুরুষ নারী!—
ওই আসে ওই রুদ্র পিণাকী, আসে ভৈরব ত্রিশূল-পাণি!
কাঁপে সুরাসুর যক্ষ দানব, শিহরে বিশ্ব শঙ্কা মানি'!

সংহার রব ফুকারে বিষাণ, কণ্ঠে গরজে ফণীর মালা,
আলু থালু বেশ, উড়ে জটা-জাল, ললাট-নেত্রে ঠিকরে জ্বালা !
তাণ্ডব রোলে কাঁপায়ে বিমান আসে ভূত প্রেত পিশাচ সবে,
জাগে বম্ বম্ ধ্বংস রাগিণী শম্ভুর মেঘ-মন্দ্র রবে।
টুটিল বিশাল সভামণ্ডপ, নিবিল হোমের বহ্নি-মালা,
জাগে প্রলয়ের লীলা-নর্ত্তন, ভয়-স্তম্ভিত যজ্ঞশালা।
অঞ্জলি জুড়ি' নমে সভাজন, সংহর রোষ প্রলয়কারী !
জয় জয় শিব শম্ভু ভয়াল ! জয় শঙ্কর শঙ্কাহারী !
—শোক-মুর্চ্ছিত যোগীর কেতন, ফুকারে, কোথায় কোথা রে সতি !
হেরিল সহসা ধূলিলুণ্ঠিতা স্বর্ণপ্রতিমা মলিনা অতি !
নিমীলিত দুটি নয়ন-প্রান্তে অঙ্কিত দুটি অশ্রুরেখা,
এলায়িত চারু দেহ-লতিকায় মরণ-পাণ্ডু কালিমা-লেখা।
থমকি' দাঁড়াল অধীর রুদ্র, শোকের সিন্ধু উথলি' ওঠে,
ঘনায়ে আসিল অশ্রু-সলিল জ্বালাময় তিন নয়ন-পুটে।
চকিতে তুলিয়া প্রাণহীন দেহ স্কন্ধে স্থাপিয়া পাগলপারা,
ছুটি বাহিরিল বিভল শম্ভু অধীর আবেগে আপনহারা।

* * *

ছুটে যায় ভোলা মত্ত অধীর, নৃত্য-চপল চরণ চলে,
সতীর অঙ্গ-পরশ-সুধায় একি আনন্দ মরমতলে !
চলে দুলি' দুলি' ঢল ঢল তনু, ক্ষণে ক্ষণে দেহ উঠিছে কাঁপি',
জাগে আনন্দ বোম্ বোম্ বোম্ চরাচর নভঃ অনিল ছাপি' !

মহাতাপসের একি মোহ আজ ! বিস্ময় মাঝে দেবতা যত ;
স্তম্ভিত পায়ে কাল বুদ্বুদ মহাকাল-পদ-পরশ নত !
হারাবে কি আজ সৃষ্টি বিশাল মহাপ্রলয়ের সাগর নীরে ?
ক্ষীরোদ-জলধি-কমল-পর্ণে চমকি' বিষ্ণু জাগিল ধীরে।

ছুটে বিষ্ণুর শাণিত চক্র আলোকি' গগন উল্কা সম,
পরশিল শির-দেহ-লম্বিত সতীর অঙ্গ কুসুমোপম ;
পড়ে টুটি' টুটি' কোমল অঙ্গ পথে পথে ফুলদলের মত,
সাধ্বীর পূত পরশ লভিয়া জাগিল ধরায় তীর্থ শত !
সহসা চমকি' জাগে মহাদেব নিমীলিত আঁখি মেলিয়া চাহি',
হেরিল উরসে পেলব-স্নিগ্ধ প্রিয়ার অঙ্গ পরশ নাহি !
—মিলাল পলকে মোহের স্বপন, ললাট-নেত্র উঠিল ফুটি',
মহামায়া সনে মায়ার বাঁধন পথে পথে কোথা পড়েছে টুটি'।
রৌদ্র শান্ত হল ত্রিনয়ন, হাসি মহাদেব বসিলা ধ্যানে,
জাগিল অতুল সতী-গরিমায় মহাশক্তির বিকাশ প্রাণে।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

অবাক্।

( )
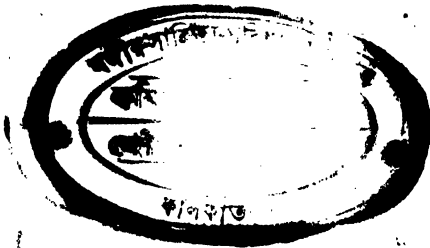
সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া, বেগম অন্য কাজের সময় পাইল না। বাড়ীতে অনেকগুলি কুটুম্ব অতিথির আগমনে,—আতিথ্যসৎকারের তদারকে বেচারাকে রাত এগারটা পর্য্যন্ত প্রবল চেষ্টায় মাথা ঠিক রাখিয়া—খুব ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে হইল কিন্তু তারপর যখন সে নিজের শয়ন-কক্ষে পৌঁছিয়া, নিদ্রার জন্য অবসর পাইল,—তখন শ্রান্ত ক্লান্ত মনটা সহসা মহা বিদ্রোহে মাতিয়া গোঁ ধরিয়া বসিল,—এবার—নিভৃতে, সেই চুরি-করা চিঠিখানা পড়িবার জন্য!—

কিন্তু বেগম সহসা রাজী হইতে পারিল না।—তাহার শিক্ষা-মার্জ্জিত, সচেতন বিবেক,—মনের এই আব্‌দারটার ন্যায়-অন্যায় লইয়া প্রথমেই বিচার করিতে বসিল। বিবেকের ধর্ম্মাধিকরণের সামনে দাঁড়াইয়া মন ও বুদ্ধির মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক চলিল। অনেকটা ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বেগম এই সর্ত্তে মনের সঙ্গে বুদ্ধির রফা করিল,—যে,—উক্ত পত্র লেখকের মনের ওজনটা শুধু নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিবার জন্যই মাত্র, বেগম ঐ চিঠিখানা পড়িতে পারে। নির্ব্বোধ সোফিয়ার নির্দ্দেশিত,...'প্রয়োজনের' অজুহাতে,—একেবারেই নয়! নয়!—তা যদি হয়, তবে মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের উপদেশ স্মরণ করিয়া, এই মুহূর্ত্তে মনকে ও-পথ হইতে দ্রুত-ফিরান-ই, মঙ্গল।

গম্ভীর চিন্তাকুল মুখে বেগম অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর সজোরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া, মনে মনেই ঈষৎ হাসিয়া বলিল "খোদা মালিক। এত ভয় ডরের দরকার নাই!—দেখাই যাক-না কেন!—"

উঠিয়া, আলো উজ্জল করিয়া দিয়া, সেই চিঠিখানা গুপ্তস্থান হইতে বাহির করিয়া বেগম পড়িতে বসিল। তিন সপ্তাহ পূর্ব্বের তারিখ দিয়া চিঠিখানা লেখা হইয়াছে। বেগম

মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল,--যতগুলা পত্র দেখা হইয়াছে, এইটাই তার মধ্যে সকলের শেষ লেখা,—অর্থাৎ টাট্‌কা চিঠি।—

তারিখ ও স্থানের ঠিকানার উপর চোখ বুলাইয়া বেগম চিঠির বক্তব্যে মনোনিবেশ করিল :—

প্রিয় ভাইজি,

তোমার চিঠি পড়ে, আমার মাথাটা যদি খারাপ হয়ে না যায়, তা হ'লেই চিঠির জবাব দিতে হুকুম করেছ, সেই জন্যেই তৎপরতার সঙ্গে,—ত্রস্তে জানাচ্ছি,—না আমার মাথা খারাপ হয় নি, মোটেই হয় নি !—

প্রথম কথা,—সমস্ত গালাগালিগুলোর মধ্যে, তুমি যে আমায় উচ্চাভিলাষী বলে গাল দিয়েছ,—এটার জন্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই তোমার বুদ্ধির তারিফ করে সবিনয়ে জানাচ্ছি, জন্ম লগ্নটার দোষে—('গুণে' বল্লে পাপ হবে ! কিন্তু বাস্তবিক আমি Astrologyর নিয়ম-তন্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে 'গুণে' অর্থাৎ গণনা করে দেখেছি)—প্রকৃত পক্ষেই আমি তাই। অর্থাৎ কি না—গ্রহচক্র যোগে, আমার প্রকৃতিটা এমন ঘোরতর উচ্চ-অভিলাষ-সম্পন্ন যে—সে আর সব কিছু দুঃখ কষ্টকে হাসিমুখে সহ্য করতে রাজী হলেও, কোন রকম নীচ অভিলাষকে আদৌ বরদাস্ত করতে রাজি নয়।—এটার জন্যে তোমরা আমার ওপর যতই রাগ কর, আমি নিরুপায় !—গ্রহ প্রভাব, আমার ভাগ্যের জন্যে কিন্তু এই ফলই নির্দ্দেশ করেছেন !—

অস্বীকার করছি নে, যে,—গ্রহদের ঐ শুভ সূচক Indication গুলোর বিরুদ্ধে আমরা তেমন জোর-তলবে চেষ্টা লাগলে, ওগুলোর শুভ ফলকে বেমালুম কর্ম্মনাশার জলে বিসর্জ্জন করা যায় না। বরং বিস্ময়ের সঙ্গেই স্বীকার করছি—অধিকাংশ মানুষেই তোফা আরামে,— নির্ব্বিচারে ঝোঁক দেয়,—তাদের সৌভাগ্য-নির্দ্দেশক শুভগ্রহ ফলকে ব্যর্থ করবার দিকে, এবং অশুভগ্রহ ফলকে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা ততোধিক বেশী গুণে বাড়িয়ে লাভ করবার দিকে !— নইলে, শুভাশুভ সব গ্রহই সকল মানুষের জীবনের ওপর কম বেশী পরিমাণে ফল দান করেন।—কিন্তু উদামশীল সদ্বিবেচক, সৎকার্য্যরত মানুষের ভাগ্যে, তাঁর আত্ম-কর্ত্তৃত্বের জোরে শুভগ্রহ ফলের বিকাশটাই বেশী হয়ে ওঠে কেন ? আর আলস্যপ্রিয় অবিবেচক,

দুস্ক্রিয়াশক্ত মানুষের ভাগ্যে, মন্দগ্রহ ফলের বিকাশটাই বা বেশী পরিমাণে দেখা যায় কেন? সেই জন্যেই জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সূক্ষ্ম মর্ম্মদর্শীরা মানুষের গ্রহ-নির্দ্দিষ্ট ফলের প্রভাবের সঙ্গে, মানুষের আত্ম-কর্তৃত্ব ফলের প্রভাবটা প্রায় তুল্য বলবান বলেই স্বীকার করেন শুনেছি।—অর্থাৎ মন্দকে খণ্ডন করবার দিকে যেমনি বলবান, শুভকে খণ্ডন করবার দিকেও তেমনি বলবান।

আমি একটি জেদী ছেলেকে দেখেছিলুম, সে যখন কোন জিনিস নেবার জন্যে 'বায়না' ধরত,—তখন চোখ বুজে রুদ্ধশ্বাসে ক্রমাগত চীৎকার করাই ছিল, তার একমাত্র কার্য্য।—সে হাঁপিয়ে দম আটকে মরবার যো হোত,—তবু চীৎকার থামাত না,—আর পাছে,—পৃথিবীর অন্য কোন জিনিস চোখে পড়ে, তার আগেকার জিদটা ভুলিয়ে দেয়,—সেই ভয়ে সে একদম্ চোখ মেলত না! তুমি কোনও অন্ধ—অদৃষ্টবাদীকে দেখেছ কি? আমি অনেকগুলিকে দেখেছি,—আর দেখেছি, প্রকৃতিতে তাঁরা এই,—অন্ধ-একগুঁয়ে ছেলেটিরই বড় দাদা মাত্র! এঁরা নিজেদের খেয়াল-মাফিক, (সৎকায যত হোক না হোক, তার বিপরীত) কায অনেক রকমই করে থাকেন;—কিন্তু তার ফল ভোগ করবার সময় চোখ বুজে দায়ী করেন,—অদৃষ্টকে! আত্ম-কর্তৃত্বকে কিছুতেই স্বীকার করেন না।—সেটা এঁদের কাছে গাঁজাখুরি গল্প মাত্র।

চেষ্টা করলে, আর তেমন তেমন কাযের চর্চ্চা রাখলে, আমিও এই ভাল মানুষদের দলে ভর্ত্তি হতে পারি। আর নীচ অভিলাষের মোহে, নিজের সমস্ত মন বুদ্ধিকে সম্মোহিত করে, আমিও একদিন তোমাদের 'অবাক্' করে দিয়ে একটি আস্ত জানোয়ারে পরিণত হতে পারি, এবং আমার ভাগ্যনির্ণায়ক গ্রহদের শুভ প্রভাবকে সমূলে ব্যর্থ করে দিয়ে, অশুভ প্রভাবকে মহা উৎসাহে সম্বর্দ্ধন করে নিতে পারি, সন্দেহ নাই। কিন্তু খোদার শ্রেষ্ঠ করুণার দান, এই মনুষ্য-মন, মনুষ্য-বুদ্ধির ওপর এতখানি পাশবিক-অত্যাচার অনুষ্ঠান করা,—এ কি প্রার্থনীয়?

'The most desirable thing in the world' বলে, যে জিনিসটার ইঙ্গিত করে বিস্তর বিস্তর প্রলোভন বাক্য ঝেড়েছ,—সে জিনিসটার পরিচয় সম্বন্ধে, আমি সাক্ষাৎ-সম্পর্কে অনভিজ্ঞ

হলেও, দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করছি—তোমার ওকালতীটা বেশ grand success চালেই, মাঠে মারা গেছে! এখুনি, বিয়ে দিয়ে আমায় সুখী করতে চাও? কেন?—আমার আপাদ-মস্তকের কোনখানেই তো কোন অসুখ নাই! বিশ্বাস না হয়,—সমস্ত রাজ্যের ফিজিসিয়ান ডেকে এনে জড় কর; আমি বুক ঠুকে বলছি, তাঁরা—যদি এই কুস্তি কসরতের রকমারী ব্যায়ামচর্চ্চাপুষ্ট নিরেট স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহটার কোথাও এতটুকু অস্বাস্থ্যের চিহ্ন খুঁজে আবিষ্কার করতে পারেন, তবে—যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপান্ন!—আল্লা বলে, তোমার ঐ শুভাকাঙ্ক্ষার ফাঁসির দড়িতেই লটকে পড়ব, কোন আপত্তি করব না!

ঠাট্টা নয়। সত্যিই বলছি। নারী হৃদয়ের দুর্জ্ঞেয় রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টায়—প্র পাস্ত পরিচ্ছেদে মাথা ঘামানোর জন্যে তোমরা অনেকেই খাটছ। আন্তরিক দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করছি, ও'দিকটায় খাটবার উপযুক্ত উৎসাহ, আমার মগজটায় আজও বিকশিত হয়ে উঠে নি, এবং খোদার রাজ্যের ঐ নিরপরাধ জীবগুলি আমার দৃষ্টিতে, এমন কিছু সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত জীব বলে আজও প্রমাণিত হন নি,—যার জন্যে, কেবলমাত্র তাঁদের চলাফেরাটা লক্ষ্য করবার জন্যেই দুনীয়ার সব কিছু দরকারী কায ফেলে,—দু'চোখের বুভুক্ষিত দৃষ্টি মেলে হাঁ করে অষ্ট প্রহর বসে থাকব,—রাস্তা, ঘাট, রেল ষ্টেশনের দিকে তাকিয়ে!—দুনীয়ার জীব বিশেষের ওপর একখানি জঘন্য আক্রোশ প্রকাশের উপযুক্ত বিদ্বেষ আজও আমার মধ্যে সঞ্চিত হয় নাই। আর ঐ,—হিংস্র রুধিরলোলুপ প্রাণী বিশেষের দৃষ্টির মত, তীব্র প্রখর দৃষ্টি নিয়ে—দূর হোক ছাই,—ও সব ইতর বর্ব্বরতায় আমার কিছুমাত্র আমোদ নাই, দোহাই খোদার!—ঘৃণা আর মনঃপীড়া যথেষ্ট রকম আছে! কারণ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি নে, যে আমার ধমনীতে যে রক্ত বইছে,—তাঁদের ধমনীতেও সেই—একই মনুষ্য জাতির রক্ত বইছে না সেটা—কেরোসিন তেল বা তত্তুল্য কোন অসার পদার্থ,—যার জন্যে, সে পদার্থের আধার-কেন্দ্রটিকে পদে পদে পদাঘাত করে চলাই আমার পক্ষে,—পরম পুরুষার্থ বলে প্রমাণিত হবে!

রাগ কোর না। আমি এ সব প্রসঙ্গে স্বভাবতঃ নীরব থাকতেই ভালবাসি, কারণ নর নারীর প্রাণ বস্তুটার সম্বন্ধে একদল মানুষের ধারণা এতই বিকৃত-বিষাক্ত হয়ে উঠেছে দেখছি, যে রীতিমত 'স্তম্ভিত মূর্চ্ছিত'—হয়ে পড়[illegible] বল না থাকলেও, যথেষ্ট মাত্রায়
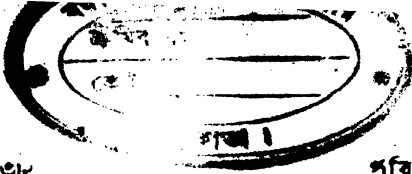
ক্ষুব্ধ গম্ভীর হয়ে উঠেছি। নীচ অভ্যাসের দাসত্ব করতে করতে, মানুষ যে কত নীচ হয়ে পড়তে পারে,—রাজ্যের অভিযোগ নিয়ে তোমাদের কারবার,—তোমরা নিশ্চয়ই সে খবরটা জানো? আমায় নিজমুখে বেশী কিছু বলে, অপরাধী হতে হবে কি?

তার পর ফকীর সন্ন্যাসীদের বাঁধা গৎ ছেড়ে নিজের মনুষ্য হৃদয়টার দিকে তাকিয়ে, আমায় বিচার করে বুঝে নিতে বলেছ,—মানুষের অবিবাহিত জীনটার, যত কিছু দোষ, ঘাট, আশঙ্কা-জনক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে?

কথাটার জবাব দেবার আগেই পাল্টা প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হচ্ছে, 'বিবাহিত জীবন মাত্রেই কি......?

কিন্তু এটার সত্য জবাব দিতে তোমার যে খুশী হয়ে উঠ্‌বে না, এবং আমাদের—অর্থাৎ অবিবাহিতদের, এ রকম অনধিকার চর্চ্চার স্পর্দ্ধা দেখে যে কতখানি আহ্লাদিত হয়ে উঠ্‌বে, তা জানি। সুতরাং প্রশ্নটা ঐ পর্য্যন্তই রেখে দিলুম,—ইচ্ছা হয় মনে মনে বুঝে দেখো।

এখন ফকীর সন্ন্যাসীদের কথায় আসা যাক!—পুরুষানুক্রমিক উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এই আয়েসী—বিলাসী জমিদার শরীরটিকে নির্দ্দয় টানে ডোর কৌপীন পরিয়ে বন জঙ্গলে পাঠাতে তোমার দ্বিধা লাগে নি দেখে—অনেক দুঃখে—একটু হাস্‌লুম! রাম্ কহো!—পৃথিবী শুদ্ধ মানুষের সঙ্গে অসহযোগ স্থাপন করে, বন জঙ্গলের দিকে রওনা হবার মাথাব্যথা আজ আমার ঠিক ততটুকুই,—তোমাদের ইংরেজ উপন্যাস বিশেষের,—নায়ক বিশেষের মত, নায়িকা বিশেষের চরণ প্রান্তে নতজানু হয়ে 'My soul is hungry for you' বলে রাক্ষস খোক্কোস জনোচিত,—সুবুদ্ধির পরিচয় দেবার দিকে ঠিক—যতটুকু!—

সুতরাং অকপটেই সত্য স্বীকার করছি তোমাদের 'Most desirable thing'টিকে এড়িয়ে যে Best desirable thing' আজ আমার অনুভূতিকে প্রবল ভাবে পীড়া দিচ্ছে—সে বস্তুটি হচ্ছে—নিজেকে সকলের আগে যোগ্য মানুষ রূপে গড়ে তোলা,—তার পর ফকীর হওয়া বা সংসারী হওয়া যা তোমরা হুকুম করবে!

কিন্তু তার আগে আপাততঃ, তোমাদের অবাধ্য বলে পরিচিত হওয়াই আমার অদৃষ্টের অনিবার্য্য লিখন দেখ্‌ছি কারণ তোমরা কেউ নিজের জেদ ছাড়তে রাজী নও। ভয়ানক

দুঃখ আর অস্বস্তি লাগছে তোমাদের মনঃক্ষুণ্ণ করতে—কিন্তু উপায় কি ? এই অযোগ্য হৃদয়, মন, বুদ্ধি, নিয়ে কোন কার্য্যক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়াব ? আমার সে মূঢ়তা সে অন্যায়ের দণ্ড কি হতে পারে—সেটা চারপাশের অনেক নিরীহ-জীবনের পরিণাম দেখে স্পষ্টই মালুম পাচ্ছি,—নিজেকে অতটা নির্বিচার-নিরীহতা অবলম্বন করতে দিতে আমি একদম্ নারাজ, মাপ কর।

সকলের কুশল দিও, আদাব। ইতি

তোমাদের অবাধ্য

দুর্ভাগা—মন্মু।

চিঠিখানায় এইখানেই নাম স্বাক্ষর হইয়াছে, বটে কিন্তু তার পর উল্টা পিঠে লাল কালীতে পুনশ্চ নিবেদন আবার খানিকটা লেখা রহিয়াছে।

বেগম সেটা বাদ রাখিয়া উন্মনা-ব্যাকুল ভাবে, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।—কি আশ্চর্য্য রহস্যময় এই মানুষটির প্রকৃতি !—ভদ্র-বিনম্র,—অথচ নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে, দুর্দ্দম্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা—সহানুভূতি-করুণ অথচ মৃত্যু-নির্ভীক.—কৌতুকচপল অথচ মহৎ, গম্ভীর,—অভাবনীয় আশ্চর্য্য প্রকৃতির মানুষ এই লোকটি ! সুন্দর অতিসুন্দর কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী—মহৎ !—

এই মানুষের মনের ওজন বিচারে অগ্রসর হওয়া ?—বেগম নিজের মধ্যে আজ প্রথম—দীনভাবে হাসিল !—

বুকের ভিতর হৃদ্‌পিণ্ডটা তখন সজোরে ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া লাফাইয়া তালে তালে ধ্বনিতেছিল—ধন্যবাদ ! ধন্যবাদ ! ওগো, পরমেশ্বরের পরমসুন্দর সৃষ্টি—ধন্যবাদ তোমায় ! তোমার উচ্চ অভিলাষ পূর্ণ হউক,—ঈশ্বর তোমার সহায় হউন ! তোমার সাধনব্যগ্র হৃদয়কে আমি শ্রদ্ধাভরে অভিনন্দন করিতেছি, মঙ্গল হউক, তোমার মঙ্গল হউক !—

(১১)

টং টং করিয়া ঘড়িতে রাত দুইটা বাজিল। বেগম চমকিয়া মাথা তুলিয়া চাহিল,—বাঃ ! এর মধ্যেই এত খানি সময় কাটিয়া গেল ! ঘড়িটা ভুল বলিতেছে না ত ?

উঠিয়া গিয়া, খোলা জানালার সামনে দাঁড়াইল। বর্ষার মেঘ তখন আকাশের আশে পাশে এ দিকে ওদিকে কিছু কিছু ছড়ানো ছিল,—কিন্তু মাঝ খানের আকাশটা খুব পরিষ্কার ছিল। শুক্ল-দ্বাদশীর চাঁদের আলোর চারিদিক হাসিতেছিল। সমস্ত সহর গাঢ় সুষুপ্তিময়।

মাথা নাড়িয়া, বেগম ম্লান ভাবে একটু হাসিল। তাহার ঘাড়ে ভূত চাপিবার যো হইয়াছে, বোধ হয়! না হইলে, বেহুঁস ভাবে এতখানি রাত্রি জাগা,—এ যে পরীক্ষার পড়া তৈরী করিবার জন্যও, সে কখন জাগে নাই...বড় অন্যায়! পরচিন্তা জিনিসটাকে এবার মাথা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে হইল,—সম্পূর্ণ রূপেই! দয়া মায়া আর উচিত নয়!

সরিয়া আসিয়া এক হাতে আলো কমাইতে কমাইতে অন্য হাতে বেগম চিঠিখানা ভাঁজ করিতে লাগিল, কিন্তু অতর্কিতে নজর পড়িল—আবার চিঠির পর পৃষ্ঠায়—একটু লাল কালীর লেখার দিকে!—বেগম বিচলিত হইয়া উঠিল,—আহা, ওটুকু যে বাদ রহিয়া গেল! কোন বিচার বিতর্কের চেষ্টা না করিয়া মুহূর্ত্তে সে আলো বাড়াইয়া, চিঠির ভাঁজ খুলিয়া ফেলিল। সবই যখন দেখা হইয়াছে, তখন ওটুকু আর বাকী থাকে কেন?

লাল কালীর লেখাটুকু অত্যন্তই তাড়াতাড়ি করিয়া লেখা হইয়াছে। বেগম পড়িতে লাগিল:—"সালাম্ হজরৎ যুগলেষু—ভাবী সাহেবা, এই মাত্র আপনার এবং ভাইজির দীর্ঘ ও দীর্ঘতম চিঠি দু'খানা হাতে পৌছাল। ভাইজীকে বলবেন, পরে তাঁর চিঠির রীতিমত করে জবাব দেব,—আপাততঃ আপনাকে সংক্ষেপে জবাব দি'চ্ছি।

আমার আবদারটা ইতিমধ্যে আপনার শুদ্ধ কর্ণ গোচর হয়েছে শুনে, সুখী হলুম, কিঞ্চিত শঙ্কিতও হলুম। বিবাহটা আমি কস্মিন কালেও করি নাই, সে জন্যে ও-ব্যাপারটায় অগ্রসর হবার পক্ষে আমার সাহস যে খুব কম, সেটা আমিও স্বীকার করছি নে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর যে সব কথা, এবং যাঁর কথা লিখেছেন, সে সবের যে কি উত্তর দেব, আপাততঃ ভেবে ঠিক করতে পারছিনে। বে-আদবী মাফ করবেন,—ভাববার সময় নিলুম।

আপনার নিমন্ত্রণ শিরোধার্য্য। ছেলেদের বলবেন তাদের চাচাজী শীঘ্রই ওখানে যাবে,—যদি কোন অনিবার্য্য বাধা হঠাৎ না এসে পড়ে।

অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের মঙ্গল কামনা নত শিরে গ্রহণ কর্‌ছি,—সেলাম্। ইতি

স্নেহপ্রার্থী—মন্নু।

তীক্ষ্ণ সংশয়ে হঠাৎ বেগমের মন সবেগে দুলিয়া উঠিল!—এ লেখাটুকু সোফিয়ার উদ্দেশই নয় কি? সোফিয়া তাহার স্বভাব-অভ্যস্ত বাঁধা গৎ আওড়াইয়া নিশ্চয়ই বিবাহের জন্য অনুরোধ জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিল—এটুকু তারই উত্তর। কিন্তু এই প্রসঙ্গে—ঐ 'যে সব কথা, এবং যাঁর কথা'—ওটুকুর অর্থ কি?

বেগমের প্রাণ ধুক্ ধুক্ করিতে লাগিল। বিবাহের অনুরোধ লইয়া সোফিয়া তাহার স্নেহের দেবরকে হাজার বার বা দু'হাজার বার স্বচ্ছন্দে পত্র লিখিতে থাক, বেগমের কোন আপত্তি নাই,—কিন্তু এই সম্পর্কে উল্লিখিত 'যাঁর কথা'—ব্যক্তি বিশেষটি কে? কার কথা সোফিয়া লিখিয়াছিল?

নিজের নামটা মনে মনে উচ্চারণ করিতেও, বেগমের দ্বিধা বোধ হইল, লজ্জাবোধ হইল,—কিন্তু সে যতই ভাবিতে লাগিল, সন্দেহটা ততই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। সোফিয়ার উপর রাগও হইতে লাগিল, যথেষ্ট!—ঐ আহাম্মকটার কাণ্ডজ্ঞানের উপর বেগমের কিছুমাত্র আস্থা নাই,—সে তো সব বলিতে পারে,—সব লিখিতেও পারে বোধ হয়! সন্দেহ করিবার কোন কারণই নাই!—

বেগম অধীর হইয়া উঠিল! ঝকমারি করিয়াছিল, সে সোফিয়ার বোনরূপে জন্মিয়া!—

কিন্তু তারপর?—এ ঝকমারির ত্রুটি সংশোধনের উপায়?—

গুরুতর দুর্ভাবনায় বেগমের মন ক্লান্ত দুর্ব্বল হইয়া উঠিল! পারা যায় না আর!—যা খুশী করুক,—ঐ ফাঁসুড়ে-কীর্ত্তির সোফিয়া আর তাহার উকীল স্বামীটি!.........নিষ্কর্ম্মার দল! কেবল পরচর্চ্চা, কেবল পরচর্চ্চা......উকীলটি তবু 'ওরি-মধ্যে' একটু ভদ্র-সভ্য আছেন, নিজের ভাইকে বিবাহ করিতে বলিতেছেন,—সে শুধু বিবাহের জন্যই। কিন্তু সোফিয়াটা কি দুর্দ্দান্ত পাজী? সে কিনা স্বচ্ছন্দে......! নাঃ, ইহাদের সহিত পারিয়া ওঠা, নিতান্তই অসম্ভব!

অত্যন্তই অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল, মাথাটাও খুব গরম হইয়া উঠিল। বেগম ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল আড়াইটা প্রায় বাজে! সর্ব্বনাশ, কাল সোমবার যে! কলেজের পড়া?
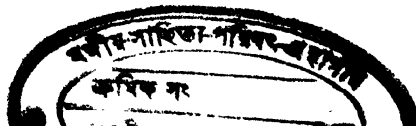
চিঠিখানা ভাঁজ করিয়া টেবিল-ক্লথের নীচে লুকাইয়া রাখিয়া, তার উপর খানকতক বই চাপাইয়া, বেগম আলো কমাইয়া দিল। তারপর মাথায় জল চাপ্‌ড়াইয়া, হাত পা ধুইয়া সে যখন রাত্রের জন্য উপাসনা করিতে বসিল, তখন মনস্থির করিতে গিয়া, তাহার কান্না পাইতে লাগিল। এমন দুর্ঘটনা আর কখনও ঘটে নাই!—

অনেক কষ্টে আত্মসংযম করিয়া কোন মতে উপাসনা সারিয়া লইল। বিছানায় আশ্রয় লইয়া বেগম ক্লান্তি-বিকল চিত্তে উপর্য্যুপরি প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল, সোফিয়ার সঙ্গে সে আর কোন সম্পর্ক রাখিবে না, কোন সম্পর্কই না! এমন নিদারুণ চিত্ত-বিক্ষেপকারী মানুষদের লইয়া কি নিরাপদে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা চলে?.........অতএব কাল হইতেই আড়ি!—

কিন্তু আড়ির কারণটা সোফিয়ার কাছে বেমালুম চাপিয়া লইতে হইবে, না হইলে নিজের অন্যায় ধরা পড়া অপরিহার্য্য!—দুর্ভাবনায় অস্বস্তিতে অনেকক্ষণ বেগমের ঘুম হইল না।—

হায়! কেনই যে তার পরের চিঠি চুরি করিয়া পড়িবার দুর্ব্বুদ্ধি হইল!—

(১২)

পরদিন, অনেক বেলায় দাসীর ডাকাডাকিতে বেগমের যখন ঘুম ভাঙিল, তখন বেলা ন'টা। দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিতেই দাসী বলিল "তিনবার ঘর পরিস্কার কর্‌তে এসে ফিরে গিয়েছি, এবার চার বার।—"

চোখ মুছিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বিরক্ত স্বরে বেগম বলিল "আমার কান ধরে উঠিয়ে দেওয়া তোমাদের উচিত ছিল। কাল থেকে ঠিক ছটায় উঠিয়ে দিও।—"

বেগমের রাগ দেখিয়া—দাসী অবাক্ হইয়া গেল।

তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া কলেজ যাত্রা করা হইল। বাড়ীর এবং কলেজের পরিচিত সকলেই দেখিল বেগম আজ কিছু অস্বাভাবিক বিষাদ-গম্ভীর। মেয়েরা ঠাট্টা করিয়া উপাধি দিল "দিদিমা।"

বৈকালে বাড়ী ফিরিয়া,—নিজের ঘরে গিয়া কাপড় চোপড় না ছাড়িয়া, বেগম,—গতকল্য সোফিয়ার বাড়ী হইতে আনা, সেই বইগুলির সঙ্গে, সোফিয়ার দেবরের চিঠিখানি লুকাইয়া লইয়া দ্রুতপদে সোফিয়ার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। কিছুমাত্র অনাবশ্যক ভূমিকা না করিয়া, গম্ভীরভাবে বলিল "আলমারীর চাবী দে, বইগুলো রেখে দেব।"

আশ্চার্য্য হইয়া সোফিয়া বলিল "এর মধ্যে সব পড়া শেষ হয়ে গেল ?—আবার চাই ?—"

প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা বেমালুম চাপিয়া লইয়া বেগম উদাস হাস্যে বলিল "আর না ভাই, একজামিন মাথায় মাথায়।—এবার থেকে চোখ বুজে নিজের কাযে খাটব।"

আলমারীর চাবী লইয়া সে লাইব্রেরীর দিকে চলিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে বিষন্ন মুখে ফিরিয়া আসিয়া চাবী ফেলিয়া দিয়া বলিল "চল্লুম সোফ,—একটা কথা বলে যাচ্ছি, তোর সঙ্গে দিন কতকের জন্যে আড়ি,—এমন আর ভাব টাব কর্‌বার্ চেষ্টা করিস্ নি।—"

"অপরাধ ?"

"একজামিন।"

"বাবাঃ! এখনো তো ছ'মাস দেরী।—"

বেগম নীরবে প্রস্থানোদ্যত হইল। সোফিয়া ডাকিয়া বলিল "থাম না, ছ'মিনিটে একজামিন পালাবে না। সুনীতির সঙ্গে আজ দেখা হয়েছিল ?—"

"হয়েছিল "

"ঝগড়া করেছিস্ ?—"

বিস্মিত হইয়া বেগম বলিল "কেন ?"

"সেই কালকের না-দেখা করে পালোন'র জন্যে—।"

"ও !—" বেগম একটু হাসিল! বলিল "কথাটা ভুলে গেছলুম ? আর ও তো একদম সব পুড়িয়ে মেরেছে! কিছু মনে পড়িয়েও দিলে না।—"

সোফিয়া ছেলের গা হাত পা পরিস্কার করিয়া জামা পরাইতে পরাইতে বলিল "বল, তারপর,—সে নতুন বিয়ের আমোদে দিশেহারা হয়ে মর্‌তে বসেছে।"

বেগম অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে দেয়ালের একখানা ছবির দিকে চাহিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া সংক্ষেপে বলিল "হুঁ—"

"বস্ না। এইখানেই চা টা খেয়ে যা।—"

"না, আমার কাপড় চোপড় বদ্‌লানো হয় নি, আম্মা এখুনি খুঁজ্‌বেন,—"

"খুঁজবেন না। আমি খবর পাঠাচ্ছি—"

"না, না, চল্লুম।—
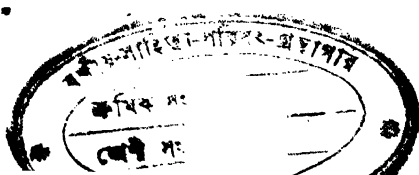
"আচ্ছা দাঁড়া। তোর কখন সময় হবে বল দেখি? তোর সঙ্গে গোটাকতক জরুরী কথা আছে।—"

উদ্বিগ্ন ভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বেগম বলিল "আমার সঙ্গে? কি সম্বন্ধে?—

ঢোক গিলিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া সোফিয়া বলিল "যে সম্বন্ধেই হোক। কথা শুনো আগে তোকে শুনতে হবে,—তার পর যত পারিস টাঁওাই মাণ্ডাই করিস। না শুনে লাফালাফি করতে পাবি না।—"

প্রাণপণে আত্মদমন করিতে করিতে বেগম খুব ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া বলিল "আচ্ছা, শোনা যাবে অখন। আপাততঃ চল্লুম।—"

সে চলিয়া গেল।

কিন্তু দু চার দিন কাটিয়া যাইবার পর বেগমের ভাব গতিক দেখিয়া সোফিয়া বুঝিল,—হঠাৎ পড়া শোনায় বেগমের এত 'চাড়' বাড়িয়া উঠিয়াছে যে নিভৃত নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় তাহাকে পাওয়া, আজ কাল একেবারেই দুর্ঘট। নিজের কাজ কর্ম্মের অবকাশে, সিঁড়ি ভাঙিয়া তেতালায় উঠিয়া, বেগমকে যখনি নিরালায় ধরিতে চেষ্টা করিত,—তখনি বেগম পড়া ছাড়িয়া, মাতা বা ভ্রাতা ভগিনীদের কাহারও নাম করিয়া, জরুরী কাযের তাড়া জানাইয়া—তটস্থ ভাবে নীচে পলাইয়া আসিত।—আর সে অবস্থায় বেগমের পিছু লইয়া নীচে আসিয়া অত হট্টগোলের মাঝখানে কিছু 'জরুরী' কথা বলা চলে না,—কারণ সোফিয়ার মতে—'একেই তো বেগম যা লক্ষী মেয়ে!'—সোফিয়া মহা বিড়ম্বনায় পড়িল।

সেদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া, বেগম জল খাইতে খাইতে শুনিল সোফিয়া আজ রাত্রের মত তাহার বাড়ীতে বেগমের আহার ও শয়নের নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছে!—

গম্ভীর হইয়া বেগম জানাইয়া দিল, নিমন্ত্রণ খাইলেই আজকাল তাহার গুরুতর রকমে স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে, ওটা মোটেই চলিবে না। তা ছাড়া অঙ্ক বুঝাইয়া দিবার জন্য আজ কোন এক মহিলা শিক্ষয়িত্রী সন্ধ্যার পর তাহার কাছে আসিবেন, সুতরাং আজ সে কোথাও যাইতে পারিবে না।

কিন্তু রাত্রি ন'টার পরও যখন মহিলা শিক্ষয়িত্রীটির কোনও উদ্দেশ পাওয়া গেল না, তখন সোফিয়া আসিয়া বেগমের সত্যবাদিতার উপর সন্দেহ প্রকাশ করিয়া এমন সব চোখা চোখা

বচন বর্ষণ সুরু করিয়া দিল, এবং মাতাও এমন ভাবে বিরক্তি প্রকাশ করিলেন, যার পর পড়াশুনা ছাড়িয়া বেগমকে আস্তে আস্তে উঠিতেই হইল,—এবং সোফিয়ার বাড়ী গিয়া নিমন্ত্রণটাও রাখিতে হইল। কিন্তু খাওয়া শেষ হইবা মাত্র সে এত ব্যস্ততার সহিত বাড়ী ফিরিল, যে সোফিয়া তাহাকে কোন কথা বলিবার সময় পাইল না।
গতিক মন্দ দেখিয়াই হউক, বা অন্য কিছু ভাবিয়াই হউক,—সোফিয়া রাত্রে থাকিবার জন্য বেগমকে আর পীড়াপীড় করিল না।

পরদিন সকালে, পিতা বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন। বেগম খবর পাইয়া একটু পরে উপর হইতে নামিয়া পিতার সহিত দেখা করিতে গেল। তাঁহার ঘরের বারেণ্ডায় পা দিয়া, বেগম শুনিল ঘরের ভিতর মাতা তাহারই নাম লইয়া খুব নিম্নস্বরে কি একটা কথা বলিতেছিলেন, উত্তরে পিতা বাধা দিয়া বলিতেছেন "ও সব বাজে কথা।—বিয়েটা ছেলেখেলা নয় যে তোমার আমার খেয়াল-মাফিক ওটা যা হোক্ তা হোক্ রকমে শেষ করে দেব। যাদের বিয়ে তাদের মতামত আমায় আগে মান্‌তে হবে, তারপর তোমার আমার মত!—"

"কিন্তু আমাদের সময়—"

"আঃ কি মুশ্‌কিল্! সেটা যে তিরিশ বছর আগের সময়, গো। 'আমাদের সময়' বলে সেটা কি এই তিরিশ বছর পরেও দাঁড়িয়ে থাক্‌বে? সময় যে ক্রমাগতই চলে যাচ্ছে!—তা ছাড়া বুঝে দ্যাখো না, ছেলে এখন লেখা পড়া শেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে, মেয়েরও সেদিকে ঝোঁক রয়েছে। ওদের সে পথ রুখ্‌লে, ওদের জীবন মাটী করে দেওয়া হবে। সব ছেলে দুনিয়ায় পণ্ডিত হবার জন্যে জন্মে না, সব মেয়েও নয়! কিন্তু যাদের শেখবার ক্ষমতা আছে,—তাদের ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করতে দেওয়াই ভাল, নইলে বড় অন্যায় হয়।"

পিতা ফর্‌সী টানিতে লাগিলেন। মাতা নীরব।

এ সব কথা কর্ণগোচর হইবার পর, বেগমের বক্ষঃ দুরু দুরু করাই স্বাভাবিক,—সেটা বলাই বাহুল্য! কিন্তু অতঃপর—সে যে কি ছুতা করিয়া ঘরে ঢুকিবে, ভাবিয়া পাইল না। বারেণ্ডায় দাঁড়াইয়া নীরবে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

পিছনে দু জোড়া ছোট জুতার দ্রুত দৌড়ের আওয়াজ পাইয়া বেগম ফিরিয়া চাহিল। ছোট ভাই ও ছোট বোনটি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছিল, বেগমকে দেখিয়াই ছোট

ভাইটি থমকিয়া দাঁড়াইয়া ক্রোধারক্ত মুখে দু হাত ছুড়িয়া, অভিযোগ সুরু করিয়া দিল,—"এই মেয়েটা বুবুজি, ভয়ানক অসভ্য, ভয়ানক অসভ্য! বুঝলে ওদের স্কুলে গিয়ে সমস্ত দুষ্টুমীর কথা বলে দিয়ে এসো তো—"

বেগম, ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিবার আগেই তাহার চীৎকার শুনিয়া পিতা ঘরের ভিতর হইতে ডাকিলেন "কি হোল, সাতু? এদিকে এস। বেগম শুদ্ধ এসেছে কি?—ডাক তাকে।"

"জী হাঁ—" বলিয়া বেগম ঘরে ঢুকিয়া নতশিরে যথারীতি অভিবাদন করিল। মেয়ের মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিয়া পিতা সংক্ষেপেই দু একটা এ দিক ওদিকের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ছোট ছেলে ততক্ষণে জুতা খট্ খট্ করিয়া সামনে আসিয়া, বুক চিতাইয়া মাথা উচাইয়া, সটান সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া অভিযোগ ঘোষণার প্রতীক্ষায় কঠিন গাম্ভীর্য্যে অপেক্ষা করিতে লাগিল। ছোট মেয়েটি ততক্ষণে গুটি গুটি চরণে ঘরে ঢুকিয়া জননীর পিছনে নিশ্চিহ্ন রূপে গা ঢাকা দিল।

বড় মেয়ের সঙ্গে কথা শেষ করিয়া পিতা ছোট ছেলের দিকে চাহিয়া বলিলেন "খবর কি হে?"

সে এক নিঃশ্বাসে চট্ করিয়া উত্তর দিল, "বুবু মেয়েটা বড় অসভ্য হয়েছে, দুলা ভাইদের বাড়ীতে সেই যে 'নয়া ভাইজী' এসেছেন,—তাঁকে গিয়ে বলছে 'আপনার হাৎ কানা বেশ চুন্দোল্ তো'—এম্নি বে-আদব্! ওর কাণ মলে দিই?"

ফর্সীর নলটা মুখে তুলিয়া ঈষৎ হাসিয়া পিতা বলিলেন "আগে নালিশের হাল বয়ান শেষ কর, আর কি বে-আদবী করেছে?—"

"আর কিছু না, আব্বা।—"

"ভাল করে ভেবে দ্যাখো।"

"জী না, আর কিছু নয়,—"

"আচ্ছা এই ক' দিনে? তোমার সঙ্গে কিছু অন্যায় করেছে?—"

"জী হাঁ,—ঘুড়ির সুতো নিয়ে কাল আমার সঙ্গে ঝগড়া—" কিন্তু বিনা বাধায় হঠাৎ কথাটা তাহার নিজের মুখেই অতর্কিতে বাধিয়া গেল।—থতমত খাইয়া আড় চোখে সে ছোট বোনের দিকে চাহিল!

জননীর পিছন হইতে ছোট বোন তদ্দণ্ডেই ফোঁশ করিয়া উঠিল। কাঁদো-কাঁদো সুরে বলিল "ওমা গো! কি মিথ্যেবাতী সেজে বাবা!—সে তোমার্ সুতো না, তুমিই আমার্ সুতো কেড়ে নিতে এসেসিলে?……"

ভাই বোনের অভিযোগের ভিড়ে নিজের তথ্যটা বেমালুম চাপা পড়িতে দেখিয়া,—বেগম মনে মনে অত্যন্তই স্বস্তিবোধ করিল। পিতার আরাম কেদারার পিছনে ঈষৎ হেলিয়া দাঁড়াইয়া, নীরবে রগড় দেখিতে মনোযোগী হইয়াছিল! কিন্তু এইবার ঝগড়াটা বে-আড়া রকমে গুরুগম্ভীর হইয়া শ্রান্ত পিতার শান্তি ভঙ্গের সূচনা করিতেছে,—দেখিয়া, আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, ছোট বোনের দিকে চাহিয়া একটু ধমকাইয়া বলিল, "কে মিথ্যেবাদী? সুতো তুমি পেলে কোথা, আগে বল,—ঘুড়ি তো ওরাই ওড়ায়।—কেন ঝগড়া করছ?

অভিমান ভরে ঠোঁট ফুলাইয়া ছোট বোন বলিল "আহা-হা! ছুনীরায় আর্ কারুর্ ঘুড়ি নেই, সুতো নেই?—কাল কাদের 'সেজের' ঘুড়ি কেটে গিয়েসিল, হোসেন ছাতের ওপর থেকে সুতো লুটেছিল,—আমায় সেই সুতো দিয়েছিল। উনি 'সেজে' সতী লক্ষ্মী হয়ে বল্লেন আমার সুতো!—হোসেন-কে 'জিংগাসা' কর-না।"—কান্নার উচ্ছ্বসে অধীর হইয়া সে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে মার পিঠে মুখ লুকাইল।

বোনটিকে কাঁদিতে দেখিয়া সাতু অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল "কাঁদিস কেন বাপু? আমি না হয় আমার সুতো মনে করে কেড়েই নিয়েছিলুম, তাপর তোর সুতো জান্তে পেরে তখুনি ফিরিয়ে দিই নি?—উল্টে আমার পুরোণো লাটাইটা শুদ্ধ তোকে রি-ওয়ার্ড করেছি, করি নি?"

"তত্রাচ তুমি কাওয়ার্ড! রীতিমত কাওয়ার্ড!—" ফরসীর নলটা মুখ হইতে নামাইয়া পিতা বলিলেন "মেয়েদের মিথ্যে ছুতো খুঁজে খুঁজে বেড়াবার দিকে যে সব ছেলের উৎসাহ এত বেশী,—তারা ওয়ার্থলেস্ কাওয়ার্ড ভিন্ন আর কিছুই নয়। বেগম, ওকে নিয়ে যাও। তোমার ঘরে নিয়ে গিয়ে, দেয়ালের দিকে মুখ করে, ওকে আধ ঘণ্টার জন্যে দাঁড় করিয়ে রাখো।"

পলাইবার ছুতা পাইয়া বেগম হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাড়াতাড়ি ছোট ভাইটির হাত ধরিয়া বাহিরের দিকে চলিল।

পিছন হইতে মাতা ডাকিয়া বলিলেন "আজ কি তোর কলেজ আছে ?"

ফিরিয়া চাহিয়া বেগম বলিল "আছে।"

"তবে কামাই কর ; আজ কাল দুদিন কলেজ যেতে হবে না।—"

বেগম শঙ্কিত হইয়া প্রশ্নোৎসুক দৃষ্টিতে পিতার পানে চাহিল। পিতা কর্ণী টানিতে টানিতে মুহূর্ত্তের জন্য কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন,—পরক্ষণেই দৃষ্টি ফিরাইয়া বেগমের মাতার দিকে চাহিয়া বলিলেন "কেন ? ও কলেজ কামাই করে তোমার ঘর-সংসারের কি দরকারে লাগবে ? না, না,—ওদের পড়াশুনো নষ্ট করো না।"—কন্যার দিকে দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন "না, তুমি কলেজ যেয়ো।—"

বেগম ঘাড় নাড়িয়া, নিঃশব্দে ভাইয়ের হাত ধরিয়া চলিয়া গেল।—

উপরে উঠিয়া,—ভাইকে 'দেয়াল-মুখো' শাস্তির জন্য দাঁড় করাইতে করাইতে বেগম মৃদুমন্দ হাস্যে বলিল "আমার দায় দোষ নেই ! আব্বার হুকুম ! আধ ঘণ্টার জন্যে নিরুপদ্রবে Wallface হও !—"

ভাই কোন জবাব না দিয়া গম্ভীর ভাবে শাস্তি গ্রহণ করিল। পিতার ন্যায়পরায়ণতার প্রভাব বাড়ীর ছোট বড় সকলকেই মাথা হেঁট করিয়া মানিতে হইত। অন্যায়ের শাস্তি-গ্রহণের সময়, পিতার আদেশের বিরুদ্ধে কেউ মাথা নাড়িবার কারণ খুঁজিত না।

প্রহরা দিবার জন্য,—একখানা দর্শন শাস্ত্রের বই খুলিয়া,—বেগম নিকটস্থ চেয়ারের উপর বসিল। মিনিট দশেক পরে, বালক আস্তে আস্তে ঘাড় তুলিয়া শেল্‌ফের উপর ঘড়িটার দিকে আড় চোকে চাহিতেই,—সতর্ক প্রহরিণী তৎক্ষণাৎ হাঁকিলেন—"বী কেয়ারফুল !" বালক আবার ঘাড় গুঁজিল।

ঠিক—সেই সময় দুয়ারের বাহির হইতে হোসেন বলিল, "একটা চিঠি আছে—"

বেগম বলিল "চলে এস।"

হোসেন ঘরে ঢুকিয়া চিঠি দিল। বেগম দেখিল পিতা লিখিয়াছেন :—সাতুর শাস্তি ১৫ মিনিটের জন্য মাফ করা গেল। তাকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে ছেড়ে দাও। আর,—আজ বিকালে কলেজ থেকে ফিরে,—তুমি এক ঘণ্টার মধ্যে বাহিরে যাবার পোষাকে তৈরী হয়ে থেকো। দরকার আছে। যথা সময়ে জানতে পারবে।—ইতি—তোমার আব্বা।

ইহাই পিতার চিরন্তন রীতি!—ছেলে মেয়েদের সঙ্গে লইয়া বৈকালিক ভ্রমণে বাহির হইবার ইচ্ছা থাকিলে পিতা পূর্ব্বাহ্নে এইরূপ নোটীশ জারী করিয়া থাকেন। সুতরাং আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। বেগম বলিল,—আজও সেই রকম কোথায় যাইতে হইবে।

হোসেনের কাছে সংবাদ লইয়া জানা গেল পিতা স্নানের ঘরে গিয়াছেন। হোসেনকে বিদায় দিয়া বেগম ঘড়ির দিকে চাহিয়া বাকী পাঁচ মিনিটের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ—

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

বাধানো দাঁত।

কোথায় গেল সবল ধবল সেই দশন
কে আজ দখল করলে তাহার সিংহাসন।
রূপটী শুধু রাখলে কে হায় শান দিয়ে
শক্তি নাহি সজীব করে প্রাণ দিয়ে।
বিধির গড়া রক্ত মাসের মন্দিরে
রাঙ্ ঝালে কে জুড়তে এলো সন্ধি রে।
রস না পেয়ে রঙেই কি আর বাঁধবে জোড়
গড়া কোকিল বসন্ত কি আনবে ভোর?
কনক কুসুম আট্‌কে দিলে পর-গাছে
আসবে অলি আসবে কি আর তার কাছে?

কোথায় পাবে সেই পরিমল সেই পরাগ
পদ্ম গড়া যায় না দিয়ে পদ্মরাগ !

(২)
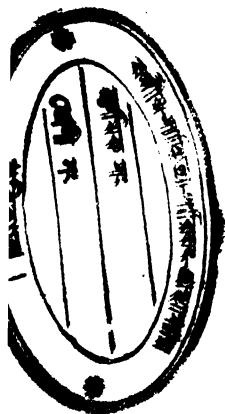
রামেশ্বরের লহর পাথর পড়লো যা
মুক্তা, দেহের ঝালর থেকে ঝরলো যা।
কোন্ সোহাগার রশান দিয়ে জুড়বি রে ?
উলট পালট বৃথায় করিস উব্বীরে।
আসছে বাদল মানস মরাল জানছে ভাই
শ্বেতাম্বরার শোভায় থাকা ভাঙছে তাই।
ভাঙ্গা বাগান জোগান দিবি কার বলে
মুখোস লয়ে ঘর করা কি আর চলে ?
গঠন না হয় গড়তে পারে মর্ম্মরে
প্রাণ দেওয়া কি কারিগরের কর্ম্ম রে !
কনক সীতার মূর্ত্তি অবিকল দেখি
নির্ব্বাসিতা সীতায় শ্রীরাম ভুলবে কি ?

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

সমবায়ের আবশ্যকতা।

আত্ম অবস্থার উন্নতির চেষ্টা যে, দেশে পরিলক্ষিত হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু প্রকৃত পথের সন্ধান না পাওয়ায় শক্তির যথেষ্ট অপব্যবহার হইতেছে। কি করিলে অর্থের আগম হয়, কোন উপায়ে তাহা এ দরিদ্র দেশেও সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভব, সে বিষয় জ্ঞান না

থাকায় সমস্ত উৎসাহই পণ্ড হইতে বসিয়াছে। সকল বিষয়েই শিক্ষার প্রয়োজন এবং শিক্ষিতের সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানাদি সম্পাদিত হওয়া উচিত। নতুবা অভিজ্ঞতার অভাবে সমস্তই বিফল হইয়া যায়। স্ব স্ব প্রধান ভাব প্রবল হইলে সমবায়ের কার্য্য চলা অসম্ভব; অথচ দেশের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে, দেশের মিলিত শক্তির সুষ্ঠু পরিচালনাই প্রকৃষ্ট পথ।

আজও সাধারণে যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না তাহার কারণ,—মিলিত হইয়া কার্য্য করিবার মত শিক্ষা ও সমবায়ের অভাব। প্রাচীন হিন্দুভারতে গ্রামে গ্রামে যে সমবায়ের প্রতিষ্ঠান ছিল তাহার স্থলে এক্ষণে নানা কারণে ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। যে সমবায়ের উপর হিন্দু সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহাও এক্ষণে নানা কারণে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। এই দৈন্য, শিক্ষা ও উন্নতির পথে ভীষণ অন্তরায় স্বরূপ। এই দারিদ্র্য দূর করিতে হইতে হইলে যাহাতে ব্যয় কমাইয়া আয় বৃদ্ধি করিতে পারা যায় তৎপ্রতি সকলেরই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

আয় বৃদ্ধি করিবার প্রধান অন্তরায় প্রজাবর্গের ঋণ এবং অতিরিক্ত সুদের হার। অবশ্য আমি ইহা বলিতে চাই না যে মহাজনেরা দেশের অপকারই করিয়া আসিতেছে। তাহারা যে নিঃস্ব প্রজাগণকে বিপদে আপদে টাকা ধার দিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়া আসিতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে তাহারা যে অপকারও যথেষ্ট করিতেছে তাহাই আমি বিশেষ করিয়া দেখাইতে চাই। বিবাহ শ্রাদ্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠান এই মহাজনের অনুগ্রহেই দরিদ্র প্রজা অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিতে সমর্থ হয় এবং ফলে মহাজনের টাকার সুদ দিতে দিতেই তাহার জীবন কাটিয়া যায়। সুতরাং সুদের হার না কমাইতে পারিলে প্রজাদের আয় বেশী হইলেও তাহাদের অবস্থা উন্নত হইবে না। সেই জন্য আইন করিয়া সুদের হার কমাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। মাসিক শতকরা ১।/০ অর্থাৎ বার্ষিক শতকরা ১৮৫ সুদের অধিক দাবী করা অসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। ঢাকার ছোট আদালতের একজন সবজজ কোন

প্রকারেই ১৷৴০ হার অপেক্ষা অধিক হার ডিক্রী দিতেন না। * বৃটিশ ভারতে সুদ-সম্পর্কীয় যে নূতন আইন হইয়াছে তাহাতে অধমর্ণগণের কোনও সুবিধা হয় নাই। যেটুকু বা হইয়াছিল তাহা বিলাতের মহাবিচারের ফলে আর হইতে পারিতেছে না। সুতরাং আইন গঠন করিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে উত্তমর্ণগণ কিম্বা ব্যবহারজীবিগণ তর্কের জাল বুনিয়া আইনকে ফাঁকি দিয়া বেশী সুদ আদায় না করিয়া লইতে পারে।

সুদ কমাইবার প্রকৃষ্ট উপায় গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি বা Co-operative Society প্রতিষ্ঠা করা। মহাজনদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে গেলে আত্মসম্মানের উপর বড়ই কঠিন আঘাত লাগে এবং খাতক আপনাকে হীন বলিয়া মনে করে। এই অবমাননা হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করিতে হইলে এক সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করা ভিন্ন উপায় নাই।

জিলার প্রধান সহরে যদি একটি মূল কেন্দ্র সমবায় সমিতি (Central Co-operative Bank) প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মহকুমায় উপ-সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়া তাহার অধীনে গ্রাম্য সমিতি (Rural Bank) প্রতিষ্ঠা করা যায় তবেই গরীব প্রজা ঋণ-সমস্যা হইতে উদ্ধার পাইতে পারে এবং মহাজনদের সুদের হারও সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যাইতে

* কোচবিহার আদালতেও বার্ষিক শতকরা ১৷৴০ বেশী সুদ ডিক্রী দেওয়া হয় না। আইন দ্বারা উহাই উচ্চহারের সুদরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কিন্তু মূল সংশোধিত না হইলে আইনে ঠিক লোককে রক্ষা করিতে পারে না। অধমর্ণের গরজ বেশী, কাজেই এমন অনেক স্থলে প্রকাশ পায় যে মহাজন টাকা দিবার সময়ই শতকরা দশ টাকা 'গদি সেলামী' বলিয়া কাটিয়া লয়! অর্থাৎ ৯০৲ টাকা লইয়া ১০০৲ টাকার দলিল অধমর্ণ দেয়। আদালতে ইহা প্রমাণিত হইলে অবশ্য বিহিত ব্যবস্থা হয় কিন্তু আদালতের প্রমাণের প্রাণ অনেক সময় 'সত্য' নয়, অর্থ। এ-দেশে প্রকৃত 'মহাজন' সৎ স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে এ ঋণদান ব্যাপার ন্যস্ত না হইলে দরিদ্র প্রজাকে পীড়নের হাত হইতে রক্ষা করিবার উপায় নাই। এ হিসাবে সমবায়ের আবশ্যকতা আমরা বিশেষভাবে স্বীকার করি। কোচবিহারে সরকারী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ায় এ অভাব অনেক পরিমাণে নিরাকৃত হইবার পথ হইয়াছে কিন্তু সমবায় হইতেও ঋণদাতার মনের সংস্কারের প্রয়োজন আরও বেশী,—সে শিক্ষা আজও ভগবানের হাতে। সং

বাধা হয়। যাহাতে গ্রামে গ্রামে এইরূপ সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে।

এইরূপ সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইলে শিক্ষাসমস্যাও সহজে বিদূরিত হইবে। প্রত্যেক সমিতির অধীনে একটি করিয়া বালক বালিকার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এই সকল বিদ্যালয়ে স্থানীয় ইতিহাস ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস স্থানীয় ভৌগোলিক বৃত্তান্ত, ব্যবসা বাণিজ্য তত্ত্ব, অঙ্ক পড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সকল বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার সমিতিই বহন করিবে। সরকারী সাহায্যও কিঞ্চিৎ থাকা বাঞ্ছনীয়।

দেশের বাণিজ্য বৈদেশিক ব্যক্তির হাতে। ব্যক্তিগত প্রতিযোগীতা দ্বারা এই সকল বৈদেশিক বণিকের সঙ্গে পারিয়া উঠা এক রকম অসম্ভব বলিলেই হয়। কিন্তু সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইলে সমিতির সভ্যগণ যদি তাহাদের আবশ্যকীয় জিনিষপত্র সমিতির ভাণ্ডার হইতে ক্রয় করে তাহা হইলে এই সকল বণিকগণকে আর টিঁকিয়া থাকিতে হইবে না। আর টিঁকিয়া থাকিলেও ইহারা অতিরিক্ত লাভ লইতে পারিবে না। এইরূপে বাণিজ্য আপনা হইতেই সমিতির হাতে চলিয়া আসিবে। ইহার ফলে জিনিষপত্রের মূল্য কমিয়া যাইবে। জনসাধারণের সুখ সুবিধাও বর্দ্ধিত হইবে।

এইরূপ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইলে কেন্দ্র সমিতির ও উপকেন্দ্র সমিতির তত্ত্বাবধানে বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে কৃষিক্ষেত্র সহজেই গঠিত হইতে পারিবে। এইরূপ কৃষিক্ষেত্র থাকিলে কাহাকেও ধান চাষের জন্য আর অন্য কোন দেশের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। তারপর ধীরে ধীরে কাপড়ের কল, চালের কল প্রভৃতি কলকারখানা স্থাপনের পথও সুগম হইয়া উঠিবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে দেশের উন্নতি নির্ভর করে এই সমবায় সমিতির উপর। ব্রিটিশ ভারত হইতে দেশীয় রাজ্যে এ সকল মঙ্গলজনক সমবায়ের প্রতিষ্ঠা সহজ কারণ প্রজাবর্গের জীবনে রাজনৈতিক সমস্যা দেশীয় রাজ্যে কম এবং রাজ্যেশ্বরও দেশের ও দেশীয় কৃষি, শিল্প প্রভৃতির উন্নতির জন্য চেষ্টিত। এই জন্য এই বিষয় জনসাধারণ, উকিল, শিক্ষক এবং রাজকর্ম্মচারীবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা প্রজাবর্গের শুভাকাজ্ক্ষী তাঁহারা যেন কথাটা একবার ভাবিয়া দেখেন। এবং যুক্তিসঙ্গত মনে করিলে তাঁহারা যেন কার্য্যক্ষেত্রে

অবতীর্ণ হইয়া পড়েন। উচ্চশিক্ষাপদ্ধতির ও শাসন পদ্ধতির বিরুদ্ধে তর্কজাল না বিস্তার করিয়া এই আশাপ্রদ কার্য্যটীর প্রতি মনোনিবেশ করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত।

ঘুমপাড়ানি গান।

——:*:——

নিশীথিনী নামচে ধীরে
ঐ গো সাঁজে,
অস্তাচলে উড়িয়ে চেলী
রঙীন ভাঁজে।
পাখীর গলার সুর জানা যে,
বাজ্‌চে খোকার খুব কান্‌চে;—
দিগ্‌বধূরা হাস্‌চে দেখ
নূতন ধাঁচে!
আকাশখানি উজল হল
আলোয় চাঁদের,
তারা বুটি জ্বলচে কালোয়
মধুর ছাঁদের।
ঐ যে রাতির কর্ণমূলে
সোনার স্বপন দুলটি দুলে,—
নয়ন কমল মুদ্‌চে খোকা
তন্দ্রা মাঝে!

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

তটিনী।

—:০:—
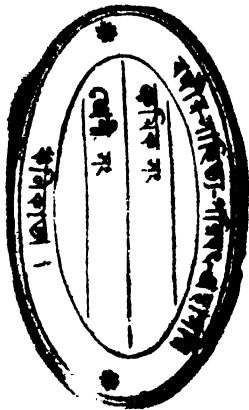
(২১)

তখনও কাক কোকিল ডাকে নাই। প্রোজ্জ্বল জ্যোতিতে শুকতারা দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছিল। অতি অস্ফুট পিঙ্গল আভায় আসন্ন উষার সোণার মুকুটখানির অগ্রভাগ জাগিয়াছিল মাত্র। চারিদিক নিস্তব্ধ নীরব! কচিৎ তরু মর্ম্মর ধ্বনিতে এই স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া দিতেছিল।

অম্লান শুভ্রমুখে বিনিদ্র রাত্রির গভীর ক্লান্তি মাখিয়া গরম মাথাটা ঠাণ্ডা করিবার জন্য তটিনী জানালার কাছে দাঁড়াইয়াছিল। স্নিগ্ধ শীতল বাতাসে অনেকটা জুড়াইয়াও আসিতেছিল।

একটু ফরসা হইলেই সে দেখিল বাড়ীর রাঁধুনি ব্রাহ্মণ বাসুদেব দোবে নদীতে প্রাতঃস্নান করিয়া গান গাহিতে গাহিতে আসিতেছে। শীতের তাড়নায় দাঁতে দাঁত লাগিয়া যাইতেছিল তবু তার সে অক্ষুণ্ণ উৎসাহের কোনো লাঘব দেখা গেল না। ঘাসের উপর ভিজা কাপড় শুকাইতে দিতে দিতে সে তুলসীদাসের ভজন গাহিতেছিল—

"আরে বনত বনত বনি যাই,
প্রভুজীসে লাগ্ রহোনা ভাই।"

হঠাৎ তটিনীর রুদ্ধদ্বারে ঘা দিয়া নিতাই ডাকিল "দিদিমণি!"

তটিনী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "কে নিতাই?"

"হাঁ, একটু বেরুবেন?"

"এত সকালে! বাবা ডাকছেন নাকি?"

তটিনী দুয়ার খুলিয়া দিল। নিতাই বলিল "বাবুর বোধহয় জ্বর হয়েছে, কেমন বেহুঁস হয়ে রয়েছেন।"

"বেহুঁস হয়ে রয়েছেন! সে কি নিতাই!"

"চলুন ত একবার ও ঘরে।"

তটিনী উৎকণ্ঠিত মুখে নিতাই এর সঙ্গে তারিণীবাবুর ঘরে গেল। তারিণীবাবু তখন প্রবল জ্বরের ঘোরে যেন খুব ঘুমাইতেছেন। তটিনীর যাওয়া আসা কিছুই তিনি টের পাইলেন না।

তটিনী সাবধানে কপালে হাত দিয়া দেখিল ভয়ানক গরম। তারিণীবাবুর শরীর অসুস্থ ছিল না। রোগ ব্যাধিতেও তিনি অল্পই ভুগিতেন। তাঁর এই রকম জ্বর দেখিয়া তটিনী বিষম ভয় পাইয়া গেল।

নিতাই বলিল "অতুলবাবুকে ডাক্‌বো দিদিমণি?"

"ডাক।"

একটু পরেই অতুল আসিয়া তারিণীবাবুর কপালের উত্তাপ দেখিয়া উদ্বিগ্ন মুখে ডাক্তার ডাকিতে চলিয়া গেল। সে তটিনীকে কোনো কথাই বলিল না।

পাছে কোনো শব্দ পাইয়া কর্ত্তার ঘুম ভাঙ্গিয়া কিছু যন্ত্রণা বাড়ে সেই ভয়ে তটিনী কাঠের মত স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

ডাক্তার আসিয়া ঔষধ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় বরফের ব্যাগ দিবার ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। অকস্মাৎ এই বিপদে পড়িয়া তটিনীর ভাবনার জাল একেবারে উল্‌টাইয়া গেল।

এই নিঝুম তন্দ্রা ও প্রবল জ্বর তিন চার দিনের মধ্যেও যখন ছাড়িল না, তখন পরামর্শ করিবার জন্য তটিনী উমাকান্তকে খবর দিল। অতুল স্বভাবতঃই ভীরু মানুষ সে ভাবিয়াই পাইত না যে কোন্ সময়ে কি কর্ত্তব্য!

কাজের সময় চিন্তা পীড়িত দুর্ব্বলতা তটিনীর ছিল না। মনকে নিঃসাড় করিয়া কর্ত্তব্যটুকু নিখুঁত করিবার শক্তি তার ছিল। তাই মূল্যবান যন্ত্রের মত সেবার কাজ করিয়া যাইতেছিল।

এক সপ্তাহ পরে জ্বর কমিয়া গিয়া তারিণীবাবু একটু চৈতন্য পাইলেন। সামান্য দুই একটা কথাও বলিলেন। ডাক্তার বলিয়া গেলেন যে দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই এঁকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া চিকিৎসা করাইতে হইবে।

তটিনী বসিয়া বেদানার রস ছাঁকিতেছিল। খালি পায়ে উৎকণ্ঠাকুল মুখে উমাকান্ত আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। তটিনী তাঁকে প্রণাম করিয়া ইঙ্গিতে কথা বলিতে বারণ করিয়া দিল।

অতুল কিন্তু ঘরে ঢুকিয়াই উমাকান্তকে ডাকিয়া বাহিরে লইয়া গেল। তিনি বারান্দার একটা আসনে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন "কি অতুল ?"

রেলিংএ ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া অতুল মৃদুকণ্ঠে বলিল "আপনি ওঘরে যাবেন না বড় মামা,—"

"কেন বাবা ? আমি কি না গিয়ে থাক্‌তে পারবো ?"

কিন্তু ডাক্তারের বারণ আছে। আপনাকে দেখে হয় তো উত্তেজিত হ'তে পারেন—"

"এখনও আমায় দেখে উত্তেজিত হবে,—কেন ?"

অতুল তারিণীবাবুর ব্যারাম হইবার পূর্বরাত্রের কথা যা তিনি অতুলকে বলিয়াছিলেন সমস্তই উমাকান্তকে ভাঙ্গিয়া বলিল। উমাকান্ত একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন "আমিও ভেবে পাইনে বাবা, ভগবান এমন মতি আমাকে কেন দিয়েছিলেন তখন ;—অমঙ্গল অভিপ্রায় তো আমার কোনোকালে কখনও ছিল না।"

অতুল নীরবে মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উমাকান্ত মাথার হাত দিয়া উঠানে একটা রোমন্থনরত কালোরংয়ের গাভীর দিকে বহুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে অতুলের মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তিনু কি এ সব জানে ? তুমি বলেছ কিছু তাকে ?"

"না। আমরা তিনুকে এ কথা কেউ কখনো বলিনি।

"তা হ'লে সে জানে না ?"

"বোধ হয় না।"

"তাই হবে। তা নইলে নিশ্চিন্ত মনে থাক্‌তে পারতো না, তার যা কিছু ভাবনা এখন তার বাবাকে নিয়ে,—ডাক্তারেরা আজ কি বলেছেন ?"

"ক'লকাতায় নিয়ে যেতে হবে বলেছেন। ক'লকাতাতে বাসা ভাড়ার জন্য টেলিগ্রাম করে দিয়েছি, আজই তার উত্তর পাওয়া যাবে, উত্তর এলেই যাওয়া যাবে।"

"ওই অবস্থায় নাড়ানো কি ভাল হবে ?"

"না। যদি দুদিন একটু ভাল থাকেন, তবেই। জ্বর বেশী থাকে তো কি ক'রে নিয়ে যাওয়া চল্‌বে ?"

"আজ তো জ্বর কম আছে ব'লছিলে।"

"হাঁ। আজ জ্বর কমে গিয়েছে।"

ঘর হইতে তটিনী ডাকিল "অতুলদা একবার এদিকে এস তো !"

অতুল বলিল "তা হলে আপনি নীচে গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করে হাত মুখ ধুয়ে আসুন,—আমি যাই দেখি গিয়ে তিনু কেন ডাকছে।"

উমাকান্ত একই ভাবে বসিয়া রহিলেন। অতুল ব্যস্ত ভাবে তারিণীবাবুর ঘরে গিয়া দেখিল তটিনী বসিয়া পিতার মাথায় বাতাস দিতেছে। পরদার ফাঁক দিয়া অনুজ্জ্বল স্নিগ্ধ দিনের আলো ঘরে আসিতেছে।

টেবিলের উপরের ফুলগুলি বদলানো হয় নাই। শিথিল বৃন্ত ম্লান পুষ্পদলগুলি ঘরের মেঝেয় ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল।

বাড়ীর সর্ব্বত্র নীরব। এ ঘরখানি আরো শব্দহীন। কেবল নব বসন্ত জাগরণ উৎফুল্ল কোকিলের কলঝঙ্কার ঘরের মধ্যেও আসিয়া পৌঁছতেছিল। এইটুকু ছাড়া বাহিরের রূপ-রসের বর্ণের আর কোনো ছোপ্‌ই এই রুদ্ধ ঘরে প্রবেশ পথ পায় নাই।

অতুল আসিয়া তটিনীর মুখপানে চাহিল। তটিনী মৃদুস্বরে বলিল "বাবা ডাকচেন।"

তারিণীবাবু অতুলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "কই দাদা ?

অতুল বুঝিল যে তারিণীবাবু সেই সময়েই উমাকান্তকে দেখিয়াছিলেন। তাঁর কাছে আর গোপন করার কোনো দরকার এখন নাই। সে যে অনর্থক উমাকান্তকে বাহিরে লইয়া গিয়া তাঁকে কষ্ট দিয়াছে সে জন্য মনে মনে সে অত্যন্ত কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইল। উমাকান্ত হয়তো এর জন্য অতুলকে কত দোষীই মনে করিবেন। তারিণীবাবু আবার আদেশ করিলেন "দাদাকে ডেকে দাও।"

অতুল উমাকান্তকে ডাকিয়া দিয়া নিজে আর সেখানে দাঁড়াইল না। তটিনী বলিল "আপনি জল-টল কিছু খেয়েছেন ?"

উমাকান্ত বলিলেন "এখন তুমি এর জন্য ব্যস্ত হয়োনা মা।"

উমাকান্ত তারিণীর বিছানার কাছে একখানা চেয়ার সরাইয়া বসিলেন। তারিণী তাঁর সঙ্গে দুই চারটী কথা যাহা বলিলেন তাতে বাচীনের কোনো প্রসঙ্গ বা সে ধরণের কোনো কথার নাম গন্ধও নাই। নিতান্ত সাধারণ কুশল প্রশ্ন মাত্র। তাঁর মনের যে কোনোওখানে এতটুকু আন্দোলন আছে সে কথার তিনি উমাকান্তকে বাষ্পও জানিতে দিলেন না।

অতুলের মুখে এই কিছুক্ষণ আগে উমাকান্ত যে বিবরণ শুনিয়াছিলেন, তারিণীর এই একান্ত নির্লিপ্ততা তাঁকে আরও বেশী আহত করিয়া তুলিল। তিনি বুঝিলেন তারিণীর যেখানে বেদনা, সেখানে তিনি স্পর্শ করিবার অধিকার পাইবেন না!

তারিণী চিরদিন নিজের বেদনা সঙ্গোপনে নিজেই বহন করিয়া আসিয়াছেন। কখনো কোনো ব্যাথার অংশ কাহাকেও দিয়া বেদনাকে লঘুতর করিবার চেষ্টা তাঁর স্বভাবে ছিল না। আজিও তিনি তাহা করিলেন না।

উমাকান্তও মনের ব্যথা মনেই চাপিয়া তারিণীর সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ বলিলেন "তিনুমা এখন তো তোমার বাবা একটু ভাল আছেন, এই বেলা তুমি একবার নীচে গিয়ে কিছু খেয়ে এস।"

তটিনী প্রতিবাদ না করিয়া উঠিয়া গেল। পিতাকে কথা বলিতে দেখিয়া সে বোধ হয় মনে একটু বলও পাইয়াছিল।

(২২)
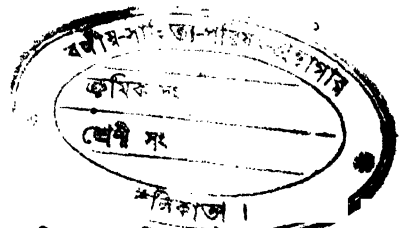
প্রায় দুই সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। পশ্চিমের শীতের তীক্ষ্ণতা কমিয়া রৌদ্রের উত্তাপ ঈষৎ তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। তারিণীবাবু বিছানার উপর বসিয়াছিলেন। তাঁর জ্বরের সে প্রকোপ কমিয়া গিয়াছিল। এখন প্রত্যহ বৈকালে সামান্য জ্বর হইতেছিল।

একটা বড় ফুটন্ত গোলাপ ফুল হাতে করিয়া তটিনী ঘরে ঢুকিয়া বলিল "আপনার সেই নতুন গাছে আজ এই ফুলটা ফুটেচে বাবা,—কি চমৎকার হয়েচে।"

তারিণীবাবু ফুলটী হাতে করিয়া একবার আঘ্রাণ লইলেন। পরে বলিলেন "আমি তো মনে করেছিলাম যে, গাছটা বুঝি শুকিয়ে যাবে "

তটিনী টেবিলের উপরকার ফুলদানী হইতে শুষ্কফুল ফেলিয়া টাট্‌কা ফুল বসাইতেছিল। সে বলিল "না গাছটি শুকোয়নি তো! বেশ লেগে গেছে। এই যে চারটে বাজ্‌লো,—বাবা আপনাকে ওষুধ দেব?"

"ওষুধে তো ভারি ফল দিচ্ছে তিনু,—ওষুধ এখন দিন কতক বন্ধ ক'রে দেখলে হয়।"

তটিনীর বেদনাময় অন্তরটা আরো অধিকতর দমিয়া গেল। সে ব্যাথা ভরা সংশয়ের বোঝা গোপনে বক্ষতলে বহিয়া বেড়াইতেছিল, কেবল পিতার মুখ চাহিয়া।

সে মুখ ফিরাইয়া শিশিটী নাড়িতে নাড়িতে বলিল "ওষুধ বন্ধ করা কি ভাল হবে বাবা? যদি বাড়ে আবার?"

তারিণীবাবু উদাস ভাবে বলিলেন "আর বাড়্‌বে না।"

তটিনী পিতার স্বভাব জানিত। তবু মৃদু কণ্ঠে বলিল "অন্ততঃ এই শিশিটা শেষ ক'রে ফেলুন বাবা,—আর ক'দাগ-ই-বা আছে?"

তারিণীবাবু এবার উত্তরও দিলেন না। উমাকান্ত আসিয়া স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন "কি হচ্চে তিনু-মা?"

তটিনী বলিল "বাবাকে ওষুধ দিতে এসেছিলাম।"

"দিয়েছ ওষুধ?"

তারিণী উষ্ণ হইয়া উঠিলেন। বলিলেন "কি জ্বালাতন! কেবল ওষুধ ওষুধ! তুই যা তিনু, আমি ও ওষুধ খাব না।"

তটিনী জলভরা চোখ নামাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর বলিল "থাক্! অনিচ্ছায় কিছু খেলে উপকার হতে পারে না।"

উমাকান্তও বলিলেন "আচ্ছা থাক্ তবে। কিন্তু তুমি ক'লকাতা যেতে মত ক'রছো না কেন?"

"কি হবে সেখানে গিয়ে? আমার রোগ কি তেমন কিছু সাংঘাতিক যে যাওয়াই দরকার? আর টানাটানিতে প'ড়তে ভাল লাগে না।"

"রোগ সাংঘাতিক নাই বা হ'ল, একটা চেষ্টা তো হবে। তা ছাড়া তিনু মায়ের বড় ইচ্ছে যে কল'কাতা দেখবে।"

"তিনু ব'লছিল বুঝি?"

"খুলে বল্‌বার মেয়ে কি তোমার? তবে কথায় তাই মনে হয়।"

"কি বলছিল? তারপর!"

"এই পাঁচ দিনকার পাঁচ কথায় তার মনের কথাটা টের পেয়ে গেছি আর কি?"

তটিনী লজ্জানত মুখে ঘরের এক কোণে দাঁড়াইল। সে উমাকান্তের এই কৌশলটুকু বুঝিতেছিল। এই বুদ্ধির সাহায্য না লইলে যে তারিণীকে কলিকাতা লইয়া যাওয়া প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিত ছিল।

তারিণীবাবু বলিলেন "সত্যিই বড় ভুল হয়ে গেল। সেবার অত যায়গা ঘুরে বেড়িয়ে এলাম, সেই সময়ে তিনুকে ক'লকাতায় দুদিন রাখলেই হ'ত।"

"ক'লকাতায় বাসা ভাড়া করা রয়েছে। আর সব ব্যাবস্থাও অতুল ক'রবে, আমাদের গেলেই তো হয়।"

"আচ্ছা, দেখি ভেবে!"

দিন কয়েক ভাবিয়া দেখিয়া তারিণী কলিকাতা যাওয়াই স্থির করিলেন। যে ডাক্তারটী তাঁর চিকিৎসা করিতেন তিনিও প্রসন্ন মুখে বলিলেন যে সেখানে গেলেই রোগ যথার্থ ধরা প'ড়বে, এখানকার কোনো চিকিৎসাতেই ওঁর একটুকু বিশ্বাস নেই, অথচ এই অবিশ্বাসের চিকিৎসাই এই এতদিন ধরে চলছে, কাজেই উপকার দিচ্ছে না।"

তারিণীবাবু ক্ষীণ হাসিয়া বলিলেন "রোগে ভোগা আমার বড় বেশী অভ্যাস নেই কি না? তাই আপনাদের ও-সব ওষুধ পত্রেই বড় ভক্তি শ্রদ্ধা করতে পারিনে।"

উমাকান্ত মনে মনে বলিলেন "সবই খেয়াল। চিরদিনই একটা একটা খেয়ালে কাটলো! অমন সোনার বরীন যে, অপরিচিত নিঃসম্পর্ক লোককেও চরিত্রগুণে মুগ্ধ ক'রে ফেলে, সেও এই একগুঁয়ে খেয়ালের মুখে পড়ে ভেসে গেল!"

তটিনী মহেশ্বরীকে গিয়া জানাইল যে তাদের কলকাতা যাওয়ার কথা চলিতেছে, এতদিনে বাবাও মত দিয়াছেন। মহেশ্বরী শঙ্কিত ভাবে বলিলেন। "ওমা! তবে আমাকে কার কাছে রেখে যাবি তিনু? আমার বৌমাকে না হয় আনিয়ে দিয়ে যা—"

"অতুল দাকে বলবো। কিন্তু সে আসা অবধি যে আমরা থাকতে পারবো না।"

"তা হলে অতুল থাক্। নইলে আমাকেও নিয়ে চল্ আমি তো দুনিয়ার বের হ'য়ে পড়েচি।"

তটিনী সত্যই চিন্তিত হইল। এই পক্ষাঘাতে পঙ্গু প্রায় বৃদ্ধাটীকে কার কাছে রাখিয়া যাওয়া চলিবে? উমাকান্ত বা অতুল এ কথা প্রথমটা ভাবেন নাই বটে, কিন্তু তটিনীর স্থির বুদ্ধিতে এই কথাটাই সর্ব্বাগ্রে জাগিয়াছিল।

এঁকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া যেমন কঠিন রাখিয়া যাওয়াও তেমনি। অনেক দিন শয্যাগত থাকিয়া মহেশ্বরী ইদানিং একটু আধটু এধার ওধার করিতে পারিতেন মাত্র! তারিণীকে বিরক্ত করা কোনো ক্রমেই উচিত নয়! মহেশ্বরী বলিলেন "অতুলকে আমার কাছে আসতে বলিস্ তিনু, সে আমাকে কোথায় রেখে যেতে চায় একবার জিজ্ঞেস্ করতে হবে?"

তাঁর রাগ অতুলের উপরই পড়িল। অতুল তখন তার দুর্ভাগ্য ক্রমে তারিণীর সম্মুখে গিয়া পড়িয়াছিল। তারিণীবাবু সে সময় একা ছিলেন। অন্য সময়ে প্রায়ই তাঁর কাছে তাঁর পুরাতন বৃদ্ধ মুহুরি না হয় তো উমাকান্ত বসিয়া থাকিতেন সেদিন তখন আর কেহই ছিলেন না।

অফিস ঘরের যত ছোট খাট জিনিষ পত্র তারিণীবাবুর শুইবার ঘরের দালানের আলমারীতে তোলা হইতে ছিল। অতুল সেইখানেই কি একটা কাজে আসিয়াছিল। তারিণীবাবু সাড়া পাইয়া তাকে ডাকিলেন। অতুল সামনে আসিলে পরে তিনি প্রথমে কেবল বলিল "ওখানে কি করছিলে?"

অতুল যাহা করিতেছিল বলিল। তারিণীবাবু অবজ্ঞাপূর্ণ হাসির ভান করিয়া বলিলেন "তারপর? তোমার সে বন্ধুর কোনো খবর টবর পেলে আর?"

"না। এখানে বসে আর তার খবর কোথা থেকে পাওয়া যাবে?"

"তবে কোথায় গেলে পাওয়া যাবে সে নবাব পুত্রের খবর? বোম্বে যেতে হবে নাকি?"

তারিণীবাবু তেমনি অবজ্ঞার ভানপূর্ণ অনিচ্ছার হাসি হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু শীর্ণমুখে তাহা ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিল না। অতুল একটু থামিয়া পরে বলিল "ক'লকাতায় যেতে পারলেই খবর পাওয়া যাবে, অনেক বন্ধু বান্ধবেরা সেখানে আছে, তারা খবর রাখে।"

"তা হ'লে এতদিন এখানে বসে রইলে কিসের জন্যে? ওহো! সে চিঠিখানা বুঝি তোমার গায়েই লাগে নি? খুব বন্ধুতো দেখি?"

অতুল যে তাঁরই ব্যারামের জন্য কলিকাতা যাইতে পারে নাই সেই কথার সামান্য মাত্র উল্লেখ করিতেই তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন "আমি তো ম'রে ছিলাম না! ওকথা আমাকে বল্লেই তো হ'ত! ছি! ছি! মানুষের বিপদের খবর পেয়েও কি লোক চুপ ক'রে থাকে! তোমরা যে সব এমন আহাম্মুক তা-তো জান্‌তাম না!"

অতুল নির্ব্বোধ বনিয়া গিয়া কি যে বলিবে ভাবিয়া পাইল না। সে মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই যে তার সেই দরিদ্র বন্ধুটীর জন্য তারিণীবাবুর এত মাথা ব্যাথা পড়িয়া গিয়াছে! তিনি তো বরং চিরদিনই তাচ্ছল্য দেখাইয়াই আসিতেছিলেন।

তারিণীবাবু আরো কিছু মিষ্টি কথা বর্ষণ করিয়া অতুলকে ছাড়িয়া দিলে অতুল যখন ফিরিয়া আবার বাহিরের ঘরে যাইতেছিল তখন তটিনী জানাইল "পিসিমা ডাকচেন অতুল দা?"

অতুল ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "কেন বল দেখি? এইত এক যায়গা থেকে কিছু পুরস্কার পেয়ে আসচি, আবার কেন?"

"বাবা বকেচেন তোমায়? কেন ব'কলেন?"

"ইচ্ছা হ'ল বক্‌তে তাই। তুমি তো দিন দিন যে রকম চুপ হ'য়ে যাচ্চো, তাতে মনে হয় আর দুদিন পরে পাথর হ'য়ে যাবে—"

"পাথর হ'য়ে যাবো ? পাথর ? সেই বা মন্দ কি ?"

তটিনী একটু হাসিল। বলিল "কিন্তু আজকালকার বিজ্ঞানে যে বল্‌চে পাষাণেও চেতনা আছে প্রাণ আছে—"

অতুল সহজ হাসির সহিত বলিল "বেশ কথা। পাষাণও হয় তো তা হলে একদিন প্রাণী হয়ে উঠ্‌বে, যেমন সেকালের অহল্যা পাষাণী—"

"সে শ্রীরামচন্দ্রের চরণ স্পর্শে উদ্ধার হ'য়ে গিয়েছিল, এ যুগে আর শ্রীরামচন্দ্র আসবেন কোথা থেকে ?"

"তা আসবেন !"

তটিনীর মুখখানি একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে চকিত ভাবে একটু মুখ তুলিয়া পরে ব্যস্ত ভাবে বলিল "ঐ বোধ হয় আমাকে বাবা ডাকচেন ;—আমি চল্‌লাম। তুমি পিসিমার কাছে গিয়ে ঠিক ক'রে নাও গে দাদা, যে তাঁকে এখানে রেখে যাওয়া হবে কিংবা নিয়ে যাওয়া হবে !"

তটিনী আর না দাঁড়াইয়া দ্রুতপায়ে সে ঘর ছাড়িয়া গেল। সত্যই যেন সে পাষাণ হইয়া যাইতেছিল। নিজেকে সহস্র বন্ধনে আঁটিয়া বাঁধিয়া সে প্রকৃতির বিরুদ্ধে চোখ বুজিয়া চলিতে গিয়া পদে পদে আহত হইতেছিল। কিন্তু এই বেদনার কারণ সে নিজেই হয় তো ভাল রূপে জানিতে বা বুঝিতে পারিত না। তাই ব্যাথা পাইয়াও সেটাকে কিছু না বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করাই তার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।

প্রথম প্রথম কলিকাতা যাওয়া সম্বন্ধে তারিণী এতটুকু আগ্রহ ছিল না। পরে কিন্তু তাঁরই অবিশ্রাম তাগাদায় ও উৎসাহে ভাগলপুরের বাসাটা মুহুরীর তদারকে রাখিয়া মহেশ্বরীকেও পাল্‌কী করিয়া তুলিয়া লইয়া তারা কলিকাতা যাত্রা করিল।

ক্রমশঃ

শ্রীনীহারবালা দেবী।

প্রেমিকার স্মৃতি।

(স্কচ্ ব্যালাড্)

এ মম আঁখিজল　　নহে ত' তার তরে,
গিয়াছে চলি বলে'　　নহে ও আঁখিজল,
মিলন হবে পুন　　দু'দিন গেলে পরে
সময় আনি দিবে　　মিলন অচপল।

নহে এ আঁখিজল　　নীরব মৃতত্তরে
গিয়াছে চলি আগে　　যাতনা গেছে তার,—
তাহারে ভালবাসি　　রহিব তারে স্মরে—
বিরহ আসিবে না　　জীবন ভরি আর।

যাতনা তবু এক　　মরণ হ'তে আজি
বাজিছে বুকে মম,　　জ্বলিছে নিশিদিন—
কেন সে পলাইল　　সমর-ভূমি ত্যজি
আমার প্রেম দেব　　ছি ছি কি এতহীন ?

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

মাতৃশক্তিপীঠ। *

-:o:-

হে মা জগজ্জননি, মহাশক্তিরূপিণি, আজ তুমি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আত্মপ্রাকাশ করে আমাদের স্বরূপ দেখিয়ে দাও। হে মাতঃ, আমাদের তোমার পূজার যোগ্য অধিকারী কর।

"But the national movement for the education of girls must be one which meets the national needs, and India needs nobly trained wives and mothers, wise and tender rulers of the household, educated teachers of the young, helpful counsellors of their husbands, skilled nurses of the sick, rather than girl-graduates educated for the learned professions."

Annie Besant.

"কিন্তু জাতীয় স্ত্রীশিক্ষা-প্রচার-আন্দোলনের লক্ষ্য নিশ্চয়ই তাই, যা জাতীয়-দাবী মিটাতে পার্ব্বে। ভারতবর্ষে জাতি দাবী কচ্ছে,—উচ্চশিক্ষিতা জননী ও জায়ার, স্নেহময়ী গৃহকর্ত্রীর,

* মাতৃজাতির উন্নতিকল্পে শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ী হেমন্তকুমারী দেবী, 'মাতৃশক্তিপীঠ' নামে দেশময় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় কলিকাতা, শিলচর প্রভৃতি স্থানে মাতৃশক্তিপীঠের কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। তাঁহার সঙ্কল্প সর্ব্বসাধারণে সম্প্রসারিত হইবার মানসে তিনি বক্ষ্যমান প্রবন্ধ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কাহারও কিছু বক্তব্য থাকিলে, আমাদিগের নিকট জানাইলে আমরা যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেব। সম্পাদিকা।

নিপুণা শৈশব-শিক্ষাদাত্রীর, আর্ত্ত ও পীড়িতের সেবিকার, আর, স্বামীর সহায়রূপিনী উৎসাহ-মন্ত্রণাদাত্রী সহধর্ম্মিণীর। জাতি এখনো চায় না, উচ্চ উপাধিধারিণী হয়ে মেয়েরা বড় বড় জীবিকার উপার্জ্জন প্রার্থিনী হ'য়ে দাঁড়াক।"

আমাদের মনে হয় এনি বেসান্তের উল্লিখিত উক্তিতে স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ, বর্ত্তমানে এ দেশের ও জাতের মর্ম্মের দাবী ফুটে উঠেছে।

নারীর স্বরূপ কি ?—"আমাদের বাঙ্গালা দেশ শক্তির পীঠস্থান।" নারী সম্বন্ধে আমাদের সেই চির পুরাতন অথচ চির নূতন ধারণাই আছে,—নারী "পূর্ণ-ব্রহ্মসনাতনী" জগজ্জননীর অংশ রূপিনী একথা আমরা মনে প্রাণে জানি। একথা চিরপুরাতন হলেও সমগ্র দেশ ও জাত যে একথাটা প্রায় ভুলে গেছে, তা' নারীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখ্‌লেই বুঝা যায়। আর অত্যন্ত পরিতাপের কথা, নারী নিজেই নিজের গৌরবের কথা, মহিমামণ্ডিত দেবীত্বের কথা ভুলে গেছে। আমাদের মনে হয়, প্রত্যেক নারীকে এখন নারীত্বের দাবী দেবীত্বের গৌরব বোঝাবার সময় এসেছে।

নারীর বর্ত্তমান অবস্থা।—নারী পূজার এই পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্রে গভীর রহস্যময়ী মহামহিমময়ী, আদ্যাশক্তির অংশভূতা নারীর বর্ত্তমান যেরূপ অবমাননা হচ্ছে, তাতে মনে হয় আর্য্যেরা এক সময়ে নারীর দেবীত্ব উপলব্ধি করে,—সেই দেবীত্বের যে ভাবে যশোগান করে গেছেন সে সব বুঝি অলীক কল্পনা মাত্র। "যে দেশে জগচ্ছক্তির এত অপমান, যে দেশের অর্দ্ধেক চৈতন্য এত মূক ও অজ্ঞান-পঙ্গু, যে দেশের মায়ের বুকে জাতির মাতৃ প্রেরণা ও সৃজনীশক্তির সাড়া নাই, সে দেশের দৈন্য অবসাদ যে ঘুচ্‌তে চাহে না তাহা তো বিচিত্র নয়।"

নারীশক্তির প্রকৃত উদ্বোধনে সমগ্র দেশের ও সমাজের-প্রভূত কল্যাণ সংসাধিত হইবে। "আমাদের সমস্ত চেষ্টা ও সাধনা, আমাদের বিদ্যা, যশঃ, দেশের কাজে যত মহাপ্রাণতা সব বৈঠকখানার জিনিস, তাহা বাহিরে রেখে অন্তঃপুরে যেতে হয়; আমাদের অর্দ্ধাঙ্গে উৎকট জীবনের লক্ষণ আর অপরার্দ্ধে পক্ষাঘাত।" "যে মা জঠরে ধরিয়া কোলে করিয়া স্তন্যমধু পিয়াইয়া এ জড়দেহ গড়ে, সে জ্ঞানের অমৃত নিষেকে তখনকার কোমল মনটুকু তো গড়িয়া তুলিতে পারে না। যে জীবন-সহচরী আসিয়া অগ্নি দেবতা ব্রাহ্মণ সাক্ষী করিয়া হৃদয়ের সহিত হৃদয় মিলাইয়া একাঙ্গ হয়, সে তো আমাদের জীবনের যত বড় বড় জগদ্ব্যাপী ভগবৎমুখী

ধারাগুলির কোনটিরই সন্ধান রাখে না! আমরা দশের ও দেশের কাজে ছুটি, ঘরের মা বোন সে ত্যাগের মহিমা বোঝে না, পায়ের শিকলে তাহারা পা জড়াইয়া কাঁদিয়া আকুল হয়; আমরা ভগবানের নামের সঙ্কীর্ত্তনে দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া ফিরি, আমাদের আবার আধখানা অঙ্গ সংসারের দিকে মুখ ফিরাইয়া সে পরমধনকে অভিসম্পাত করে।" আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের মূলে এই যে ভীষণ অপূর্ণতা রয়েছে, এ দেশের মাতৃ-শক্তির উদ্বোধনে আমরা এ অপূর্ণতার হাত থেকে অব্যাহতি পাব। আমরা পূর্ণ-জীবনের আস্বাদ পেয়ে ধন্য হব—আমরা জগজ্জননীর সন্তান নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন কর্ত্তে সমর্থ হব।

নারীর জাগরণের চেষ্টা।—আজ এদেশে এমন মাহেন্দ্রক্ষণ এসেছে, এমন একটা প্রাণ-মাতান ভাবের ঢেউ দেশের ভেতর দিয়ে তরতরগতিতে বয়ে যাচ্চে নারীর প্রাণেও জীবনের বৃহৎস্পর্শ ও পূর্ণ-আস্বাদ পাবার এমন একটা আকুল আবেগ এসেছে, এমন একটা ব্যাকুল বেদনা জেগে উঠছে যে আমাদের মনে হচ্চে কোন বিরুদ্ধশক্তি আর একদণ্ডও নারীকে তার চিরবাঞ্ছিত মুক্তির পথে বাধা দিতে পার্ব্বে না। এবার নারীর সর্ব্ববাধন খসে পড়্বে তার পায়ের শৃঙ্খল খুলে যাবে, নারী আবার যথার্থ জ্ঞানদায়িনী, শক্তিদায়িনী সর্ব্বার্থ-সাধিকা মা হয়ে এই হতভাগ্য 'আত্মবিস্মৃত' দেশের মুক্তির সাধনা সার্থক করে তুল্‌বে।

এ সুযোগে আসুন, আমরা সকলে শুদ্ধচিত্তে জগজ্জননীর আশীর্ব্বাদ মস্তকে গ্রহণ করে, মাতৃশক্তিতে শক্তিমান হয়ে, একটি আদর্শ "মাতৃশক্তিপীঠ" গড়ে তুলি যেখানে এসে আমাদের দেশের মায়েরা তাঁদের নিজ নিজ মনগুলি গড়ে তোলবার সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ কর্ব্বেন।

"মাতৃশক্তিপীঠ"'র নারী সঙ্ঘে আবাহন।—"কোন আদর্শ পূর্ণ ও ব্যাপক না হলে তাতে দুচারজনের কল্যাণ হতে পারে, কিন্তু সেই আদর্শের প্রভাবে একটা দেশের বা সমাজের মঙ্গল সংসাধিত হয় না।" তাই আমরা স্ত্রী ও পুরুষ, প্রত্যেক সৎকর্ম্মী ও দেশের কল্যাণ-কামীকে এই মহদুদ্দেশ্য কর্ম্মে পরিণত কর্ব্বার জন্য আহ্বান কর্‌ছি। এরূপ কাজ এক জনের চেষ্টায় সুসম্পন্ন হওয়া একেবারে অসম্ভব। এ কাজ যদি প্রত্যেকে নিজের কাজ মনে করেন, স্বয়ং "মাতৃশক্তিপীঠ" প্রতিষ্ঠিত হবার পর উহা স্ব স্ব প্রাণের জিনিস বোধে

উহার স্থায়িত্বের জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেন তা হলে আমাদের বিশ্বাস আমরা সফলকাম হব।

আমরা স্ত্রীশিক্ষার প্রচার কল্পে যে ব্রত গ্রহণ কচ্চি এবং নারীশক্তি জাগ্রত কর্ব্বার জন্য যে চেষ্টা ও সাধনা আবশ্যক মনে করি তা' নিম্নে প্রকাশিত হল।

"মাতৃশক্তিপীঠের"—শিক্ষার ব্যবস্থা ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

"মাতৃশক্তিপীঠের"—স্ত্রীশিক্ষার ভাগবত দিক্।—নারীকে স্বচেষ্টায় যদি জীবিকা অর্জ্জন না কর্ত্তে হয়, তা হলে স্ত্রীশিক্ষাকে কেবলমাত্র ধর্ম্ম শিক্ষায় পরিণত করা যেতে পারে। জননী, জায়া, গৃহকর্ত্রী, শিক্ষাদাত্রী, সেবাকুশলা, এই সকল হওয়াই মেয়েদের কর্ত্তব্য। যদি তাহারা স্বভাবতঃ ওতে নিপুণা না হয়ে উঠ্‌তে পারে, সকলে মিলে তাহাদের সাহায্য কর্ত্তে হবে, যাহাতে তাহারা তদ্রূপ হয়ে ওঠে,—এই সাহায্য করাটাই শিক্ষা। "আমরা এইটুকু বুঝি যে, মেয়েদের যাহা হয়ে ওঠা দরকার সেইটে করে তোলার নামই স্ত্রীশিক্ষা। তাহাদের যেটা প্রাপ্য, তাহারই প্রাপ্তি সুগম ও সুশৃঙ্খল করে দেওয়া, তাহাদের যেটা দাতব্য সেটা দেবার পথ উন্মুক্ত করে দেওয়াই নারীজন্মের সার্থকতার পথ প্রস্তুত করে দেওয়া। মেয়েদের আত্মসম্মান, উন্নতি, স্বাধীনতা লক্ষ্য করে, তাদের আত্মিক জীবনের পূর্ণ বিকাশের উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত শিক্ষাই প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ। এ শিক্ষা সম্পূর্ণ ভাবে মেয়েলী হওয়া চাই।"

জাতির মর্ম্মস্থলের যে দাবীর কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে সেটাকে কার্য্যে পরিণত কর্ব্বার জন্যে আমাদের সমস্ত চেষ্টা ও সাধনা এই দেশের যেটা মূল ভাব তার উপর প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে হবে। আমাদের দেশের শিক্ষায়, দীক্ষায়, সমাজে, আচার ব্যবহারে যেটা ফুটে উঠ্‌বার চেষ্টা কচ্চে,—সে স্বভাব হচ্চে এই ;—বিশ্বের মূলে যে পরম সত্য আছে সেই সত্যের অনুসন্ধান করা ও সেই ছাঁচে স্ব স্ব জীবন গড়ে তোলা। আমাদের জাতীয় জীবনের ইহাই মূল কথা—ইহাই জাতীয় জীবনের ভিত্তি। তাই শিক্ষাপ্রণালীর সমস্ত বিধিব্যবস্থা যাতে এই মূল মর্ম্মভাব থেকে বিচ্ছিন্ন না হয় সে বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে। নারী-জীবনের স্বতন্ত্র নিজত্বের যে একটা বিকাশ আছে তা গভীর রহস্যময়ী নারীর স্বীয় মানসিক ও আত্মিক্ বিকাশের উপর নির্ভর কর্ব্বে। "মাতৃশক্তিপীঠের" প্রত্যেক শিক্ষার্থিনী যাহাতে আপনার মনকে আপনার জেনে সুসংযত কর্ত্তে পারে সে বিষয়ে তাহাকে প্রত্যেক সাহায্য প্রদানের চেষ্টা

করা হবে। সর্ব্বপ্রভাবমুক্ত হয়ে মানসিক স্বাধীনতা লাভ কর্ত্তে পারলেই স্ত্রী স্বাধীনতা কথার কথা না হয়ে নারী জীবনে সেটা মূর্ত্তি পরিগ্রহ কর্ব্বে। এই ভাবে মনের স্বাধীনতা পেলে 'মাতৃশক্তিপীঠের' শিক্ষিতা মেয়েরা মেকি বাহিরের স্বাধীনতার সমস্ত কুপ্রভাব থেকে নিষ্কৃতি পাবে এই ভাবে শিক্ষার ভগবৎমুখী ধারাকে সুপরিচালিত কর্ত্তে পারলে নারীর অন্তরে ঠাকুর জেগে উঠ্‌বেন। দেশে আবার ঘরে ঘরে আদর্শ জননী, জায়া, গৃহকর্ত্রী ও শিক্ষাদাত্রী বিরাজ কর্ব্বে।

শিক্ষার ব্যবহারিক দিক্‌। "ভাবের উপরই ব্যবহারের মূল প্রতিষ্ঠা।"—এখানে মেয়েরা বাগানে কুটীর শিল্প প্রভৃতি সহজসাধ্য কতকগুলি কাজ শিখ্‌তে পারে সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখা হবে। যাহাতে অনাথা বিধবারা পরের গলগ্রহ না হয়ে স্বাধীন ভাবে অথচ গৃহ মধ্যে বসে এমন কোন কাজ কর্ত্তে পারেন যাতে তাঁহাদের স্ব স্ব জীবিকা অর্জ্জনের সুবিধা হয়, সে বিষয়ে যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা করা হবে। মোটকথা শিক্ষার মৌলিক ধর্ম্মভাবের উপর ব্যবহারের প্রতিষ্ঠা করা হবে।

"শিক্ষার সার্থকতা 'হওয়ায়' গড়ায় না—কারণ সেটা গড়বার জিনিস নয়, হয়ে উঠ্‌বার জিনিস।"—মেয়েদের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধ মতভেদ থাক্‌লেও এটা ঠিক কথা যে তাহাদের কি কি শেখাতে হবে কি ভাবে তাদের কাজ করাতে হবে এ সম্বন্ধে প্রবীণ হতে মূর্খ সকলেরই অন্ধকারে হাতড়ান।

আপাততঃ সেটা মোটামুটি শিক্ষা-পদ্ধতি অবলম্বন করে আজ আরম্ভ করা প্রয়োজন বোধে আমরা সেটী নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতির আলোচনা কচ্ছি।

(ক) (Religions and Moral Education) ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা।—(ক) 'মাতৃ-শক্তিপীঠ' নিবাসিনী কুমারী ও বিধবাদিগকে আচার, নিয়ম, সংযম, আসন, পূজা ও জপ প্রভৃতি যোগাদি ধর্ম্মাঙ্গীন অনুষ্ঠানের অভ্যাস করান হবে। অধিকারিণী হিসাবে প্রত্যেকের মানসিক অবস্থার একটা লিপিবদ্ধ ইতিহাস রাখবার চেষ্টা করা হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতি মূলক উদার ভাবগুলি সরল বাঙ্গালা ভাষায় কথা প্রসঙ্গে বুঝাইয়া দেওয়া হবে। ধর্ম্ম যে বাস্তবিক কতগুলি আচার ও নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়—উহা যে প্রাণের প্রদেশের অনুভূতির জিনিস উহা যে সহজ এই ভাব্‌টা তাদের মনে প্রাণে বুঝিয়ে

দিতে হবে। ধর্ম্ম যে আকাশকুসুম নহে, মানব জীবনের প্রত্যেক কর্ম্ম ও চেষ্টার মধ্য দিয়াই উহার যে একটা অবিরত প্রবাহ বয়ে যাচ্চে তা' বুঝিয়ে দেওয়াই ধর্ম্ম শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। প্রত্যেক জীবের ভেতর দিয়ে জগৎস্রষ্টার বিভিন্ন প্রকাশ হচ্চে বিশ্বের চিরন্তন সত্য নানা ভাবে প্রকাশিত হচ্চে এই কথাটা যতদূর সম্ভব তাদের বোঝাবার চেষ্টা করা হবে। ধর্ম্মশিক্ষার ভার প্রাপ্তা আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতা শিক্ষয়িত্রীরা এ বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য রাখ্‌বেন। শিক্ষার্থিনীরা যাতে দেশাত্মবোধের সঙ্গে সঙ্গে এ জাতের ও দেশের অন্তরের ঠাকুরকে ভালবাসতে শেখে সে দিকে লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে। আমাদের মনে হয় দেশের জন্যে দেশকে ভালবাসার যে কুফলগুলো আছে—"কাচা-আমিত্বের" যে অব্যাহতি পেতে গেলে দেশাত্মবোধের উপরেও দেশের ধর্ম্ম ও জাতের ভাগ্য বিধাতার পূজার আসনখানিকে বজায় রাখ্‌তে হবে সমগ্র মানবজাতির মহা মিলনের শুভদিন সমাগত হবে। শিক্ষার এই সব মূল ভাবগুল আমাদের প্রত্যেক চেষ্টাকে যেন অনুপ্রাণিত করে।

(খ) তাছাড়া, সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিনী শিক্ষয়িত্রীরা মেয়েদের মহাভারত, রামায়ণ, ভগবদ্গীতা ও আচার্য্য শঙ্করের স্তোত্রাদি পাঠ করাইবেন। (গ) যদি উচ্চশিক্ষিতা কোন শিক্ষয়িত্রী পাওয়া যায় তা হলে তিনি জগতের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্ম্ম মতের সার কথাগুলি সরলভাবে বুঝিয়ে দেবেন। বিভিন্ন দেশের অনন্ত কোটী নরনারী ধর্ম্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে কিরূপ চিন্তা করে তা শিক্ষার্থিনীদের জানা দরকার। কিন্তু যাতে শিক্ষার্থিনীরা অন্তরে অন্তরে সত্যলাভের জন্য ব্যগ্র হয় ও অন্তর সাধনায় অগ্রসর হয় যাহাতে তাহাদের সমস্ত জীবনটা ধর্ম্মময় হয়ে ওঠে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে। মেয়েদের অন্তরের দেবতা যদি জাগ্রত না হন, তা হলে যে তারা সমস্ত কর্ম্মের মধ্যে একটা ব্যর্থতা ও অপূর্ণতা অনুভব কর্ব্বে এ কথাটা তাদের উঠ্‌তে বস্‌তে শোনাতে হবে। এই ভাবে যদি প্রকৃতধর্ম্মের ভাবটা তাদের রক্ত মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে যায় তা হলে তারা আমাদের "জাতির জীবনে স্নিগ্ধ দেবীত্ব-মণ্ডিতা মাতৃরূপে দশদিক্ আলোকিত কর্ব্বে।"

<u>সাহিত্যিক্ শিক্ষা</u>।—(Literary Education.)—শিক্ষার্থিনীদের প্রাথমিক বাঙ্গালা-শিক্ষা দেওয়া হবে। যাতে তারা মাসিকপত্র, দৈনিক খবরের কাগজ প্রভৃতি পড়্‌তে ও বুঝ্‌তে পারে অন্ততঃ ততটুকু শিক্ষা তাদের দিতে হবে।

শিক্ষার্থিনীদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা কর্ব্বার শক্তি অনুসারে তাহারা সংস্কৃত ও ইংরাজী শিক্ষা কর্ব্বার সুযোগ পাবে। জগতের অন্যান্য উন্নতিশীল জাতের ইতিহাস শিক্ষয়িত্রীরা মুখে মুখে গল্পচ্ছলে শিক্ষা দেবে। মোটমুটি ভৌগলিক জ্ঞানও দরকার।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষা।—(Scientific Education) (১) শরীর রক্ষার সাধারণ নিয়মাবলী ও শরীরের কলকব্জা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা। (২) খাদ্যাখাদ্য নির্ণয় ও বিভিন্ন খাদ্যের উপকারিতা ও অপকারিতা বিচার। (৩) কুটীর শিল্প, (৪) রন্ধন, (৫) গৃহকার্য্য, (৬) ধাত্রী বিদ্যা, (৭) সন্তান পালন, (৮) রোগীর পরিচর্য্যা, (৯) হঠাৎ হাত পা ভাঙ্গিয়া গেলে, সাপে কামড়াইলে, সামান্য অসুখ হইলে যাহাতে শিক্ষার্থিনীরা ডাক্তার আসবার পূর্ব্বে কতকটা সাহায্য করিতে সমর্থা হন—তদুপযোগী শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে। (আমাদের দেশের সেকেলে বৃদ্ধরা কত প্রকার ঔষধ জানিতেন ও কার্য্যকালে সেই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ পূর্ব্বক অনেককে ভাল কর্ত্তে পা্তেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, নানাপ্রকার গাছপালা থেকে তাঁরা যে সমস্ত ঔষধ তৈরী কর্ত্তেন আজকালকার মেয়েরা সে সবের কোন ধার ধারে না) (১০) গৃহাদি পরিস্কারপরিচ্ছন্ন রাখা, উন্মুক্ত বায়ু ও আলোর উপকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞান। আমাদের দেশের মেয়েদের কেমন একটা ধারণা যে ঘরের জানালা খোলা রাখ্‌লেই ব্যাধি হয়। তাদের সেই ভ্রমাত্মক ধারণা দূর কর্ত্তে হবে সব (free air treatment) উন্মুক্ত বায়ু সেবনে যে কত দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি ভাল হয় তা জানাতে হবে।

(Artistic Education) কলাবিদ্যা শিক্ষা—মেয়েদের চিত্র শিল্প ও ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে স্তোত্রাদি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত ও বাদ্য যন্ত্রের অভ্যাস করবার ব্যবস্থা থাক্‌বে।

(Physical Education) ব্যায়াম শিক্ষা—"মেয়েদের উপর জগতের যাবা্বী তার প্রত্যেকটীর জন্য নির্ম্মল স্বাস্থ্যপূত অটুট দেহ চাই।"

অতএব যাহাতে মেয়েরা অটুট ও সবল দেহের অধিকারিণী হয় সে জন্য স্ত্রী উপযোগী ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা হবে।

আমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য।—আমরা উল্লিখিত ধর্ম্ম ও শিক্ষার আদর্শে সর্ব্বপ্রথম পঞ্চাশ জন সর্ব্ববন্ধন বিমুক্তা, নিজের শিক্ষা ও ভবিষ্যতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণা, অল্প বিস্তর শিক্ষিতা, ধর্ম্মপ্রাণা, ও কার্য্যকরিশক্তি সম্পন্না কুমারী ও বিধবাকে গড়ে

তুল্‌তে চাই। সমগ্র স্ত্রীজাতির মুক্তি বিধানের জন্য একদল আদর্শ মুক্তি-সেনা গড়তে চাই। ইহাই আমাদের সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান কাজ। উল্লিখিত গুণসম্পন্না জন কয়েক মেয়ে নিয়ে আমরা একটী আদর্শ "মাতৃ-শক্তিপীঠ" স্থাপন কর্ত্তে চাই। ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য।

আমাদের আশা।—মহাশক্তি-রূপিণী জগজ্জননীর কৃপায় যদি আমরা উল্লিখিত আদর্শে কয়েকজন মেয়েকে সুশিক্ষিতা কর্ত্তে সমর্থ হই তা'হলে ইহারাই হবে "এ আদর্শ স্থাবানার কর্ম্মীদল বাঙ্গলা জোড়া সহস্র বিদ্যালয়ের চালক ও প্রাণ। এই সব মেয়েরা জেলায় জেলায় গিয়ে শ্যামল মাঠের কোণে গৃহস্থের অঙ্গনে অঙ্গনে বিদ্যালয়ের সৃষ্টি কর্ব্বে।" সমগ্র স্ত্রীজাতির জাগরণের ও মুক্তির ভার এই সব "জাগা মেয়েরা" গ্রহণ কর্ব্বে। আমরা কায়মনোবাক্যে সেই শুভদিনের জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি—তিনি অচিরে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

আমাদের স্কুলের আদর্শ।—যে দেশে প্রায় সমস্ত নারীই অজ্ঞানান্ধকারে অবস্থিতি হেতু জীবনের পথ খুঁজে পাচ্চে না তাদের অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষিতা কর্ত্তে হলে ভারতের পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথানুসারে পাঠাগার নির্ম্মাণের ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে। অর্থাৎ এই গরীব দেশে পাশ্চাত্য রীতির অনুসরণ করে বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করা নিষ্প্রয়োজন। যেখানে গুরু শিষ্য অবাধে মিশে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে প্রাণের নিবিড় নাড়ীর সংযোগ কোথায় বুঝতে পার্ব্বে,—যেখানে তারা জগজ্জননীর প্রেরণায় জ্ঞানলাভের পবিত্র আকাঙ্ক্ষায় একত্র সম্মিলিত হবে সেখানে বিদ্যা মন্দির আপনি গড়ে উঠবে— আর বিদ্যাদান ব্যাপারটা সেখানে সহজ ও সরল হবে জটীলতার লেশমাত্র সেখানে থাকবে না। আমাদের "মাতৃশক্তিপীঠের" "জাগা মেয়েরা" বাঙ্গলায় প্রতি ঘরে ঘরে এইরূপ প্রাকৃতিক বিদ্যালয় গড়ে তুলবে।

আমাদের শিক্ষাদানের প্রণালী।—কতকগুলো নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকের চাপে নূতন শিক্ষার্থিনীদের মনের স্বাভাবিক বিকাশটাকে মেরে ফেল্‌বার কোন চেষ্টা করা হবে না। যে সব শিক্ষয়িত্রী বহু বর্ষ পরিশ্রম করে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তাঁরা তাঁদের সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিষয়গুলি ক্রমে ক্রমে গল্পে, কথায়, সাহচর্য্যের আনন্দে ও অল্প স্বল্প

বাঙ্গলা বইএর মধ্য দিয়ে দু'চার বছরে শিখিয়ে দেবেন। শিক্ষয়িত্রীদিগের আদর্শ ও পূত চরিত্রের প্রভাবে শিক্ষার্থিনীরা স্ব স্ব চরিত্র ও জীবন গড়ে নেবে।

আমাদের শেষ কথা।—পুরুষেরও সাধারণভাবে সমাজের প্রয়োজন হতে, "নারীর স্বতন্ত্র নিজস্ব যে একটা বিকাশ আছে—অভিমানাক্তভায়" আমরা তা অস্বীকার কর্ব্বোনা। আমরা সেই স্বতন্ত্র বিকাশটাকে লক্ষ্য কর্ব্ব, এবং সেই বিশিষ্ট বিকাশের সংরক্ষণ ও পরিবর্দ্ধনের ভার উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর হস্তে অর্পণ কর্ব্ব। তারপর যতদূর সম্ভব "সেই জিনিষটার বিশ্বজীবনে সংযুক্ত হবার যোগসূত্র ধরিয়ে' দেবার ভার ও ধর্ম্ম শিক্ষার ভার আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞানময়ী মা গ্রহণ কর্ব্বেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রিয়হারা।

চেয়ে আছি সর্ব্ব দিনমান
—নীলাকাশ মেঘ-বাসে ঢাকা
রবি কোথা হল অস্তমান
চেয়ে আছি সর্ব্ব দিনমান!
কেঁপে ওঠে ব্যথিত পরাণ
বক্ষ-নীড়ে ঝাপটিয়া পাখা
সন্ধ্যালোক কোথা অস্তমান
নীলাকাশ মেঘ-বাসে ঢাকা!

হিমবায়ু করে হাহাকার
বুকে এসে লাগিছে কাঁপন
ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিছে দুয়ার
ক্ষ্যাপা হাওয়া করে হাহাকার
আঁখি দুটি মনে এঁকে কার
সারা নিশি করিব যাপন
খুলে ওঠে হৃদয় দুয়ার
বুকে এসে লাগিছে কাঁপন !

এ বুকের এই নীড়খানি
পাশা-পাশি ছিল দুই পাখী
প্রাণ আর প্রেম ছিল জানি
এ হিয়ার এই নীড়খানি !
শিখেছিল কত প্রিয় বাণী
নেচেছিল সুখে দুখে থাকি
প্রাণ আর প্রেমটুকু জানি
বুকে বুকে ছিল দুই পাখী !

আজও প্রাণ কাঁদে একা একা
সাথী তার গেল কোন্‌খানে
দেখা নাই দেখা নাই দেখা
আজো প্রাণ কাঁদে একা একা

কোথা উড়ে গেল প্রাণসখা
কোথা নীড় বেঁধেছে কে জানে
পাঁজরে পাঁজরে নাই দেখা
বঁধু তার গেল কোন্‌খানে !

বাহিরে কাঁদিছে হিম হাওয়া
ভিতরে কাঁদিছে দীর্ঘশ্বাস
আর কি গো ফিরে যাবে পাওয়া
শ্বসিয়া ফিরিছে হিম হাওয়া
শূন্য আজি এ বুকের দাওয়া
ছিন্ন আজি প্রেম-ফুল-পাশ
তারে ফিরে যাবে কিরে পাওয়া
কাঁদিছে উতলা দীর্ঘশ্বাস !

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আশা ভঙ্গ হইলে মর্ম্মের কথা বাহির হইয়া পড়া স্বাভাবিক,—তাহাতে সত্য থাকিতে পারে অনেকখানি কিন্তু যুক্তির বাঁধন, ঔচিত্যের দাবী তাহাতে কম, কারণ বক্তা যতই সংযত হউন না কেন, সে সময় তাঁহার হৃদয়টা থাকে একটা আঘাতের সজ্ঘাতে চঞ্চল—সমস্ত দিক ভাবিয়া দেখিবার, ভবিষ্যতে সে উক্তির ফল কি তাহা বিচার বিবেচনা করিবার মত মনের অবস্থা তাঁহাতে তখন আশা করা যায় না। সম্প্রতি, আমাদের বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও

"স্বদেশী"র একনিষ্ঠ প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র হাওড়ার জেলা কংগ্রেস কমিটির পদত্যাগ প্রসঙ্গে যে আত্মকথা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার হৃদয়তন্ত্রীর যে ঐকান্তিক সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে তাহা কেবল হাওড়ার নহে, সমগ্র বঙ্গের কলঙ্কের কথা! তিনি বলিয়াছেন যে, 'ভিক্ষাবৃত্তি কর না' বলে আমরা গলা ফাটিয়ে বেড়াচ্ছি কিন্তু শতকরা ৯৯ জন এই ভিক্ষাবৃত্তি সার করেছে।" কথাটার যে পনর আনাই সত্য তাহা আর এই দাসাবৃত্তি-প্রধান দেশে টীকা টিপ্পনী, ভাষ্য করিয়া বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই। বাঙ্গালী জীবনে আত্মের অস্তিত্বের অনুভূতি কিরূপ আশ্চর্য্য ভাবে মুছিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, তাহা পুনঃ উদ্বুদ্ধ করিতে আবার কতখানি শক্তির প্রয়োজন তাহা নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিতে গেলে হৃদয় আপনি নিরাশায় ডুবিয়া যায়, দেশবাসীর মৌখিক আন্দোলন আস্ফালন শ্মশানবাসী অপদেবতার তাণ্ডব নৃত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় কিন্তু তাই বলিয়াই ত হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। শরৎ বাবুর ন্যায় পাকা মাঝি যদি ঝঞ্ঝা শঙ্কিত হৃদয়ে তীরে তরী বাঁধিয়া বসিয়া থাকেন তাহা হইলে সুফলের আশা আর কোথায়! যে দেশ আপনার অস্তিত্ব রেখা বহু বিপর্য্যয় ঘটনায় পড়িয়া বিসর্জ্জন দিয়া বসিয়াছে সে দেশে যে কারণেই হউক, যত টুকুই হউক আবার যে আত্মের সন্ধানের জন্য ঔৎসুক্য জাগ্রত হইয়াছে,—পনর আনা নিরাশার মধ্যে এক আনাও যে আশার কথা—পদ্মপত্রস্থ বারিবিন্দুর ন্যায় টল টল করিলেও, ইহাই কি স্বদেশের একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীগণের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে? অভ্যাস মানুষের স্বভাবের নিতান্ত অন্তরঙ্গ। এতদিনের অভ্যাস, সুখ-মোহ কল্পনা, উপরওয়ালার নেকনজরের আশার মোহ কি এত সত্বর দুই দিনেই মানুষ ভুলিতে পারে? নেতাগণ সুমহান আদর্শ, শরৎবাবুর উপন্যাসের সেই প্রাণমনহারী মনোমদ মোহনসুরে স্বদেশবাসীকে শুনাইতে থাকুন; আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য চাঞ্চল্য যখন দেশে দেখা দিয়াছে তখন সেসুরে একদিন দেশবাসীকে কুরঙ্গের ন্যায় পাগল হইতে হইবেই; —রেশটা প্রাণে পৌঁছিতে যা দেরী।

বাঙ্গালী পশ্চাতে পড়িয়া আছে সত্য কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীর জীবনে যে আত্মত্যাগ, চরিত্রের দৃঢ়তা আত্মনির্ভরতা কল্পনার বিষয় ছিল, আজ তাহার উদাহরণ বঙ্গে বিরল নহে। সংবাদ পত্রের পাঠকপাঠিকা প্রায় প্রতিদিনই এখন এমন সংবাদ প্রাপ্ত হন যাহাতে তাঁহাকে বলিতে হয় 'হুঁ', বাঙ্গালী আত্মসম্মানের মর্য্যাদা বুঝিতেছে।' বিশেষতঃ ব্যবহারজীবি

ও ছাত্রগণ এবিষয়ে অগ্রণী। মনস্বিনী মহিলাগণ যেরূপ ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন স্বদেশী ব্রত উদযাপনে ইঁহারা যেরূপ শ্রম ও আন্তরিক অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা বিশেষ আশাপ্রদ।

যদিও সাধারণে এখনও সুপথের সন্ধান পায় নাই, দারিদ্র্যের তাড়নে তাহারা পরিত্রাণের জন্য আকলিব্যাকুলি করিয়া যে ক্রন্দনের সুর, হতাশার চীৎকার উত্থিত করিয়াছে তাহা তাহাদিগকে মঙ্গলময়ী মার পদপ্রান্তে লইয়া যাইতে যদিও পারে নাই, কিন্তু মন্দিরে প্রকৃত পূজারী, পুরোহিতের আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহার আহ্বান, পৌরজনের জন্য আন্তরিক প্রার্থনা কিছুতেই বিফল হইবে না ইহাই আমাদের আশা।

* * *

স্বর্গীয় কান্ত কবি কোন এক সভায় গাহিয়াছিলেন ;—

"আজি যেই ভাবে মিলিয়াছি সবে
বিধি যেন হেন ভাবে চিরদিন মিলায় রে।"

সে বহু দিনের কথা আজ কবি বর্ত্তমান থাকিলে দেখিতে পাইতেন তাঁহার আশা প্রায় ফলবতী। যিনি যাহাই বলুন এতদিন একত্র অবস্থানের ফলে বঙ্গের হিন্দু মুসলমান যে মিলনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছেন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। শিক্ষিতের আচার ব্যবহার আলোচনা সমালোচনায় দেশের প্রাণের প্রকৃতি বর্ত্তমান অবস্থায় নির্ণয় করা চলে না। পল্লীবাসী জানেন হিন্দুমুসলমান মিলিয়া মিশিয়া কিরূপ ভাই ভাইটির মত এক হইয়া বাস করে অন্ততঃ বাঙ্গলাতে আমরা এই রূপই দেখিতে পাই। হিন্দুর দুর্গাৎসব পল্লীবাসী মুসলমান ভ্রাতাদের প্রাণে কম উৎসাহ আনন্দ ঢালিয়া দেয় না। মুসলমানের দরগা হিন্দুর প্রাণে মুসলমান হইতে কম ভক্তিশ্রদ্ধার উদ্রেক করে না। বাহিক 'ছোয়া ছাঁটা' লইয়া বিচার করিলে হইবে না ; দেশাত্মবোধ কতটুকু তাহাদের প্রাণে স্পর্শ করিয়াছে, আত্মীয়তা উভয়ের মধ্যে কতখানি অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে তাহাই দেখিবার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠিয়াছে বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙ্গলা কি না ? আশ্চর্য্যের বিষয় এ প্রশ্নও আবার উত্থিত হয়, যুগযুগান্তর ধরিয়া বঙ্গমাতার বক্ষপীযুষ পরিপুষ্ট বাঙ্গালী মুসলমান যে বঙ্গমাতার নিতান্তই আপনার সন্তান ! পূর্ব্ব পুরুষ তাহার যে দেশেরই হউক না কেন এখন যে বঙ্গীয় মুসলমান বঙ্গের ভাবে সম্পূর্ণ বাঙ্গালী, হিন্দু অধিবাসী আদিতে

অন্য দেশবাসী হইলেও এখন যেমন বাঙ্গালী ব্যতীত আর কিছুই নহে মুসলমান ভ্রাতৃগণের অবস্থাও তদ্রূপ, বঙ্গের মুসলমানের ভাষা বঙ্গভাষা ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারে না তাহা তাহার নাড়ীর টানেই প্রমাণিত।

*   *   *

বাঙ্গালীর, বিশেষতঃ হিন্দুদিগের একটা মার্কামারা কলঙ্ক যে তাঁহারা অন্য জাতির, অন্য ধর্ম্মীকে কোল দিতে পরাঙ্মুখ! হিন্দুর আচার নীতি, বাহ্যিক ক্রিয়া প্রকরণ ইহার সপক্ষে সাক্ষ্য দিবে সত্য কিন্তু হিন্দুর মূল ধর্ম্মনীতিতে চিরদিনই মহা মিলনের পথ উন্মুক্ত,—স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের বিচার তাহার বাহ্যিক জীবনে—কিন্তু আত্মিকভাবে হিন্দুধর্ম্ম বিশ্ব প্রেমের মহিমা সর্ব্বক্ষেত্রে প্রচার করিয়াছে,—সর্ব্ব ঘটে ভগবানের অস্তিত্ব—সাধকের দেবতার আবির্ভাব ঘটে ঘটে—হিন্দুর ধর্ম্মের মূলে এই বিরাট অনুভূতি,—আরাধ্যের অস্তিত্বে তাহার চক্ষে সমস্তই পবিত্র, বিশ্বের সমস্তই তাহার হৃদয়ের প্রেমের আস্পদ! বাহিরের আচারে, আপনার প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তির মুখে টানিয়া রাখিতে তাহাকে বাহ্যিক আচারে অনেক স্থলে অনেক তুচ্ছ অতুচ্ছ বিষয় মানিয়া চলিতে হয়; তাহার উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি না দিয়াই শিক্ষিত বাঙ্গালী নিজের ঘরের ছেলে মেয়েই বলেন 'হিন্দু বড় সংকীর্ণ—নিজেদের মধ্যেই ছত্রিশ জাতি!' সে-জাতিত্ব বিচারের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা হইতে উদারতারই আভাষ কত বেশী বিদেশীভাবে অনুপ্রাণিত বাঙ্গালী তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না—অন্য জাতির ত অন্য ধারণা হওয়া বিচিত্র নহে। সহরবাসী তাঁহারা জানে না যে নৈষ্ঠিক বিধবা অন্য জাতির ছায়া স্পর্শ করিলেও স্নানে শুচি শুদ্ধ হইতে চায় (স্নানে শুচি ভাবিলে হাসি পাইবে অনেকের) সেই সংস্কারান্ধ বিধবাই আবশ্যক হইলে তাহার চক্ষে যে চণ্ডাল অস্পৃশ্য, তাহার মলমূত্র পরিষ্কার করিতে একটুকুও দ্বিধা বোধ করে না,—রোগীর, আর্ত্তের, অভাবগ্রস্তের দুঃখমোচনে হইবার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যেরূপভাবে নিঃশেষে নিজেকে নিয়োজিত করেন, তাহা অন্যের চক্ষে সমস্যার কথা হইলেও বাস্তব জীবনে বিরল নহে। নিষ্ঠাবান মুসলমানও বাহ্যিক আচারে, খাদ্যাখাদ্যে বিধর্ম্মীর স্পর্শ দোষ যথেষ্ট বিচারে আনেন কিন্তু বিপদে আপদে তিনি সকলকে সাহায্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত!

অন্যের মুখে না শুনিলে বিশেষতঃ ইংরেজ প্রভৃতি বিদেশী যদি ইহা না বলেন বাঙ্গালীর নিজের চক্ষে ইহা পড়ে না—আত্ম অবস্থা, আপনার গৃহ, দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে এমনি উদাসীন

আমরা। দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্র বিপ্লবে—দুর্দ্দিনে নিরুপায় হইয়া দাম্ভীক বিদেশী যখন কোন কারণে দেশীয়ের দ্বারে আশ্রয় ভিক্ষারী হয়; ভারতবাসীর স্বাভাবিক ঔদার্য্য প্রভাবে যখন তাহা লাভ করিয়া তাহারা মুহূর্ত্তের জন্য নিজেকে কৃতজ্ঞ মনে করে, হয়ত সেটা প্রচারও করে, তখন গিয়া আমাদের প্রতি আমাদের চোখ পড়ে—আমরা তখন বলি ভারতবাসীর অমুক অমুক গুণে বিশ্বজীত। ভারতবাসী অন্যকে নিজ করিতে জানে!

* * *

সম্প্রতি কলকাতা নগরীতে মার্টিনেট নামক মার্কিণবাসী জনৈক ভূপর্য্যটক, বাঙ্গালীর আতিথ্য স্বীকার করিয়া বাঙ্গালীকে ধন্য করিয়াছেন। তিনি পদব্রজে আমেরিকা হইতে পৃথিবী পর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছেন, বহু দেশের বহু প্রকার মানব সংজ্ঞের, জাতির মধ্য দিয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইতেছে। তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে বহু জাতির আচার সংস্কারাদির সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। জাতি সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার মূল্য উপেক্ষনীয় নহে; ইনি ভারতবাসীকে সর্ব্বজাতি অপেক্ষা অতিথিপরায়ণ বলিয়া যে সার্টিফিকেট দিয়াছেন তাহা লইয়া দেশের গৌরব মহিমার একটা বেশ সাড়া পড়িয়াছে। পরের মুখে আমাদের একটি গুন আবিষ্কৃত হওয়ায় আমরা আত্মপ্রসঙ্গ লাভ করি নাই কম। আতিথ্য যে ভারতবাসীর ধর্ম্মের একটা বিশেষ অঙ্গ তাহাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত, প্রীতির বস্তু তাহা একজন বিদেশীর মুখে শুনলে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হওয়ায় আমাদের আনন্দ লাভ করা স্বাভাবিক, বিশেষতঃ যে স্থলে বিদেশীগন ভারতের ঔদার্য্যে তুষ্ট হইয়াও তাহাদের কলঙ্কগাথা গাহিয়াই তুষ্ট সেখানে তাহাদের মধ্যে একজনের মনুষ্যোচিত ঔদার্য্য লক্ষ্য করিয়া সত্যই আনন্দ হয়। সর্ব্বদেশেই খাঁটি মানুষ আছে, মার্টিনের উক্তিতে তাহা পরিস্ফুট।

মানুষকে বুঝা যায় তাহার ক্রিয়াতে। সর্ব্বজাতির সম্বন্ধে একটা প্রত্যক্ষ সত্য অনুভবের জন্য, অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টায় যিনি এই বিপুল পৃথিবী পদব্রজে ভ্রমণ করিবার দুর্ব্বিসহ কষ্ট, অসুবিধা স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছেন তিনি যে মহাপ্রাণ তাহা সহজেই অনুমেয়। অজ্ঞয়কে জ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে আনয়ন করিবার প্রবৃত্তি মানব হৃদয়ে স্বাভাবিক। যিনি স্বাভাবিক ধর্ম্মকে মুক্তি দিতে চেষ্টা করেন, তিনি মনুষ্য নামের যোগ্য। মার্টিনেটের তুষ্টিতে

সত্তাই বঙ্গবাসী তুষ্ট হইয়াছেন। এ তুষ্টির পুষ্টি কতখানি তাহা মার্টিনেটের ভ্রমণ-কাহিনী প্রকাশিত হইলে বুঝা যাইবে। শিক্ষিত বাঙ্গালী সে আশায় থাকুন,—অশিক্ষিত বাঙ্গালীর সে বালাই নাই, সে দিয়াই তুষ্ট!

বর্ত্তমানে, অজ্ঞেয়কে আবিষ্কার করিবার আর একটী উদাহরণ হিমালয়ের সুউচ্চ গৌরী-শঙ্করের শিখর দেশে উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াস। কর্ণেল বেলী গত বৎসর গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গে আরোহণ প্রয়াসী হইয়াছিলেন কিন্তু এই দুরারোহ অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপারে তিনি সফলকাম হইতে না পারিলেও গৌরীশঙ্করে উঠিবার একটা পথের আবিষ্কার করেন। বর্ত্তমান বর্ষে জেনারেল ব্রুস আর একদল লোক লইয়া সেই পথে গৌরী-শঙ্করে উঠিবার জন্য প্রয়াণ করেন। ইহঁাদের অদম্য চেষ্টা অমানুষিক। গৌরীশঙ্কর চির-বরফাবৃত দেশ। কত নদ নদী দুরারোহ চড়াই, বরফ-নদী, কত যে অতলস্পর্শ গহ্বর সে পথে তাহার ইয়ত্তা নাই, তাহার উপর অত উচ্চে বায়ু এত হাল্কা যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া প্রায় অচল, এই জন্য ইহঁাদিগকে বোতলে করিয়া অক্সিজেন গ্যাস সঙ্গে লইতে হইয়াছিল। কত কষ্টে কন্‌কনে শীত বরফবৃষ্টি প্রবল ঝড়ের প্রকোপ সহ্য করিয়া তাঁহারা গৌরীশঙ্করের শৃঙ্গে ২৭২০০ ফুট উঠিয়াছিলেন আর ১৮০০ উঠিলেই শৃঙ্গাগ্রভাগে পেঁছান যাইত! জ্ঞান সম্প্রসারণের জন্য মানুষের কি অমানুষিক সাধনা! এই সাধনায় প্রায় সিদ্ধ হইয়া জেনারেল ব্রুস অমরত্ব লাভ করিলেন। তাঁহার বীরত্বে বিজয় মাল্য তাঁহার অবশ্য প্রাপ্য। তাঁহার স্বজাতীয় সঙ্গীগণও যে এই সুযশ হইতে বঞ্চিত হইবেন না তাহাও সুনিশ্চিত। ইংরাজ বীরত্বের গৌরব পূর্ণভাবে সম্মান করিতে জানে, ইহঁাদের নাম নিশ্চয়ই ছাপার অক্ষরে চিরদিনের জন্য ইংরাজী সাহিত্যে বিরাজ করিবে। কিন্তু ইহাদের হতভাগ্য পাহাড়ীয়া সঙ্গীগণ যাহারা ইঁহাদেরই মত নিজেদের প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গেল,—সাতজন কুলী, এই গৌরীশৃঙ্গ অভিযানে প্রাণপাত করিল তাহাদের স্মৃতি, এমন কি নাম পর্য্যন্ত কোনও স্থানে উল্লেখিত হইবে কি না সন্দেহ। তাহাদের নেতা জেনারেল ব্রুস সংবাদ পত্রে এই সাহসী অনুচরগণের কথা একবার উল্লেখ করিয়াই নীরব হইয়াছেন; কিন্তু অন্যে এমন কি

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিও ইহাদের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতে পরাঙ্মুখ। কেবল "আত্মশক্তি" ইহাদের শক্তি সামর্থ্যের বীরত্বের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন—"আজ তাহাদের যায়গায় যদি একটা ইংরেজ প্রাণ হারাত তাহা হলে বিশ্বদূত রয়তার সারা পৃথিবী জুড়ে একটা আন্দোলন উপস্থিত করতো, কত টাকা উঠ্‌তো, কত মর্ম্মরস্মৃতি তৈয়ারী হত! কিন্তু এরা যে কালা আদমী, বীরত্বেরও সাদা কালা! * * * বীর না বীরের মর্য্যাদা রাখে?"

বৈদেশীক বীরদের বিজিতের বীরত্ব চোখে না পড়া বিচিত্র নহে, না পড়ুক তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধাতার বিধানে তাহাদিগকে একদিন করিতে হইবে কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের দুঃখের কথা যে আমরা নিজেরাই নিজেদের সম্মান করিতে জানি না। আজও আত্মশক্তির মহিমা উপেক্ষা করিয়া চাই পরের নিকট সম্মান।

গৃহে পূজা অনুষ্ঠিত না হইলে,—হৃদয় মন্দির শূন্য হয় যদি, বিদেশী চার্চের উপাসনা আমাদিগকে মুক্তি দান করিতে পারিবে কি?

তোমার পূজা হউক মা, হৃদয়ের মন্দিরে মন্দিরে। শূন্য প্রাণে পরের ঘরের পূজায় যোগ দিলে উৎসবের আনন্দ কথঞ্চিৎ লাভ হইতে পারে,—সাধনার আশা সুদূরপরাহত!

গান।

—:০:—

বিভাষ—একতালা।

তুমি আমায় দিয়েছ প্রাণ তোমায় নমস্কার।
এ যে তোমার প্রেমের দান স্নেহের পুরস্কার
হে হরি তোমায় নমস্কার॥

দিয়েছ এই নবীন দেহ,　　দিয়েছ মার কোমল স্নেহ
দিয়েছ এই বাপের গেহ নিয়েছ মোর ভার,
তোমায় নমস্কার হে হরি তোমায় নমস্কার।
তোমার আলো বন্ধু আমার, আকাশ আমার সাথী,
চন্দ্র আমার খেলার সখা, সূর্য্য আমার বাতি,
তোমার স্নেহ-আশীষ জলে　　জয়ের মালা দিলে গলে,
দিয়েছ মোর প্রাণের তলে ভালবাসার হার।
তোমায় নমস্কার হে হরি তোমায় নমস্কার।

স্বরলিপি

-ঃ※ঃ-

কথা—সম্পাদিকা।　　সুর ও স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী

	০				১				২				৩			
II	সা	গা	-া	|	গা	গা	গা	|	পা	পা	-া	|	পা	গা	গা	|
	তু	মি	০		আ	মা	র		দি	য়ে	০		ছ	প্রা	ণ	
	০				১				২				৩			
	রা	রা	রা	|	গা	পা	-া	|	ধা	-া	-া	|	ধা	ধা	-া	|
	তো	মা	র		ন	ম	০		স্কা	০	র		এ	যে	০	
	০				১				২				৩			
	পা	পা	পা	|	ধা	ধা	ধা	|	নর্সা	-া	-া	|	-া	-া	-া	|
	তো	মা	র		প্রে	মে	রি		দা	০	০		০	০	ন	
	০				১				২				৩			
	সা	সা	সা	|	সা	সা	রা	|	গা	গা	গা	|	ধা	পা	পা	|
	স্নে	হে	র		পু	র	০		স্কা	র	হে		হ	রি	০	

গা গা রা | গা রা -া | সা -া -া | -া -া সা II
তো মা র ন ম ০ স্কা ০ ০ ০ ০ র
০ ১ ২ ৩

|| গা গা -া | পা পা ধা | নর্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা -া |
দি য়ে ০ ছ এ ই ন বী ন দে হ ০
০ ১ ২ ৩

র্সা র্সা -া | র্রা র্রা র্রা | র্সা র্সা না | ধা ধা পা |
দি য়ে ০ ছ মা য় কো ম ল স্নে হ ০
০ ১ ২ ৩

পা পা -া | ধা ধা না | পা পা ধা | নর্সা র্সা -া |
দি য়ে ০ ছ এ ই বা পে র গে হ ০
০ ১ ২ ৩

গা গা গা | পা পা পা | ধা -া -া | -া -া ধা |
নি য়ে ০ ছ যো র ভা ০ ০ ০ ০ র
০ ১ ২ ৩

সা সা সা | সা সা রা | গা গা পা | ধা পা পা |
তো মা র ন ম ০ স্কা র হে হ রি ০
০ ১ ২ ৩

গা গা রা | গা রা -া | সা -া -া | -া -া সা ||
তো মা র ন ম ০ স্কা ০ ০ ০ ০ র
০ ১ ২ ৩

II গা গা গা | গা গা -া | গা পা পা | গা গা গা |
তো মা র আ লো ০ য় ০ দু আ মা র
০ ১ ২ ৩

রা রা রা | গা পা পা | ধা ধা -া | -া -া -া |
আ কা শ আ মা র সা থী ০ ০ ০ ০
০ ১ ২ ৩

পা -া পা | ধা ধা ধা | পা ধা নর্সা | ধা পা -া |
চ ০ ন্দ্র আ মা র খে লা র স খা ০

০ ১ ২ ৩
গা -া গা | রা রা গা | রা সা -া | -া -া -া |
সূ ০ র্যা আ মা র বা তি ০ ০ ০ ০

০ ১ ২ ৩
গ গা গা | পা পা ধা | নর্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা -া |
তো মা র স্নে হ ০ আ শী ষ জ লে ০

০ ১ ২ ৩
র্সা র্সা র্রা | র্রা র্গা র্গা | র্রা র্সা না | ধা পা -া |
জ য়ে র মা লা ০ দি লে ০ গ লে ০

০ ১ ২ ৩
পা ধা -া | ধা ধা না | পা ধা ধা | নর্সা র্সা -া |
দি য়ে ০ ছ মো র প্রা ণে র ত লে ০

০ ১ ২ ৩
গা গা -া | পা পা পা | ধা -া -া | ধা -া -া |
ভা ল ০ বা সা র হা ০ ০ ০ ০ র

০ ১ ২ ৩
সা সা সা | সা রা রা | গা গা পা | ধা পা -া |
তো মা য় ন ম ০ স্কা র হে হ রি ০

০ ১ ২ ৩
গা গা রা | গা রা [illegible] | সা -া -া | -া -া সা II
তো মা য় ন ম ০ স্কা ০ ০ ০ ০ র

স্ত্রীজাতির অবনতি *

পাঠিকাগণ! আপনারা কি কোন দিন আপনাদের দুর্দ্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? এই বিংশশতাব্দীর সভ্য জগতে আমরা কি দাসী? পৃথিবী হইতে

---

* স্ত্রীজাতির উন্নতির প্রসঙ্গ বর্ত্তমানে নানা ভাবে আলোচিত হইতেছে; কিন্তু মুসলমান মহিলার আলোচনা বড় প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীমতী রকেয়া হোসেন এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন, আশার কথা। স্ত্রী-প্রসঙ্গ স্ত্রীজাতির দ্বারা আলোচিত হওয়াই ঠিক্। নিজেদের অভাব, অভিযোগ, অবস্থা নিজেদের মত অন্যে বুঝে না। বিশেষতঃ এক্ষেত্রে অপর পক্ষই নাকি এই অবনতির জন্য দায়ী—তাঁহাদের উক্তি ও যুক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন ন চ কর্ত্তব্যঃ!

আসল কথা—কেবা ছোট কেবা বড়, কেবা উন্নত কেবা অনুন্নত, কে কাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। বিধাতার বিধানে একত্র যাহাদের বসবাস, এককে ছাড়িয়া সংসারে যখন অন্যের সকলি শূন্যপ্রায়,—তাহাদের এক উন্নত, অপর অনুন্নত থাকিতে পারে না। ভারতে অবনতি ঘটিয়াছে উভয় নরনারীরই! আত্ম-সত্তার অনুভূতি উভয়েই হারাইয়াছেন; কাজেই যেখানে যার জোর তিনি সেখানেই আত্মস্বার্থ ষোল আনা বজায় রাখিতে গিয়া 'জোর যার মুলুক তার' নীতিতে প্রভাব বিস্তার করিতে সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচারও কম করেন নাই। পুরুষ নিজে ছোট হইয়া ভোগবিলাসকে কাম্য বিবেচনায় জীবনসঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী নারীকে নিজের ক্ষুদ্র আদর্শে ছোট করিয়া ফেলিয়াছেন। আবার নারীও কম করেন নাই। পুরুষের জীবনে নারীর টান বড় টান—ইহাকে ছিন্ন করা সংসারীর পক্ষে সহজ নহে। নারী যদি শক্তি না হারাইয়া স্বইচ্ছায় পুরুষের সহিত নিম্নগা না হইতেন, তবে সাধ্য কি পুরুষের তাঁকে নামাইয়া আনে! শক্তির নাই শক্তি,—পুরুষের নাই সাধনা!—তাই না এ অবস্থা! সাড়া পড়িয়াছে, নরনারী মিলিত হইয়া মানবিকতার উচ্চ আদর্শে অগ্রসর হউন,—উভয়ের সমবেত সমাহিত সংযত সাধনা ব্যতীত পড়িয়া থাকিতে হইবে যে তিমিরে—সে তিমিরেই। পরিচারিকা।

দাস ব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে শুনিতে পাই, কিন্তু আমাদের দাসত্ব গিয়াছে কি ? না। আমরা দাসী কেন ?—কারণ আছে।

আদিম কালের ইতিহাস কেহই জানে না বটে, তবু মনে হয় যে পুরাকালে যখন সভ্যতা ছিল না, সমাজ বন্ধন ছিল না, তখন আমাদের অবস্থা এরূপ ছিল না। কোন অজ্ঞাত কারণ বশতঃ মানব জাতির এক অংশ (নর) যেমন ক্রমে নানা বিষয়ে উন্নতি করিতে লাগিল, অপর অংশ (নারী) তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেরূপ উন্নতি করিতে পারিল না বলিয়া পুরুষের সহচরী বা সহধর্ম্মিণী না হইয়া দাসী হইয়া পড়িল।

আমাদের এ বিশ্বব্যাপী অধঃপতনের কারণ কেহ বলিতে পারেন কি ? সম্ভবতঃ সুযোগের অভাব ইহার প্রধান কারণ। স্ত্রীজাতি সুবিধা না পাইয়া সংসারের সকলপ্রকার কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছে। এবং ইহাদিগকে অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য দেখিয়া পুরুষজাতি ইহাদের সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল! ক্রমে পুরুষ পক্ষ হইতে যতই বেশী সাহায্য পাওয়া যাইতে লাগিল, স্ত্রীপক্ষ অধিকতর অকর্ম্মণ্য হইতে লাগিল।

ঐরূপ আমাদের আত্মাদর লোপ পওয়ায় আমরা আলস্যের—প্রকারান্তরে পুরুষের দাসী হইয়াছি। ক্রমশঃ আমাদের মন পর্য্যন্ত দাস (enslaved) হইয়া গিয়াছে। এবং আমরা বহুকাল হইতে দাসীপনা করিতে করিতে দাসত্বে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের স্বাবলম্বন, সাহস প্রভৃতি মানসিক উচ্চবৃত্তিগুলি অনুশীলন অভাবে বার বার অঙ্কুরে বিনাশ হওয়ায় এখন আর বোধ হয় অঙ্কুরিতও হয় না। কাজেই পুরুষজাতি বলিতে সুবিধা পাইয়াছেন ; "The five worst maladies that afflict the female mind are : indocity, discontent, slander, jealousy and silliness. * * such is the stupidity of her character, that it is incumbent on her, in every particular, to distrust herself and to obey her husband." (Japan, the Land of the Rising Sun.)

(ভাবার্থ—স্ত্রীজাতীর অন্তঃকরণের পাঁচটী দুরারোগ্য ব্যধি এই—(কোন [illegible]) অযোগ্যতা, অসন্তোষ, পরনিন্দা, হিংসা এবং মুর্খতা। * * * নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য যে প্রত্যেক বিষয়ে নিজেকে অবিশ্বাস করিয়া স্বামীর আদেশ পালন করে।)

তারপর কেহ বলেন "অতিরঞ্জন ও মিথ্যাবচন রমণী-জিহ্বার অলঙ্কার!" আমাদিগকে কেহ "নাকেস-উল-আকেল" এবং কেহ "যুক্তিজ্ঞানহীন" (unreasonable) বলিয়া থাকেন আমাদের ঐ সকল দোষ আছে বলিয়া তাঁহারা আমাদিগকে হেয়জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এরূপ হওয়া স্বাভাবিক।

আর এই যে আমাদের অতিপ্রিয় অলঙ্কারগুলি—এগুলি দাসত্বের নিদর্শন বিশেষ! এখন ইহা সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনের আশায় ব্যবহার করা হয় বটে; কিন্তু অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তির মতে অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন (Originally badges of slavery) ছিল। তাই দেখা যায় কারাগারে বন্দীগণ পায় লৌহ-নির্ম্মিত বেড়ী পরে, আমরা (আদরের জিনিষ বলিয়া) স্বর্ণ রৌপ্যের বেড়ী অর্থাৎ 'মল' পরি। উহাদের হাতকড়ি লৌহ নির্ম্মিত, আমাদের হাতকড়ি স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্ম্মিত চুড়ি! বলা বাহুল্য, লোহার বালাও বাদ দেওয়া হয় না! কুকুরের গলে যে গলা বন্ধ (Dog Collar) দেখি, উহারই অনুকরণে বোধ হয় আমাদের কড়োয়া চিক নির্ম্মিত হইয়াছে! অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি পশু লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, সেইরূপ আমরা স্বর্ণ শৃঙ্খলে কণ্ঠ শোভিত করিয়া মনে করি 'হার পড়িয়াছি'। গো-স্বামী বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া "নাকা-দড়ী" পরায়, এদেশে আমাদের স্বামী আমাদের নাকে 'নোলক' পরাইয়াছেন!! ঐ নোলক হইতেছে "স্বামীর" অস্তিত্বের (সধবার) নিদর্শন! অতএব দেখিলেন ভগিনি! আপনাদের ঐ বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি দাসত্বের নিদর্শন ব্যতীত আর কি হইতে পারে? আবার মজা দেখুন, যাঁহার শরীরে দাসত্বের নিদর্শন যত অধিক, তিনি সমাজে ততোধিক মান্য গণ্যা।

এই অলঙ্কারের জন্য ললনাকুলের কত আগ্রহ! যেন জীবনের সুখ, সমৃদ্ধি উহারই উপর নির্ভর করে! তাই দরিদ্রা কামিনীগণ স্বর্ণ রৌপ্যের হাতকড়ি না পাইয়া কাচের চুড়ি পরিয়া দাসীজীবন সার্থক করে! যে (বিধবা) চুড়ি পরিতে অধিকারিণী নহে, তাহার মত হতভাগিনী যেন এ জগতে আর নাই! অভ্যাসের কি অপার মহিমা! দাসত্বে অভ্যাস হইয়াছে বলিয়া দাসত্ব সূচক গহনাও ভাল লাগে। অহিফেন তিক্ত হইলেও আফিংচির অতি প্রিয় সামগ্রী। মদক দ্রব্য যতই সর্ব্বনাশ হউক না কেন, মাতাল তাহা ছাড়িতে চাহে না।

সেইরূপ আমরা অঙ্গে দাসত্বের নিদর্শন ধারণ করিয়াও আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করি—গর্ব্বে স্ফীতা হই!

বাস্তবিক অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি অলঙ্কারকে দাসত্বের নিদর্শন না ভাবিয়া সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনের উপায় মনে করা যায়, তাহাই কি কম নিন্দনীয়? সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনের চেষ্টাও কি মানসিক দুর্ব্বলতা নহে? পুরুষেরা ইহা পরাজয়ের নিদর্শন ভাবেন।

পুরুষজাতি বলেন যে, তাঁহারা আমাদিগকে "বুকের ভিতর বুক পাতিয়া বুক দিয়া ঢাকিয়া" রাখিয়াছেন, এবং এরূপ সোহাগ আমরা সংসারে পাইব না বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমরা তাই সোহাগে গলিয়া ঢলিয়া বহিয়া যাইতেছি! ফলতঃ তাঁহারা যে অনুগ্রহ করিতেছেন, তাহাতেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে। আমাদিগকে তাঁহারা হৃদয় পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া জ্ঞান-সূর্য্যালোক ও বিশুদ্ধ বায়ু হইতে বঞ্চিতা রাখিয়াছেন, তাহাতেই আমরা ক্রমশঃ মরিতেছি। তাঁহারা আরও বলেন, "তোমাদের সুখের সামগ্রী, আমরা মাথায় বহিয়া আনিয়া দিব—আমরা থাকিতে তোমরা দুঃখ সহ্য করিবে কেন?" আমরা ঐ শ্রেণীর বক্তাকে তাঁহাদের অনুগ্রহপূর্ণ উক্তির জন্য ধন্যবাদ দিই; কিন্তু ভ্রাতঃ! পোড়া সংসারটা কেবল কবির সুখময়ী কল্পনা নহে—ইহা জটিলকুটিল কঠোর সংসার। সত্য বস্তু—কবিতা নহে।

তাই যা কিছু মুস্কিল!! নতুবা আপনাদের কৃপায় আমাদের কোন অভাব হইত না। বঙ্গবালা আপনাদের কল্পিত বর্ণনা অনুসারে "ক্ষীণাঙ্গী, কোমলাঙ্গী, অবলা, ভয়বিহ্বলা—" ইত্যাদি হইতে হইতে ক্রমে সূক্ষ্ম শরীর (Aerial body) প্রাপ্ত হইয়া বাষ্পরূপে অনায়াসে আকাশে বিলীন হইতে পারিতেন!! কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তদ্রূপ সুখকর নহে; তাই এখন মিনতি করিয়া বলিতে চাই—

"অনুগ্রহ করে এই কর, অনুগ্রহ করো না মোদের।"

বাস্তবিক অত্যধিক যত্নে অনেক বস্তু নষ্ট হয়। যে কাপড় বহু যত্নে বন্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা উইএর ভোগ্য হয়। সুতরাং দেখা যায়, তাঁহাদের অধিক যত্নই আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ।

বিপদসঙ্কুল সংসার হইতে সর্ব্বদা সুরক্ষিতা আছি বলিয়া আমরা সাহস, ভরসা, বল একেবারে হারাইয়াছি। আত্মনির্ভরতা ছাড়িয়া স্বামীদের নিতান্ত মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি। সামান্য হইতে সামান্যতর বিপদে পড়িলে আমরা গৃহকোণে লুকাইয়া গগনভেদী আর্ত্তনাদে রোদন করিয়া থাকি!! ভ্রাতৃমহোদয়গণ আবার আমাদের "নাকি কান্নার" কথা তুলিয়া

কেমন বিদ্রূপ করেন, তাহা কে না জানে? আর সে বিদ্রূপ আমরা নীরবে সহ্য করি। আমরা কেমন শোচনীয়ভাবে ভীরু হইয়া পড়িয়াছি, তাহা ভাবিলে ঘৃণায় লজ্জায় মৃতপ্রায় হই।*

ব্যাঘ্র ভল্লুক ত দূরে থাকুক, আরসুলা, জলৌকা প্রভৃতি দেখিয়া আমরা ভীতিবিহ্বলা হই! এমন কি অনেকে মূর্চ্ছিতা হন! একটী ৯। ০ বৎসরের বালক বোতলে আবদ্ধ একটী জলৌকা লইয়া বাড়ীশুদ্ধ স্ত্রীলোকদের ভীতি উৎপাদন করিয়া আমোদ উপভোগ করে। অবলাগণ চীৎকার করিয়া দৌড়িতে থাকেন, আর বালক সহাস্যে বোতল হস্তে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়। এমন তামাসা আপনারা দেখেন নাই কি? আমি দেখিয়াছি—আর সে কথা ভাবিয়া ঘৃণায় লজ্জায় মরমে মরিতেছি। সত্য কথা বলিতে কি, সে সময় বরং আমোদ বোধ করিয়াছিলাম; কিন্তু এখন সে কথা ভাবিলে শোণিত উত্তপ্ত হয়। হায়! আমরা শারীরিক বল, মানসিক সাহস, সব কাহার চরণে উৎসর্গ করিয়াছি? আর এই দারুণ শোচনীয় অবস্থা চিন্তা করিবার শক্তিও আমাদের নাই।

---

* সেদিন (গত ৯ই এপ্রিলের) একখানা উর্দ্দু কাগজে দেখিলাম :—

তুরস্কের স্ত্রীলোকেরা সুলতান-সমীপে আবেদন করিয়াছেন, "চারি প্রাচীরের ভিতর থাকা ব্যতীত আমাদের আর কোন কাজ নাই। আমাদিগকে অন্ততঃ এ পরিমাণ শিক্ষা দেওয়া হউক, যাহার সাহায্যে যুদ্ধের সময় আমরা আপন আপন বাটী এবং নগর পুরুষদের মত বন্দুক কামান দ্বারা রক্ষা করিতে পারি।" তাঁহারা ঐ আবেদনে নিম্নলিখিত উপকারগুলি প্রদর্শন করিয়াছেন :—

(১) প্রধান উপকার এই যে নগরাদি রক্ষা করিবার জন্য অনেকগুলি সৈন্য নিযুক্ত থাকায় যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য সংখ্যা কম হওয়ায় যে ক্ষতি হয়, তাহা আর হইবে না। (যে হেতু 'অবলা'গণ নগর রক্ষা করিবেন!)

(২) সন্তান সন্ততিবর্গ শৈশব হইতেই যুদ্ধ বিদ্যায় অভ্যস্ত হইবে। পিতা মাতা উভয়ে সেপাহী হইলে শিশুগণ ভীরু কাপুরুষ হইবে না।

(৩) তাঁহারা বিশেষ এক নমুনার উর্দ্দি (uniform) প্রস্তুত করিবেন, যাহাতে চক্ষু ও নাসিকা ব্যতীত মুখের অবশিষ্ট অংশ এবং সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ আবৃত থাকিবে।

(৪) অবরোধ প্রথার সম্মান রক্ষার্থে এই স্থির হইয়াছে যে, অন্ততঃ তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যেক পরিবারের সৈনিক পুরুষেরা আপন আপন আত্মীয় রমণীদিগকে যুদ্ধ শিক্ষা দিবেন। অতঃপর যুদ্ধ শিক্ষা প্রাপ্তা মহিলাগণ যুদ্ধ শিক্ষা দিবার জন্য ঘরে ঘরে দেখা দিবেন। উক্ত মহিলাগণ ইহাও লিখিয়াছেন যে,—"আমরা উর্দ্দির (uniform-এর) খরচের জন্য গবর্ণমেণ্টকে কষ্ট দিব

ভীরুতার চিত্র ত দেখাইলাম, এখন শারীরিক দুর্ব্বলতার চিত্র দেখাইব। আমরা এমন জড় 'অচেতন পদার্থ' হইয়া পড়িয়াছি যে, তাঁহাদের গৃহসজ্জা (drawing-room-এর ornament) বই আর কিছুই নহি। পাঠিকা! আপনি কখন বেহারের কোন ধনী মুসলমান ঘরের বউ-ঝী নামধেয় জড় পদার্থ দেখিয়াছেন কি? একটী বধূ বেগম সাহেবার প্রতিকৃতি দেখাই। ইঁহাকে কোন প্রসিদ্ধ যাদুঘরে (museum) বসাইয়া রাখিলে রমণীজাতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হইত। একটা অন্ধকার কক্ষে দুইটী মাত্র দ্বার আছে, তাহার একটী রুদ্ধ এবং একটী মুক্ত থাকে। সুতরাং সেথানে (পর্দ্দার অনুরোধে?) বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যরশ্মির প্রবেশ নিষেধ। ঐ কুঠরীতে পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে যে রক্তবর্ণ বনাতমণ্ডিত তক্তপোষ আছে, তাহার উপর বহুবিধ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা, তাম্বুলরাগে রঞ্জিতাধরা, প্রসন্নাননা যে জড় পুত্তলিকা দেখিতেছেন, উহাই দুলহন্ বেগম (অর্থাৎ বেগমের পুত্রবধূ)। ইঁহার সর্ব্বাঙ্গে ১০২৪০৲ টাকার অলঙ্কার! শরীরের কোন্ অংশে কত ভরি সোণা বিরাজমান, তাহা সুস্পষ্টরূপে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

১। মাথায় (সিঁথির অলঙ্কার) অর্দ্ধ সের (৪০ ভরি)।
২। কর্ণে কিঞ্চিৎ অধিক এক পোয়া (২৫ ভরি)।
৩। কণ্ঠে দেড় সের (১২০ তোলা)।
৪। সুকোমল বাহুলতায় প্রায় দুই সের (১৫০ ভরি)।
৫। কটিদেশে প্রায় তিন পোয়া (৬৫ ভরি)।
৬। চরণ যুগলে ঠিক তিন সের (২৪০ ভরি) স্বর্ণের বোঝা!!

না। কেবল বন্দুক এবং অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র সরকার হইতে পাইতে আশা করি।" উপরোক্ত সংবাদ সত্য কিনা, সেজন্য সেই পত্রিকাখানি দায়ী। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, তুরস্করমণীদের ওরূপ আকাঙ্ক্ষা হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে। ইতিহাসে শুনা যায় পূর্ব্বে তাঁহারা যুদ্ধ করিতেন। একটা যেমন তেমন মুসলমানী-পুঁথির পাতা উল্টাইলেও আমরা দেখিতে পাই (যুদ্ধ করিতে যাইয়া)—

"জয়গুণ নামে বাদসাহ-জাদী কয়েদ হইল যদি,
আর যত আরবা সওয়ার"—ইত্যাদি।

বলি, এদেশের যে সমাজপতিগণ "লেডী কেরাণী" হওয়ার প্রস্তাব শুনিলে চমকাইয়া উঠেন (shocked হন)—যাঁহারা অবলার হস্তে পুতুল সাজান ও ফুলের মালা গাঁথা ব্যতীত আর কোন শ্রমসাধ্য কার্য্যের ভার কল্পনাই করিতে পারেন না, তাঁহারা ঐ লেডী যোদ্ধা হওয়ার প্রস্তাব শুনিলে কি করিবেন? মূর্চ্ছা যাইবেন না ত?

বেগমের নাকে যে নথ ঝুলিতেছে, ইহার ব্যাস সার্দ্ধ চারি ইঞ্চি।* পরিহিত পা-জামা বেচারা সলমা চুমকির কারুকার্য্য ও বিবিধ প্রকারের জরির (গোটা পাট্টার) ভারে অবনত। আর পা জামা ও দোপাট্টার (চাদরের) ভরে বেচারী বধূ ক্লান্ত।

ঐরূপ আট সের স্বর্ণের বোঝা লইয়া নড়াচড়া অসম্ভব, সুতরাং হতভাগী বধূ বেগম জড়-পদার্থ না হইয়া কি করিবেন? সর্ব্বদাই তাঁহার মাথা ধরে; ইহার কারণ ত্রিবিধ—(১) সুচিক্কণ পাটী বসাইয়া কষিয়া কেশবিন্যাস, (২) বেণী ও সিঁথির উপর অলঙ্কারের বোঝা, (৩) অর্দ্ধেক মাথায় আটা সংযোগে অফশাঁ (স্বর্ণচূর্ণ) ও চুমকি বসান হইয়াছে; ভ্রূযুগ চুমকি দ্বারা আচ্ছাদিত। এবং কপালে রাঙের বিচিত্র বর্ণের চাঁদ ও তারা আটা সংযোগে বসান হইয়াছে। শরীর যেমন জড়পিণ্ড, মন ততোধিক জড়।

এই প্রকার জড়পিণ্ড হইয়া জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনামাত্র। কারণ কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম না করায় বেগমের স্বাস্থ্য একেবারে মাটী হয়। কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইতে তাঁহার চরণদ্বয় শ্রান্ত ক্লান্ত ও ব্যথিত হয়। বাহুদ্বয় সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য। অজীর্ণ ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগ তাঁহার চিরসহচর। শরীরে স্ফূর্ত্তি না থাকিলে মনেও স্ফূর্ত্তি থাকে না। সুতরাং ইঁহাদের মন এবং মস্তিষ্ক উভয়ই চিররোগী! এমন স্বাস্থ্য লইয়া চিররোগী জীবন বহন করা যে কেমন কষ্টকর তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

ঐ চিত্র দেখিলে কি মনে হয়? বধূবেগমের অবস্থা চিন্তা করিলে মনে হয় "অভাগীর ইহলোক পরলোক—উভয়ই নষ্ট," যদি ঈশ্বর হিসাব নিকাশ লয়েন যে, "তোমার মন, মস্তিষ্ক চক্ষু প্রভৃতির কি সদ্ব্যবহার করিয়াছ?" তাহার উত্তরে বেগম কি বলিবেন? আমি তখন সেই বাড়ীর একটী মেয়েকে বলিলাম, "তুমি যে হস্তপদ দ্বারা কোন পরিশ্রম কর না, এজন্য খোদার নিকট কি জওবাদিহি (explanation) দিবে?" সে বলিল, "আপ্‌কা কহ্‌না ঠিক হ্যায়"—এবং সে যে সময় নষ্ট করে না, সতত চলাফেরা করে আমাকে ইহাও জানাইল। আমি পুনরায় বলিলাম, "শুধু ঘুরা ফেরা করিলেই ব্যায়াম হয় না। তুমি প্রতিদিন অন্ততঃ আধঘণ্টা দৌড়াদৌড়ি করিও।" দৌড়াদৌড়ি কথাটার উত্তরে হাসিয়া একটা গড়িয়া উঠিল। আমি কিন্তু ব্যথিত হইলাম, ভাবিলাম, "উল্টা বুঝিল রাম!" কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার শক্তিটুকুও ইঁহাদের নাই। আমাদের উন্নতির আশা বহুদূরে—ভরসা কেবল পতিতপাবন।

ক্রমশঃ—

এডুকেশন গেজেট। শ্রীমতী রকেয়া হোসেন।

* কোন কোন নথের ব্যাস ছয় ইঞ্চ এবং পরিধি ন্যূনাধিক ১৯ ইঞ্চ হয়। ওজন এক ছটাক!

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৬ষ্ঠ বর্ষ। | ভাদ্র, ১৩২৯ সাল। | ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।

নারীর উন্নতিকামী মাতা আনন্দময়ীর পত্র।

সচ্চিদানন্দ নিকেতনেষু—

এইমাত্র তোমার পবিত্র হৃদয়ের আবেগভরা পত্রখানি পেয়ে যে কি আনন্দ হ'ল তা' তোমায় কি করে জানাব জানি না। মাঝে মাঝে তোমার হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে যে পত্র দাও তাতে প্রাণে বড় আশার সঞ্চার হয়, মনে হয় তোমার মত জাগা-মেয়ে আরও দু একজন পেলে জগতের অনেক কাজই কর্ত্তে পারা যায়। জীবনের ৫৩ বৎসর কেটে গেল। সেই বিশ্বজননীর নিকট আজীবন প্রার্থনা জানিয়েছি "মাগো! তোমার অনন্ত-শক্তি নিয়ে তুমি কয়েকটী শুদ্ধ আধারের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ কর, যে শক্তি পেয়ে তোমার অংশরূপিণী জনকতক জাগামেয়ে এই হতভাগ্য দেশের নারীশক্তি জাগাতে পারে।" তাই যখন তোমার

পত্রখানিতে পড়লাম "যদি মা কখন আপনার কাছে গিয়া পড়ি, তবে আমায় যন্ত্র-স্বরূপ করিয়া কাজ করাইয়া লইবেন, অনেক পারিব মা, অনেক শক্তি লুকাইয়া আছে মনে হয়"—তখন মনে হল বিশ্বজননী যেন তোমার মধ্য দিয়ে এই দেশের মূক নারীজাতির শক্তির কথা জানাচ্ছেন। হঁা মা আমার, তোমার মধ্যেই অনন্ত শক্তি নিহিত আছে—অসাধ্য সাধন তুমিই কর্ব্বে। যে দিন নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় আরও ভাল করে পাবে, সে দিন তুমি নিজেও চমকিত হবে সমগ্র জগৎ তোমায় দেখে স্তম্ভিত হবে। আজ ভাব দেখি মা আমার, তুমি অনন্ত বলশালী আত্মা—আর বল, বীর্য্যমসি বীর্য্যং বলমসি বলম্ গুণোঽসি গুণঃ সহোঽসি সহোময়ি সেহি। ঠিক কথা লিখেছ মা, নিষ্কাম কর্ম্ম ছাড়া এ যুগে মানুষের শান্তি কোথায়? তাই বলি যে ক্ষেত্রে আছ সেখান থেকেই মহা হুহুঙ্কারের সহিত কার্য্য আরম্ভ করে দাও,—ভয় কি? কার সাধ্য বাধা দেয়? অন্তরের শক্তির যখন পরিচয় পেতে আরম্ভ করেছ তখন তোমার দৈবী কর্ম্মে কে বাধা দেবে? এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও, দেবী হও আর যতদূর পার অন্যের দেবত্ব জাগাবার চেষ্টা কর। সময় ও সুবিধামত সৎকর্ম্ম কচ্চ বড় আনন্দ হ'ল। যতদিন না মনপ্রাণ ঢেলে কাজ কর্ত্তে পাচ্চ ততদিন যতদূর সম্ভব যে ক্ষেত্রে আছ সেখান থেকে কর্ম্মের গভীর ও সার কর্ব্বার চেষ্টা কর। এই ভাবে এগিয়ে যেতে যেতে এমন একদিন আস্‌বে যে দিন তোমার অজ্ঞাতসারে তুমি বিশ্বহিতের জন্য মনপ্রাণ ও শরীর অর্পণ করে ফেল্‌বে। কাজের কথা লিখেছ, তাই আজ দু চারটে কাজের কথাই লিখ্‌ছি। সমগ্র বাঙ্গালার নারীজাগরণের একটা চেষ্টা কর্ত্তে হবে। বাঙ্গালায় আজ প্রায় আড়াই কোটী নারী মূক ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন। "এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত ক্লান্ত শুষ্ক বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।" আজ এদের জাগবার দিন এসেছে। বড়ই পরিতাপের বিষয় এ দেশের উচ্চশিক্ষিতা মহিলারা কেহই এদিকে নজর দেন না, তাঁদের মধ্যে অনেকেই নকল রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। সমগ্র দেশের স্ত্রীজাতির প্রকৃত শিক্ষা ও সংস্কার না হ'লে দেশের মুক্তির সাধনা যে বিফল হয়ে যাবে! কাহাকে আজ প্রাণের বেদনা জানাব! দু চারটী সর্ব্বত্যাগী মেয়ে ও ছেলে আছে! তাদের যতটা পাচ্চি সমগ্র দেশের মাতৃসেবার জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ করে দাঁড়ার শিক্ষা

দিচ্চি। দেশের কাজ, দশের কাজ, দু একজনে কি কর্ব্বে! তা ছাড়া, বর্ত্তমান সমাজে এরূপ একটা কাজ কর্ত্তে গেলে, দেশের দু চারজন কৃতী সন্তানের সাহায্য দরকার, যাঁদের সমস্ত দেশ জানে ও মানে। অজ্ঞাতনামা কর্ম্মীর দল কাজ আরম্ভ হ'লে প্রাণপাতী পরিশ্রম কর্ত্তে পারে। সব বড় কাজ আরম্ভ কর্ব্বার সময় দু চারজন বড় লোককে নীরবে অক্লান্ত পরিশ্রম কর্ত্তে হবে, কাজটা সুদৃঢ়ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'লে তখন হাজার হাজার লোক এসে সেই কাজটা মাথায় তুলে নেবে। বড় লোক তাঁরা, যাঁরা আপনার বুকের রক্ত দিয়ে রাস্তা তৈরী করেন—এই হয়ে আস্‌ছে, চিরকাল একজন আপনার শরীর দিয়ে সেতু বানায়, আর হাজার হাজার তার উপর দিয়ে নদী পার হয়। তাই বলি, এ কাজ কর্ত্তে গেলে আগে চাই আদর্শ কর্ম্মী, দ্বিতীয় চাই অর্থ। বিশ্বজননীর কৃপায় আমরা ১০। ৫ জন আদর্শ সেবক পাব। ত্যাগ অনেকের মধ্যে আছে, সেটাকে জাগাবার একটা বিশিষ্ট ক্ষেত্র পেলেই সে ত্যাগ আপনি আসে। বিশ্বের সভায়, ধনীর দুয়ারে কোন অজ্ঞাত ত্যাগী কর্ম্মী গিয়ে উপস্থিত হ'লে আজকালকার অধিক সংখ্যক খারাপ লোকের যুগে তারাও ধনীর চক্ষে সেই শ্রেণীভুক্ত হয়ে যায়. সেই জন্য এমন কতকগুলি লোক চাই যাঁদের দেশবাসীরা ভক্তিশ্রদ্ধা করে যাঁদের কথায় বিশ্বাস করে সৎকর্ম্মের জন্য কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় কর্ত্তে পারে। তাই বল্‌চি, তোমাদের মত আরও দু দশজন লোক পেলে অনেক কাজ কর্ত্তে পারা যায়। আমার শারীরিক শক্তি দিন দিন কমে আস্‌ছে। তোমরা যদি আগ্রহ সহকারে যতদূত সম্ভব স্ব স্ব ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে চেষ্টা কর, তা হলে তোমাদের সাহচর্য্য ও সাহায্য পেলে যে দু চারজন ত্যাগীকর্ম্মী আছে, তারা অনেক কাজ কর্ত্তে পারে। তোমার অনেক লোকের সঙ্গে পরিচয় আছে। স্ত্রীশিক্ষা প্রচার কল্পে যে সমস্ত সহৃদয় লোকের দ্বারা সাহায্য পেতে পারা যায়, এমন লোকের কাছে পত্রাদি দিতে পার তাদের জানাতে পার, দু দশজন গণ্যমান্য লোককে এ কাজের জন্য উৎসাহ সম্পন্ন হোতে বল্‌তে পার, এই ভাবে যতটা পার কাজ কর। আসল যা পরিশ্রমের কাজ তা' সেবকগণ কর্ব্বে।

আসল কথা, ধনী, নির্ধন, বিদ্বান, বিদুষী, ত্যাগী সংসারী সকলের সাহায্য গ্রহণ কর্ত্তে হবে, তাদের আন্তরিক সহানুভূতি অর্জ্জন কর্ত্তে হবে। লোক বলই আসল বল। যে ভাবে যে পার্ব্বে সে সেই মত সাহায্য কর্ব্বে। যার অর্থ আছে সে অর্থ দেবে, যার বুদ্ধি আছে সে

সৎ পরামর্শ দেবে যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্ত্তে পার্ব্বে সে মন প্রাণ ও শরীর দিয়ে কার্য্য উদ্ধারের চেষ্টা কর্ব্বে। আমি আশা করি না যে সকলেই সর্ব্বত্যাগী হয়ে এ কাজে যোগ দেবে। যদি বেশী সংখ্যক লোক তাঁদের সুবিধা ও অবসর মত এ কার্য্যে সাহায্য করেন এবং সর্ব্ব-ত্যাগী জন কয়েক লোক পাওয়া যায় তা হলে অসাধ্য সাধন কর্ত্তে পারা যায়। আমি কে? তোমাদের দশজনের শক্তিতেই আমার শক্তি। তোমাদের উৎসাহে আমার উৎসাহ।

** ** ** **

প্রত্যেক কাজ কর্ব্বার পূর্ব্বে একটী সুচিন্তিত কর্ম্ম পদ্ধতি নির্ণয় করা দরকার। তারপর তাহা কার্য্যে পরিণত কর্ব্বার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করা দরকার। সমগ্র দেশের স্ত্রী জাতির আশা আকাঙ্খার কথা, স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার মুক্তির বাণী ঘোষণা করা দরকার। বিভিন্ন দেশের ও জাতের স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে চিন্তাশীল লেখকরা যা' লিখে গেছেন ভাষান্তরিত করে সে গুলো দেশের ঘরে ঘরে মেয়েদের জানবার সুবিধা করে প্রচার করা আবশ্যক। তা হলে কিছু দিন বাদে স্ত্রী জাতির সম্বন্ধে সুশিক্ষিত লোক-মত গড়ে উঠ্‌বে। স্ত্রী জাতি সম্বন্ধে দেশের অসংখ্য পুরুষের ভ্রান্ত ধারণা দূর কর্ত্তে হবে।

দেশের পুরুষরাও নারীর দেবীত্ব ভুলে গেছে। তাদের চৈতন্য সম্পাদন কর্ত্তে হবে। নারীকে তার স্বাধিকার সম্মানের সহিত বজায় কর্ত্তে হবে। কত কথা লিখ্‌ব। প্রাণে অনেক ব্যথা আছে, বেদনা আছে। সে সব বুঝবে কি মা? প্রাণের ভাষা, হৃদয়ের ভাষা, জান্‌বে কি মা? কত কাজ পড়ে আছে। সহস্র জন্ম কাজ কল্লেও যে এ হতভাগ্য দেশের কাজের অভাব হয় না! **নারী যদি নারীর মর্ম্ম ব্যথা না বোঝে, তা হলে কে আর বুঝবে? নারী যদি নিজে জেগে নারীর মুক্তিবিধানের চেষ্টা না করে, তা' হলে কে আর কর্ব্বে?** তাই বলি, উঠ মা, জাগ মা! নিজে জাগ, অন্যকে জাগাও। মহাশক্তি নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, সব সুসম্পন্ন হবে।

বড়ই পরিতাপের বিষয়, গত দশ বৎসর ধরে কত লোক কর্ম্মের অছিলায় এল গেল, কত মৌখিক উৎসাহ দেখালে কিন্তু আসল কাজের সময় তারা সরে গেল! তাই ভেবে ছিলাম, প্রাণের কথা, প্রাণে চেপে এ জগৎ থেকে চলে যাব। নীরব প্রাণে কর্ম্মের দ্বারা

বিশ্বের কল্যাণ কামনায় জীবনের বাকী ক'টা দিন নীরবে কাটিয়ে চলে যান। আজ তোমার মত জাগা-মেয়ের উৎসাহ দেখে আবার প্রাণে আশা হচ্ছে আবার ভাবছি, বিশ্বজননী নিজের কাজ শুদ্ধ সত্ব আধারের ভেতর দিয়ে করিয়ে নেবেন। তাই আজ প্রাণের আবেগে এত কথা লেখালুম্। প্রাণের মধ্যে যে সৎকর্ম্মের আগ্রহ আছে তা' চিরকার পোষণ কর্ব্বে, আজ না হয়, কাল হবে, কাল না হয় দশ বৎসর পরে হবে, নিজে এ জন্মে না পার, ঐ ব্রহ্মাগ্নি হৃদয়ে জ্বলুক্, ঐ আগুণ যেন নিবে না যায়, তা হলে পরজন্মেও কাজ হবে। কায়মনোবাক্যে বিশ্বজননীর নিকট প্রার্থনা করি তিনি তোমায় শক্তি প্রদান করুন, তোমার শুদ্ধ হৃদয়ে তিনি আসন পেতে বসুন। তোমরা ৺নারায়ণের আশীর্ব্বাদ জান্‌বে। আমি ভাল আছি। ইতি—

তোমার শুভঃ

আনন্দময়ী মাতা।

আত্মার প্রতি

—:০:—

[হুইট্‌ম্যান্]

হে আত্মা অন্তর-তম, লহ' হাত ধরি আজি
সে অজানা দেশে আমি যাব তব সাথে,—
শুনি—মাটি নাহি সেথা পদস্পর্শে শষ্পরাজি,
নাহি পথ, মানচিত্র, সেই অসীমাতে!
নাহি কেহ প্রদর্শক, নাহি কার' কণ্ঠস্বর,
রক্ত মাংসে গড়া' মুখ ঠোঁট কিম্বা চো'খ—
অজানা সে কত যেন জানা—জাগে নেত্রপর—
সুখের দুর্গম দেশ সেই স্বপ্নলোক!

যেতে নাকি সব বাঁধা ছিঁড়ে ফেলে যেতে হয়
সাথে থাকে অনন্তের ব্যোম কাল আর,
পড়ে, থাকে ধরণীর আকর্ষণ বৃত্তিচয়
সকল বন্ধন ধূলা আলো অন্ধকার ?
হোক্ তবে তাই ! প্রস্তুত হইনু আমি
পূরাতে আকাঙ্ক্ষা মোর এস তবে নামি।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অবাক্।

—:•:—

(১১)

বৈকালে কলেজ হইতে ফিরিয়া বেগম বাড়ী ঢুকিয়া দেখিল ঝি চাকর ও বাজার-সরকারের ব্যস্ত চীৎকারে রান্না মহলটা সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। বাড়ীতে প্রায়ই আত্মীয় কুটুম্ব ও ধনী মক্কেল উকীল ব্যারিষ্টারের আতিথ্য-উৎসব। বেগম মনে মনে নিঃসন্দেহে ভাবিল বড় দরের কোন লোক আজ অতিথি হইতেছেন ! অথবা নিমন্ত্রিত !—

সারাদিনের পাঠশ্রমের অবসাদ-ক্লিষ্ট দেহ মনে তখন বাহিরের অতিথি সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশের উৎসাহ মোটেই ছিল না। বারেণ্ডার দু'ধারে বসিয়া, বাঁদীরা তরকারী কুটিতেছে, কিসমিস্, বাদাম, পেস্তা বাছিতেছে, আরও কত কি করিতেছে,—সমস্ত কাযগুলার উপর একবার অলস দৃষ্টি বুলাইয়া বেগম ধীরে ধীরে ক্লান্ত চরণে সিঁড়িতে উঠিতে লাগিল।

কিন্তু ত্রিতলে সিঁড়ির মুখে পৌঁছিয়া, বেগম থমকিয়া দাঁড়াইল ! সবিস্ময়ে দেখিল বাহির মহলে দু'জন চাকর উপর হইতে নামিয়া আসিতেছে।—ঈষৎ ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বেগম বলিল "তোমরা ওপরের ঘরে গিয়েছিলে কেন ?"

একজন উত্তর দিল "আপনার ঘরের আলমারী সরিয়ে কুর্সি রাখ্‌বার জায়গা করতে।"

আশ্চর্য্য ও বিরক্ত হইয়া বেগম আর কি কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল। কিন্তু তার আগেই মাতা ত্রিতলের ঘর হইতে সাড়া দিয়া ডাকিলেন "আমি এখানে রয়েছি, উঠে এস।—"

বেগম উপরে উঠিয়া অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল মাতা নিজে তো সেখানে রহিয়াছেন-ই,—উপরন্তু সোফিয়াও রহিয়াছে! দু'জন বাঁদীও উপস্থিত।—ঘরখানার চেহারাও আদ্যোপান্ত বদ্‌লাইয়া গিয়াছে! জিনিস পত্র সমস্ত সরাইয়া নড়াইয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছে বটে, কিন্তু ঘরের মেঝেয় একটা শ্বেত পাথরের টেবিল আনিয়া বসাইয়া সেটার চারপাশে খান পাঁচেক চেয়ার আনিয়া যে ভাবে সাজানো হইয়াছে,—সে দৃশ্য দেখিয়া বেগমের চক্ষুস্থির হইল! উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিল "এখানে কি হবে আম্মা?"

সোফিয়া টেবিলের উপর রঙিন্ কাঁচের ফুলদানিতে ফুল সাজাইতে সাজাইতে বলিল "ইমাম সাহেবদের বাড়ীর মেয়েদের আজ এখানে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, তুই শীগ্রী কাপড় চোপড় পরে ঠিক হয়ে নে, গাড়ী করে তোকেই যেতে হবে তাঁদের আন্‌তে।—"

"আমাকে? বাঃ! আব্বা যে ওবেলা থেকে নোটীশ দিয়ে রেখেছেন, আমাকে এখুনি তাঁর সঙ্গে কোথায় বেড়াতে যেতে হবে না কি,—তৈরী হয়ে থাক্‌বার হুকুম দিয়েছেন।—"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া ব্যঙ্গ স্বরে সোফিয়া বলিল "হ্যাঁগো লক্ষ্মী, হ্যাঁ—তাই জন্যেই! আমার কাছে শোনো,—তাঁর সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া নয়, তাঁর দরকার—নিমন্ত্রণ কর্‌তে যেতে হবে।"

"হ্যাঁ আম্মা, সত্যি?—" বেগম সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মার মুখপানে চাহিল। মাতা একদৃষ্টে এতক্ষণ বেগমের মুখপানে চাহিয়াছিলেন; বেগম প্রশ্ন করিতেই তিনি নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্ষুন্ন অনুযোগের স্বরে বলিলেন—"আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে একবার মুখখানার চেহারা দেখ্‌দেখি! বেগম তুই মানুষের সাম্‌নে বেরুবি কি করে? দিন দিন যে টিক্‌টিকিটি হয়ে যাচ্ছিস্। এই কদিন পড়া নিয়ে তুই বড্ড শুকিয়ে গেছিস!—"

এই অপ্রত্যাশিত ভর্ৎসনার জন্য বেগম মোটেই প্রস্তুত ছিল না। লজ্জায় পড়িয়া মাতার দিক হইতে মুখখানা আড়াল করিবার জন্য তাড়াতাড়ি, ঘরের কোণে, লিখিবার টেবিলটার দিকে আগাইয়া গিয়া, নতমুখে হাতের বইগুলা টেবিলের উপর গুছাইতে লাগিল। কোন উত্তর দিল না।

সোফিয়া ততক্ষণে ঘোরতর তাচ্ছিল্যের অভিনয় করিয়া নিষ্করুণ বিদ্রূপের সুরে বলিয়া উঠিল "অমন কথা বোল না চাচি,—শুধু টিকটিকি ? ওমা! তাদের শরীরে যে হাড় আছে, পেশী আছে,—উনি কি তত ভার সইতে পারবেন ? উনি সূক্ষ্ম চেহারার সৌখীন মানুষ হবেন,—টিকটিকি গিরগিটি নয়, ফড়িং টড়িং কিছু বল,—যা বরদাস্ত হবে।"

হাসিমুখে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, বেগম বলিল "এমন ইঞ্জিনীয়ারী বুদ্ধি খাটিয়ে, লেখাপড়ার টেবিলটাকে একপাশে কোণ-ঠাসা করা হয়েছে কেন ? কে এটাকে এখানে রাখতে বল্লে আম্মা ?"—

সোফিয়া তদ্দণ্ডেই বলিল "অর্থাৎ, তা'হলেই আম্মা সোফির নামটা একবার উচ্চারণ করুন, তারপর সেই ছুতোয়—সোফির সঙ্গে চুলোচুলি করে, গায়ের জ্বালা মিটুনোর পথ হোক!—উঃ! দেখ্‌ছ চাচি, শয়তানী বুদ্ধি দেখ্‌ছ ?"

কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বেগম খুব ঠাণ্ডাভাবে সহাস্যে জবাব দিল "গায়ে পড়ে ঝগড়া করবার বিদ্যেয় তুই যে রকম 'তালেবর' হয়ে পড়েছিস্ সোফি,—তোকে কোনো দৈনিকপত্রের এডিটার করে দিলে, বেশ কায দিতে পারিস্ দেখ্‌ছি—"

"কেনই বা পারব না ? তোর মত নিষ্কর্ম্মার ঢেঁকি তো নয় ? —আমায় রাগ হলে, আমি সব বল্‌তে পারি!"

পিছনে দুহাত রাখিয়া টেবিলের পাশে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া স্মিতমুখে বেগম বলিল "দ্যাখ সোফি,—আমিও কিন্তু এবার ভদ্রলোকের বোল্ চাল্ ঝাড়্‌তে সুরু দেব,—তা বলে রাখ্‌ছি! নইলে—চুপ্! —"

মাতা ব্যস্তভাবে বাধা দিয়া বলিলেন "হ্যাঁ হ্যাঁ, থাম বাপু, কায কর্ম্মের সময় ঝগড়া ঝাঁটি ভাল লাগে না, চুপ কর সব। বেগম, জল টল খেয়ে একটু জিরিয়ে সব গোছগাছ করে নে।

আমি এখন নীচের কায দেখ্‌তে চল্লুম। সোফি, বেগম কি পরবে, টরবে—তুই একটু দেখে শুনে পছন্দ করে দে বাছা।"

মাতা বাহির হইয়া গেলেন।

বেগম ঠিক সেইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া স্মিত-মধুর হাস্যে বলিল "তাপর সোফিয়া দিদি ঠাকুরাণি!—আমার জন্যে এখন কি পোষাকের ফরমাস্ দিচ্ছ?—হুকুম কর—ফ্রক, ইজের, আর বীড্?"

খুব রাগ জানাইয়া সোফিয়া বলিল "জানিনে তোমার যা খুশী কর।—" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া চোখ তুলিয়া চাহিয়া,—প্রত্যেক শব্দের তালে মাথাটি বাঁদিকে হেলাইয়া হেলাইয়া, খুব গম্ভীরভাবে বলিল "অন্য বাড়ীর ছোট বোনরা,—বড় বোনদের খুব,—খু—উ—ব মানে! তোমার মত এমন হতগ্রাহ্যি করে না!—"

"ঐ নাও! এততেও হতগ্রাহ্য করা হোল?—আচ্ছা বাপু,—এই যে বইয়ের টেবিলটা আমার, এমনভাবে একঘরে করে রাখ্‌লি যেন জন্মেও ওটার আর দরকার হবে না, এর জন্যে একটুকুও টুঁ হুঁ আমি করছি? না বড় বোনের কায বলে—বিনা আপত্তিতেই সয়েছি, তুই-ই বল! তাপর,—সেই যে ভদ্রমহিলাগুলিকে নিমন্ত্রণ করা হোল,—তাঁরা আস্‌ছেন্ নিমন্ত্রণ খেতে, কিন্তু তাঁদের বস্‌তে দেবার ব্যবস্থা কি করলি? না, কার্পেট গেল,—ফরাস গেল,—আরামে বস্‌বার নরম-সরম গাল্‌চে ফুল্‌চে গেল,—উনি মেয়ে বন্দোবস্ত করলেন কি? না, পাথরের টেবিল ঘিরে কাটঠোক্‌রা চেহারার খানকতক চেয়ার সাজানো। এটা নিমন্ত্রিতদের বস্‌তে দেবার জায়গা হয়েছে, না ভূত নামাবার কেন্দ্র করা হয়েছে,—ঠিক করে বোঝাই কঠিন,—তত্রাচ বড় বোনের কায বলে আমি একটি কথাও বললুম না বলেছি?—তুই-ই বল, এই লক্ষণগুলো থেকে, বড় বোনকে হতগ্রাহ্য করা বোঝায় না, ভক্তিভরে চোখ বুজে গ্রাহ্য করাই বোঝায়?—"

সোফিয়া কোনও জবাব না দিয়া ক্ষণেকের জন্য নীরবে ফুল সাজাইল। তারপর পুনশ্চ খুব গম্ভীরভাবে বলিল "দ্যাখো, ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়ে দাঁড়াতে হবে,—তোমার লজ্জা না থাকে, নেই নেই,—কিন্তু আমাদের লজ্জা আছে, অপমান বোধ আছে। অন্ততঃ আমাদের খাতিরে ঐ শুষ্ক রুক্ষ চেহারাটা একটু সুদ্‌রে নাও—"

"তটস্থ হয়েই আদেশ পালন করছি, আহা! বড় বোনের হুকুম!" বেগম খুব ব্যস্ততার সহিত বাহির হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে বেগম তোয়ালে লইয়া হাত মুখ পরিষ্কার করিতে করিতে ঘরে ঢুকিল। সোফিয়ার উদ্দেশে বলিল "কি গো গিন্নি? এখনো ঘরের সাজান গোজন শেষ হয় নি?"

সোফিয়া কায করিতে করিতে সংক্ষেপে বলিল "উহুঁ—"

তোয়ালে রাখিয়া, আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুল পরিষ্কার করিতে করিতে বেগম নীরবে কিছুক্ষণ কি ভাবিল, তারপর ঈষৎ সংশয়পূর্ণ স্বরে—খুব অন্যমনস্ক ভাবেই বলিল "আচ্ছা সোফি, দুলা মিঞা এখনো ফেরেন নি, নয়! কবে ফিরবেন রে?—"

বেগম পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াই প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করিল, মুহূর্ত্তে সোফিয়া চমক ব্যগ্র দৃষ্টি তুলিয়া বেগমের দিকে চাহিল। আয়নায় বেগমের মুখের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল,—সোফিয়া চকিত কটাক্ষে দেখিয়া লইল,—সে মুখ সম্পূর্ণই নিরীহ সরলতা মাখা!—কোনও কপটতার চিহ্নই সেখানে নাই।—

আশ্বস্তভাবে মুখ নত করিয়া, গোপনে দু'চার বার ঢোক গিলিয়া, সোফিয়া একটু বিলম্বে উত্তর দিল,—"কবে ফিরবেন, তিনিই জানেন। কেন রে?—"

উন্মনাভাবে বেগম বলিল "এমন কিছু নয়। আজ কলেজ থেকে ফেরবার সময় গাড়ীটা তোদের ওদিক দিয়ে এল। তোদের বারেণ্ডায় দেখলুম, কে একটি ভদ্রলোক চেয়ারে বসে বই পড়ছেন,—আমি চম্‌কে গিয়েছিলুম, বুঝি দুলা ভাই!—তা'পর লক্ষ্য করলুম,—না তিনি নয়, গরদের চাপ্‌কান্ টাপ্‌কান পরা কে একটি পশ্চিমদেশী ভাই সাহেব টাই সাহেব গোছ মানুষ। বোধহয় কোনো মক্কেল বা বন্ধু টন্ধু হবেন, না?—"

বেগমের কথার আরম্ভেই সোফিয়া মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শেষ মন্তব্যটা শুনিয়া বিলক্ষণ স্বস্তিবোধ করিয়া,—একটু থামিয়া,—পরম নিরুদ্বেগে জিজ্ঞাসা করিল "তা হবে,—কি রকম চেহারা বল দেখি? খুব কুচকুচে কালো,—বেঁটে খাটো চেহারার মানুষ?—"

"না না, খুব ধব্ ধবে সুন্দর চেহারার মানুষ! হেঁট হয়ে বই পড়ছিলেন আমি শুধু ঘাড়টা দেখতে পেলুম। হাত দুটিও ফর্সা দেখলুম।—"

উৎকণ্ঠিত হইয়া সোফিয়া বলিল "মুখ দেখ্‌তে পাস্‌ নি?—গাড়ীর শব্দে মুখ তুলে চাইলেন তো নিশ্চয়? সে সময় ভাল করে দেখ্‌তে পেয়েছিলি তো? কি রকম মুখ বল দেখি? ঠিক তোর মত, সুন্দর মুখ তো?—"

ঈষৎ হাসিয়া বেগম সলজ্জ অনুযোগের স্বরে বলিল "তোর ঠাট্টাগুলো নেহাৎ বে-আড়া রকমে দাঁড়াচ্ছে সোফি! একটু ভদ্র-সমাজের ভাবা শেখ ভাই, দোহাই তোর!—অমন বে-আদবী করলে তোর সঙ্গে কথা বল্‌তে পার্‌ব না!—"

অতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া সোফিয়া পরম নিরীহভাবে বলিল "ঐ নাও! এটা বে-আদবী হোল? মানুষের মত মানুষের মুখের চেহারা থাকে না? সত্যি বল্‌ছি আমি একটি লোককে দেখেছি, ঠিক তোর মত মুখ!—এমন কি তার চুলগুলিও ঠিক তোর মত করে ফেরানো,—ঠিক অম্নি কালো অম্নি কোঁক্‌ড়ানো—ঠিক মেয়েদের মত! সে আমাদের ওখানে আসে—"

বাধা দিয়া ব্যঙ্গ স্বরে বেগম বলিল "তার নাম ও বোধহয় বেগম,—তার বোনের নাম বোধহয় সোফিয়া বিবি, আর দুলা মিঞার নাম বোধহয় আবু সাহেব, কি বল?—"

উদাসভাবে সোফিয়া বলিল: "বিশ্বাস না কর—নাচার!—আচ্ছা তোকে একদিন দেখিয়ে দেব, তা'হলে বিশ্বাস করবি তো? সত্যি বল্‌ছি বেগম, তোকে যদি সে লোকটার পাশে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়,—আহা—হা, লাফিয়ে উঠিস্‌ না!—এই কথার কথা বল্‌ছি,—কারুর সঙ্গে কারুকে 'কম্পেয়ার' কর্‌তে হোলে এ রকমটা কি বলা চলে না? তেম্নিই বল্‌ছি আর কি! নইলে সত্যি সত্যি কি তুমি কারুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে জোঁকা দিতে যাচ্ছ, না—সত্যি সত্যি কারুর হৃদয়াকাশে তুমি—চন্দ্র সূর্য্য—"

ব্যগ্র অধীর ভাবে, যোড় হাত করিয়া বেগম বলিল "দোহাই সোফি! 'বড়া বহিন্‌' বলে যথেষ্ট সহ্য করেছি,—আর নয়! আমি অকপটেই প্রাণ খুলে স্বীকার কর্‌ছি, কারুর হৃদয়াকাশে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারা হওয়া চুলোয় যাক,—একটা জোনাকী বলে পরিচিত হবার সখ ও আমার নাই! ও সব, তোদেরই মানায় ভাল,—তুই থাম! অন্ততঃ আমার সম্বন্ধে!—"

স্বগতঃ ভাবে সোফিয়া বলিল "বাবাঃ, মেয়ে তো নয়, যেন আস্ত কেউটে।—"

হাসিমুখে বেগম বলিল "তথাস্তু, তাও ভাল! অন্ততঃ তুই আমার বিষদাঁতকে একটু ভয় করে চল ভাই,—এই অনুরোধ,—এমন কি সকরুণ মিনতি পর্য্যন্ত!—এখন মাতৃ আজ্ঞাটা পালন করতে দাও,—এই নাও ড্রয়ার খুলে দিচ্ছি, কি কাপড় জামা পছন্দ কর্‌বার ইচ্ছা আছে, কর।"

সোফিয়া কোন উত্তর না দিয়া, খুব গম্ভীর ভাবে আসিয়া, জামা কাপড় নাড়িয়া চাড়িয়া, কালো রংয়ের জমির উপর বাদ্‌লা বসানো একস্যুট্ জামা কাপড় বাহির করিয়া, বিনাবাক্যে সাম্‌নে তুলিয়া ধরিল।

বেগম সভয়ে বলিল "সর্ব্বনাশ! এই রাত্রে বিজ্‌লী বাতির আলোয়, 'ঝিকি মিকি চোখ্ মিটিমিটি চায়' চেহারার, চক্‌মকে বাদ্‌লার সজ্জা! দোহাই বড় বহিন,—তোমার ছোটা বহিনের কসম্, একবার ভেবে দ্যাখে,—আমি কারুর বিয়ের নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছিনে,—আমার নিজের বাড়ীতেই আজ বন্ধুদের নিমন্ত্রণ! সুতরাং অত ঝক্‌মকে সজ্জা,—"

সোফিয়া সকোপে ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল "তাই যদি জানো, তবে আমায় পোষাক পছন্দ করতে ডাক্‌লে কেন? আমার—বড় বোনের মান্‌টা কোথা রইল শুনি?"

অনুনয় করিয়া বেগম বলিল "এই সাদা মল্‌মলের স্যুটটা পছন্দ কর ভাই, বেশ হাল্কা জিনিস। পেরে ছুটোছুটি করতে আট্‌কাবে না, জানিস্ তো ভাই কাযের দরকার।"

সোফিয়া সজোরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল "তোকে ছুটতেও হবে না, কারুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তেও হবে না,—সমস্ত কায আমি দেখে নেব। তুই শুধু—আমার কথা শুনে,—ঐটে পর।"

অপ্রসন্ন ভাবে কাপড়গুলা হাতে লইয়া, ক্ষুন্ন স্বরে বেগম বলিল "বাবাঃ! এ তো hostess'এর পোষাক নয়,—এ হচ্ছে বিয়ের ক'নের সজ্জা!—"

এতক্ষণের গাম্ভীর্য্যের আড়ম্বর ভূমিস্যাৎ করিয়া দিয়া—তরল কৌতুকের উচ্ছ্বাসে সহসা হো হো করিয়া হাসিয়া—সোফিয়া বলিল "খয়ের! খয়ের! ভগবান তোর মঙ্গল করুন বেগম! শুভক্ষণে বেশ কথাটি উচ্চারণ করেছিস্ আমি শুনে বড় খুশী হলুম!—"

আধা-হাসি, আধা-দুঃখ ভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া বেগম বলিল "তোমার কি বল-না? পরকে বাঁদর সাজাতে সবাইকারই মজা লাগে! দেখ দেখি কি বিশ্রী ছেলেমানুষের মত দেখাচ্ছে, যেন ভয়ানক ডেলিগেট্!—এ আমার ভাল লাগে না।"

"না, বেশ ডিগ্নিফাইয়েড দেখাচ্ছে, ঘাব্ড়াচ্ছিস্ কেন? আমার বেশ ভাল লাগ্ছে। আচ্ছা, এখন হাত পা ছড়িয়ে বসে বসে জিরো, গাড়ি তৈরী হলেই তোকে ডেকে পাঠাব।"

"বস্তে আর পারিনে, একটু শুই।—গাড়ী ঠিক হলেই খবর দিস্।"—বেগম শুইল। সোফিয়া চলিয়া গেল।

(১০)

সারাদিনের পর, পরিশ্রম-ক্লান্ত পেশীগুলিকে একটু ঢিলা হইবার সুযোগ দেওয়া মাত্র—তাহারা একেবারেই যেন—এলাইয়া পড়িল। বেগমের অত্যন্তই ঘুম আসিতে লাগিল।

দশ মিনিট—পনের মিনিট—ক্রমে কুড়ি, পঁচিশ, ত্রিশ মিনিট কাটিয়া চলিল, তবুও গাড়ী সম্বন্ধে কোন সংবাদ আসিল না। এ দিকে বেগমের শ্রান্ত-অলস দেহের উপর তন্দ্রার ঝোঁক্টা ক্রমেই রীতিমত ঘণীভূত হইয়া, গভীর আরামদায়ক নিদ্রার আয়োজন বিছাইয়া দিল। —গাড়ীর খবরের প্রতীক্ষায় কাণ ও মন সজাগ রাখিতে রাখিতে শেষে এক সময়—দিব্য নিশ্চিন্ত হইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

কতক্ষণ পরে কে জানে,—সহসা কানের কাছে মিহি মোলায়েম সুরে সোফিয়া ডাকদিল " ওরে—উঠ্-না। আর কত ঘুমবি? "

বেগমের ঘুম চির দিনই খুব সজাগ; শব্দটা কানে পৌঁছিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু ঘুমের আরাম নেশাটা না কি তাহাকে নিতান্তই পাইয়া বসিয়াছিল, তাই,—গা-ঝাড়া দিয়া উঠিবার চেষ্টায় কিছু মাত্র উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া, তন্দ্রালস জড়িত ঢুলু ঢুলু চক্ষে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল "গাড়ী?—হোল গাড়ী?"

ব্যাঙ্গস্বরে উত্তর হইল " হয়েছে, ওঠো! আর বেশী ঘুম ভাল নয়! "
দুহাতে চোখ রগড়াইয়া, মুহূর্তে পূর্ণ সজাগ ভাবে উঠিয়া বসিয়া বেগম বলিল " চল, আমি তৈরীই আছি। "

কিন্তু পরক্ষণেই সে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল,—ঘরখানা উজ্জ্বল বাতির আলোয় ভরিয়া গিয়াছে! সামনে সোফিয়া দাঁড়াইয়া, অকুতোভয়ে মন্দ মধুর—দুষ্টামীভরা হাসি হাসিতেছে! –

বেগম অবাক্ হইয়া গেল! পাশের খোলা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, স্নিগ্ধোজ্জ্বল সন্ধ্যা জোৎস্নার আলোয় বহির্জগৎ পরিপ্লাবিত হইয়া গিয়াছে! অধিকতর বিস্মিত হইয়া,—বোধ করি নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে না পারিয়াই,—সে আবার বিমূঢ়ের ন্যায় ঘরের দেয়ালের আলোটার দিকে চাহিল। তার পর নিজের সসজ্জ দেহের পানে চাহিয়া,—হতবুদ্ধি হইয়া বলিল " কি হোল রে সোফি? তাঁদের নিমন্ত্রণ করা ··? এ যে সাঁঝ পার হয়ে গেছে দেখ্‌ছি!

অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া গভীর অবজ্ঞার স্বরে সোফিয়া বলিল ' তা তোমার যেমন কাযের ছিরি। সাধে বলি, তোর দ্বারা সংসারের একটা উপকারের আশা নেই! সারাদিন 'দস্যি-বিত্তি' করে, অবেলায় ঘুম! লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, তা হুঁস-ই নেই,—এতক্ষণে ঠেলে জাগিয়ে দিলুম কি না, তাই 'কি হোল রে সোফি?' সোফি আপ্যায়িত হয়ে গেল আর কি!– "

সমস্ত ভর্ৎসনাটুকু নিঃশব্দে পরিপাক করিয়া, বেগম, উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিল " নিমন্ত্রণের কি হোল?"

"আর মায়া কান্নায় দরকার নেই, থামো। এখন তোমার যে লোক-লৌকিকতার কতখানি আঁতের টান্ সে খুব বোঝা গেছে, আর গিন্নিপণার বহর দেখিও না। এখন তোমার চাবের পিণ্ডী গিলে নিয়ে, তাঁদের একটু অভ্যর্থনা কর্‌তে পার্‌বে? না, বল,—তাতেও ঘুম পাচ্ছে!"

"অভ্যর্থনা! তা হলে আমার নিমন্ত্রণের ফাঁড়াটা উৎরে গেছে বল? কে গিয়েছিল, তুই?"

অত্যন্ত ব্যস্ততা জানাইয়া সোফিয়া বলিল " সে যেই-যাক্। তুই চট্ করে হাত মুখ ধুয়ে চা খেয়ে ঠিক হয়ে নে, ঐ তাঁরা এলেন বলে। গাড়ীর শব্দ হচ্ছে বোধ হয়।"

কিন্তু সে 'বোধহয়'টার বাস্তবপক্ষে কোন মূল্য আছে কি না, সেটা পরীক্ষার জন্য কাণ খাড়া করিয়া দাঁড়াইতে বেগমের আর মোটেই সাহস হইল না। একজন দাসী তাহার চায়ের পাত্র লইয়া ঘরে ঢুকিতেছিল, বেগম তাহার পাশ কাটাইয়া ত্রস্তে পাশের স্নানাগারে গিয়া হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া—বিনাবাক্যে চায়ের পেয়ালা উপুড় করিয়া পুনশ্চ দাসির হাতে ফেরৎ দিল নিমন্ত্রিতারা কেহ আসিলেন কি না, সংবাদ জানিবার জন্য বেগম দাসীকে বলিল, দাসী চলিয়া গেল।

সোফিয়া তখন আলোর সামনে দাঁড়াইয়া, একমনে নিজের কাঁধে একটা সেফ্‌টিপিন্ আটকাইতেছিল। বেগম রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে,—তাহার নিকটে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া—জোর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া, হাসি হাসি মুখে বলিল "তারপর, সোফিয়া বুবু সাহেবা, এবার "মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা।"—কিছু মধুর বচন বর্ষণ কর।"

গম্ভীর মুখে সোফিয়া বলিল "তা বটে, এখন আমিই 'তোমার মরণ' হয়ে দাঁড়াব বৈ কি! হুঁ! ভালর কাল নেইরে, 'যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর্!"

"তত্ত্বা! ও সব পুরোণো কাসুন্দীগুলো হাঁড়িতে সরা চাপা রেখে দাও,—নতুন কিছু ততক্ষণ আম্‌দানি কর না।"

সোফিয়া গম্ভীর দৃষ্টি তুলিয়া সুগম্ভীর মুখে বলিল "নতুন কিছু কি আমদানি করতে হবে, শুনি? 'তোমার হৃদয় দ্বারে প্রেমার্ত্ত অতিথি' টতিথি বলে, ঐ ভাব্যযুক্ত মূর্ত্তিখানির পায়ের কাছে কেঁদে-কোকিয়ে লুটোপুটি খেতে হবে, না কি করতে হবে, বল?"

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া,—সলজ্জ স্মিত মুখে বেগম বলিল "হুস্নির মতই খাট্টা হয়ে উঠেছিস্ যে!"

"কেনই বা উঠ্‌ব না? তুমি নিশ্চিন্দি হয়ে তোফা আরামে ঘুমুবে, আর তোমার পাপের ভোগ ভুগ্‌তে, আমায় জুনীয়া টহল দিয়ে বেড়াতে হবে!—রাগ ধরে না?"

"আহা চটিস্ কেন? পরোপকার ব্রত,—মহা পুণ্যময়-রে, মহা পুণ্যময়! পরকালের কায হচ্ছে।—"

"আর এ দিকে ঐ ইহকালের কায, সিঁড়িতে—ঐ শোন জুতোর শব্দ !—এখন দয়া করে, একটু এগিয়ে গিয়ে, ওঁদের অভ্যর্থনা করে আনতে পারবে ? না, বলো,—তার জন্যেও এই 'ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো' সোফি আছে !"

"আহা বালাই বটে !—" হাত বাড়াইয়া সোফিয়ার চিবুক স্পর্শ করিয়া, নিজের আঙুলে চুমা খাইয়া বেগম প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে স্নেহ গদ গদ কণ্ঠে বলিল "ও কথা বলতে আছে ? তুমি যদি ছাই ফেলবার ভাঙা কুলো হও,—তবে মুড়ো খ্যাংরা হবে কে ?"

বিধাতার কি অভিশাপ ছিল কে জানে,—সোফিয়ার গাম্ভীর্যটা যখনই হিমালয় পাহাড়ের মত অভ্রভেদী হইয়া উঠিত বেগম তখনিই এক ঘায়ে তাহাকে ভাঙিয়া চুরমার করিত !—প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও সোফিয়া দৌর্ব্বল্য সামলাইতে পারিল না,—ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া,—টুক্ টুক্ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া, বলিল "আচ্ছা, আচ্ছা ! বড় 'হিম্বেব' বেড়েছে ! এই মুড়ো খ্যাংরাই কেমন-না তোমার বিষদাঁত ভাঙে, তা দেখে নিও !—"

সিঁড়িতে শব্দ তখন প্রবল হইয়াই উঠিয়াছিল। প্রত্যুত্তরের চেষ্টা না করিয়া বেগম দ্রুত বাহির হইয়া গেল। সোফিয়া উদাসীন ভাবে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া, সুদীর্ঘ স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল "আঃ !"

বিশ্বস্ত-নির্ভীক চিত্তে, শশব্যস্তে সিঁড়ির দুয়ার পার হইয়া হাস্যোৎফুল্ল মুখে অভ্যর্থনায় অগ্রসর তরুণীটি,—কিন্তু হঠাৎ অবাক্ হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। সিঁড়ির উজ্জ্বল আলোয় যে তিন জন আগন্তুকের মূর্ত্তি তাঁহার চোখে পড়িল, তাহাতে সদ্যঃ ঘুম ভাঙা মগজটার অবস্থা—অকস্মাৎ অতি শোচনীয় হইয়া উঠিল ! সংশয়-কুণ্ঠিত স্বরে বেগম নিজের অজ্ঞাতেই বলিয়া উঠিল,—"আব্বা ! আপনি ?"

দুইটি ভদ্রলোকের সঙ্গে নিম্নস্বরে কথা বলিতে বলিতে পিতা উপরে উঠিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গী দুইটি পিছনে আসিতেছিলেন, বেগম তাঁহাদের চেহারা ভালরূপ দেখিতে পাইল না। শুধু—অনুমানে বুঝিল, বাড়ীর কেহ নয়—বাহিরের লোক। কিন্তু তাহাতেও সংশয় জাগিল,—বাহিরের লোক বিনা সংবাদে বাড়ীর মধ্যেই বা আসিবেন কিরূপে ?

কন্যার প্রশ্নে পিতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। সংযতস্বরে বলিলেন 'কে বেগম ? হাঁ মা, আমরা আসছি, সোফিয়া কোথা গেল ?"

ঠিক,—সেই সময় পিছনের লোক দুইটি সিঁড়ির দেওয়াল-বাতির সামনে আসিয়া পড়িলেন। নিদারুণ সংশয়-উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিয়া, লোক দুটির আপাদমস্তক বেগম এবার সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল!———সর্ব্বনাশ! এ যে সোফিয়ার স্বামী, এবং সোফিয়দের বারেণ্ডায় বৈকালে-দেখা সেই গরদের পোষাক-পরা পশ্চিম-দেশীয় ভদ্রলোকটি!—পিতা, এ করিলেন কি? কোনও সংবাদ না জানাইয়া হঠাৎ ইহাদের কোথায় আনিলেন?

……বেগমের পলাইবার পথ যে এখন কোন দিকেই নাই!

পিতার প্রশ্নের উত্তর দিতে ভুলিয়া গিয়া, বেগম ঘাড় গুঁজিয়া, প্রাণপণে দেওয়াল-ঠাসা হইয়া দাঁড়াইল। অভিপ্রায়—পিতা অন্যমনস্ক হইয়া সঙ্গীদের সহিত কথা বলিতে বলিতে একবার আগাইয়া যান ত! তারপরই মুক্ত সিঁড়ি-পথে সে নিঃশব্দে দ্রুত, অন্তর্দ্ধান করিবে।

কিন্তু হিতে বিপরীত ঘটিল। বেগমকে তেমন ভাবে সঙ্কোচ-আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া,—সেই সম্পূর্ণ অপরিচিত পশ্চিম দেশীয় ভদ্রলোকটি, সকলের পিছনে থাকিয়াই, সহসা ঈষৎ অপ্রস্তুত ভাবে দাঁড়াইয়া পড়িলেন! পিছনের সিঁড়ির দিকে চাহিয়া,—বোধহয় ফিরিবেন কি না ভাবিয়া, কুণ্ঠিত ভাবে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

চকিতে—সামনের কন্যার ও পিছনের সঙ্গীর কুণ্ঠা বিপন্ন অবস্থার দিকে পিতার দৃষ্টি, পড়িল! মুহূর্ত্তে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া—সঙ্গীর উদ্দেশে স্নেহময় স্বরে বলিলেন "উঠে এস বাবা তুমি আবার দাঁড়াচ্ছ কি? তোমরা ঘরের ছেলে,—উঠে এস।"

বিনীতভাবে লোকটি বিনাবাক্যে নতশিরে ফিরিয়া আবার অগ্রসর হইলেন। মুহূর্ত্তে—লোকটির কাঁধের উপর ঝুঁকিয়া সোফিয়ার সেই বাচাল-মুখর উকীল স্বামীটি—চুপি চুপি কি যে গোপন-রহস্য প্রকাশ করিলেন, বেগম কিছুই বুঝিতে পারিল না।—কিন্তু ভয়-চকিত কটাক্ষে চাহিয়া দেখিল,—অপরিচিত লোকটি অত্যন্তই অপ্রস্তুত বিপন্নভাবে মুহূর্ত্তের জন্য মুখ তুলিয়া, সোফিয়ার স্বামীর দিকে সলজ্জ-অনুযোগভরা মৃদু-ভৎর্সনার কটাক্ষ হানিলেন। তারপর হেঁট হইয়া যেমন উঠিতেছিলেন, তেমনিই উঠিতে লাগিলেন।

অপরিচিত লোকটি যে কৌতূহল বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলিয়া,—কটাক্ষঘাতে তাহাকে উত্যক্ত করিলেন না,—ইহাতে বেগমের অন্তরাত্মাটা বড় কম স্বস্তি কৃতজ্ঞতা বোধ করিল না!—কিন্তু নিজেদের ঘরের লোক,—ঐ সুপরিচিত উকীল ভগিনীপতি-মহাশয়ের নষ্টামী……..?

হায় ভগবান! মনে যতই দুঃখ জাগিয়া উঠুক,—রাগ অভিমান প্রকাশের পথ যে এখানে একেবারেই নাস্তি! অন্যথা.........!

অনেকখানি সঙ্কুচিত হইয়া, পিছনের অন্ধকারের আড়ালে, নিজেকে গোপন করিবার ব্যর্থ চেষ্টায়, বেগম যথাসাধ্য মাত্রায় পিছু হটিয়া,—খুব কোণ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল।

পিতা অগ্রসর হইয়া বিনা-ভূমিকায় বেগমের হাতটি ধরিয়া,—শান্ত স্বরে বলিলেন "এস, আমাদের সঙ্গে।"

বেগমের বিচলিত অন্তঃকরণটা এবার সম্পূর্ণই বিদ্রোহ বিচলিত হইয়া উঠিল! বিস্ময় ব্যাকুলতামাখা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলিয়া সবিস্ময়ে পিতার মুখ পানে চাহিল,—তিনি এ কি অদ্ভুত আদেশ করিতেছেন? এমন ভাবে,—বিদেশী অতিথির আতিথ্য অভ্যর্থনার ক্ষেত্রে বেগম কি কখনও দাঁড়ায়াছে? আর এ কি প্রথা বিগর্হিত ব্যাপার?

কিন্তু পিতার বদনমণ্ডল সম্পূর্ণই শান্ত গম্ভীর। বেগমের মত—অবেলায় ঘুমাইয়া কাঁচা-ঘুম ভাঙ্গা মগজে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া, তিনি পৃথিবীটার, আদব-কায়দা পরিবর্তনের শোচনীয় দুর্গতি লক্ষ্য করিয়া বিশেষ কিছু শঙ্কিত বা চিন্তিত হইয়াছেন, এমন কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

সংশয়ে হতবুদ্ধি বেগম ভাবিল,—হয় সে ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে,—নয়, তাহার বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে! নচেৎ সকলেই এমন অভাবনীয় ভাবান্তর কেন?

পিতার আদেশটা যত বড়ই অস্বস্তিদায়ক হউক,—সে আদেশটা এড়াইবার চেষ্টা ততোধিক অস্বস্তিবর্দ্ধক; সুতরাং মনের দুঃখ মনেই রাখিয়া মাথা হেঁট করিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিতেই হইল। মনে মনে, বড়ই ক্ষোভ বোধ হইতেছিল,—হায় পিতা যদি জানিতেন, এই ভগিনীপতিটির সহিত বেগমের সৌহার্দ্দ্য কতখানি গভীর মিষ্টতাভরা,—তাহা হইলে কি সম্পর্কের খাতিরে বেগমের উপর এরূপ আদেশ জারী করিতেন? আর ওই অচেনা লোকটির সামনে বাহির হওয়া? ....এটা তো সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলিয়াই,—বিনা দ্বিধায় আপত্তিযোগ্য; তবু পিতা এ কি করিলেন?

ঘরের দুয়ারের কাছে পৌঁছিয়া সামনেই সোফিয়াকে দেখিয়া—বেগমের হঠাৎ মনে পড়িল, তাহার উপস্থিতি সংবাদ; অপ্রত্যাশিত ঘটনা বিপ্লবে বেচারা এতক্ষণ সোফিয়ার

কথা আদৌ স্মরণ রাখিতে পারে নাই ! এবার তাহার মূর্ত্তিটা চোখে পড়িবামাত্র অনেকখানি আশা ভরসায় উৎসাহিত হইয়া—ব্যগ্র আপত্তির সুরে বলিয়া উঠিল,—"এখানে বুবু সাহেবা রয়েছেন যে"।

এতখানি সম্মানজনক সম্ভাষণে আপ্যায়িত হওয়া সোফিয়ার ভাগ্য কোনদিনই ঘটে নাই। নিতান্তই পিতার খাতিরে বেগম এত বড় দুর্লভ অনুগ্রহটা সোফিয়ার ঘাড়ে বর্ষণ করিল মাত্র কিন্তু অকৃতজ্ঞ সোফিয়া মহোদয়া,—এত দূর নিষ্ঠুর অকৃতজ্ঞ—যে-মুহূর্ত্তে সসৌজন্যে চেয়ার ছাড়িয়া, মাথায় একটু কাপড় টানিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, —দিব্য সংযত নির্ভীক স্বরে, অম্লানবদনে বলিল "তা থাকলুম-ই বা ; তাতে তোমার আপত্তি কি ?—"

পিতা হাস্যোজ্জ্বল মুখে একবার সোফিয়ার দিকে একবার বেগমের দিকে চাহিলেন, তারপর সে কথার কোন সায় উত্তর না করিয়া,—পিছনের আগন্তুকদ্বয়ের উদ্দেশে চাহিয়া বলিলেন, "এস বাবা তোমরা এস।"

বেগম একেবারেই বাক্যস্ফূর্ত্তিহীন হইয়া গেল !

পিতা স্বহস্তে চারিজনের জন্য, চারখান চেয়ার সরাইয়া দিলেন।—সোফিয়া গৃহিণীপণা করিয়া,—তটস্থভাবে বেগমকে টানিয়া নিজের এবং স্বামীর চেয়ারের মাঝের চেয়ারখানিতে এমন ভাবে ঠেলিয়া বসাইল, যেন—বেগমকে সেই টেবিলের অন্যদিকে উপবিষ্ট অপরিচিত যুবকটির ঠিক সামনেই থাকিতে হয়, এবং দৈবাৎ উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করিলে যেন,—ডান বাঁয়ে দুই যুগলমূর্ত্তির একজনকে ঠেলিয়া সরাইয়া ভিন্ন যাইবার পথ না পায় ?

পিতা—সেই অপরিচিত ব্যক্তির পাশের চেয়ারখানায় বসিয়া হাস্য মুখে বলিলেন "এবার তোমাদের পরিচয়টা করিয়ে দিই।—মনু, তুমি তোমার ভাবীসাহেবাকে তো চেনই,—ওটি তারই ছোট বহিন্ বেগম।—আর বেগম, আবুর পরিচয় তোমার জানানো নিষ্প্রয়োজন,—এ ছেলেটি আবুর ভাই মাণিরুদ্দীন। আমরা ফেরবার সময় ওঁকে এলাহাবাদ থেকে ধরে এনেছি, উনি দিনকতকের জন্যে আমাদের এখানে বেড়োতে এসেছেন।—"

সটান্ আকাশ হইতে একটি শব্দহীন বজ্র আসিয়া যেন,—হঠাৎ বেগমের মাথায় পড়িল —হায় কি নিষ্করুণ ষড়যন্ত্র !—তাই সোফিয়ার এত বিক্রম ! তাই............বাবা পিতা

……অধিক কি, ঐ বাচাল ভগিনীপতিটির পর্য্যন্ত, এতখানি বিস্ময়াবহ ভাবান্তর……বিশেষ করিয়া সোফিয়ার আচরণ স্মরণে বেগমের যেন কান্না আসিতে লাগিল ; হায় সে কি না স্বচ্ছন্দে গালে চড়াইয়া বেগমকে না হক্ মিথ্যা বচনে ভুলাইয়া বোকা বানাইয়া—বিনা দ্বিধায় এই জমকালো পরিচ্ছদে সাজাইয়াছে ? এখন এই পরিচিত অপরিচিতদের সামনে, মাথা তুলিতে যে লজ্জায় মাথা কাটা যাইতেছে, কি অনর্থ।—

বেগম ঘামিয়া উঠিল ! আরক্ত মুখে কোনমতে মাথা ঝুঁকাইয়া, হাত তুলিয়া নিঃশব্দে অভিবাদন পর্ব্বটা শেষ করিয়া লইল ! প্রত্যুত্তরে কেহ তাহাকে সম্মান জানাইল কি, না জানাইল, সেটা চাহিয়াও দেখিল না। প্রাণপণে টেবিলের দিকে দৃষ্টি সংযত করিয়া নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল।

দুই চারিটা সময়োচিত কথা বলিয়া, নবাগত আগন্তুকের উদ্দেশে সস্নেহ শিষ্টাচার জানাইয়া, পিতা বলিলেন,—"এরাঁ তা' হলে, এখানে রইলেন। সোফা তুমি দেখো। আবু তুমি যেন ময়ূকে একা ফেলে পালিও না বাবা, নীচের ভদ্রলোকগুলিকে দেখতে চল্লুম, তোমরা গল্প-সল্প কর। বেগম, তুমিও এইখানে থাক।"

বেগম মাথা হেঁট রাখিয়াই উৎকর্ণ হইয়া শুনিল,—আবু সাহেব এবং সোফিয়া,—দুই 'মাণিক যোড়"ই সমান উৎসাহে ব্যগ্র-তৎপরতা জানাইয়া আতিথ্যসৎকার ভার গ্রহণ করিল। বেগম মনে মনেই বলিল শরীর জুড়াইল আর কি !

ক্রমশঃ—

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

স্পর্শ

চোখ দুটী মুদেছিনু
　　তন্দ্রায় মরি,—
একি সুখ-হিল্লোলে
　　মন ওঠে ভরি' !
　প্রাণের গোপন-দেশে,
　কি আবেশ মেশে এসে ?—
অচেতন দেহ তোলে
　　সচকিত করি !
বাতায়নে এলো কি গো
　　দক্ষিনা-বায় !
নিরালায় ফুলবাস
　　এসে পৌঁছায় ?
　পাটল-বরণ সাঁঝে,
　বুঝি রে বেহাগ বাজে,—
জাগে এ কি অন্তরে
　　তড়িৎ লহরী ?

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র ।

দেশীয় রাজ্য।

-:০:-

(৪)

যে বৎসর মহীশূর রাজ্যের নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য যাই, সে বৎসর অনেক বন্ধুর উপদেশ মত মান্দ্রাজ পথে যাইতে হইয়াছিল এবং ফিরিবার সময় বোম্বাই পথে রাজপুতনা হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করি বন্ধুবরের উপদেশ মত একজন দাক্ষিণাত্যের ছাত্রকে সঙ্গে লইতে হইয়াছিল পথ-প্রদর্শক রূপে। এই ছাত্রটী মহীশূর রাজ্যবাসী। কাজেই আমার বেশ সুবিধা হইয়াছিল। রেল পথে বিশ্রাম্ভালাপের মধ্যে বুঝিতে পারিলাম তিনি একজন আধুনিক কালে যাহাকে বলে Extremist (চরমপন্থী) দলের লোক। তখন ছিল India for Indians (ভারতবর্ষ ভারতবাসীর জন্য) ভারতবর্ষের চরমপন্থী দলের বুলি। আর এই ছাত্র বন্ধুটী কেবলই বলিত Mysore for Mysorean (মহীশূর রাজ্য মহীশূরবাসীর জন্য), বাচ্চা টিয়া পাখীর মত কেবলই ঐ বুলি কপচাইত এবং মহীশূরের দেওয়ান সার্ শেসাদ্রিয়ায়ার K. C. S. I. স্বনামধন্য পুরুষের শ্রাদ্ধমন্ত্র আওড়াইত। মান্দ্রাজে পৌঁছিয়া ঐ ছাত্র বন্ধুর অনুরোধে একটী প্রসিদ্ধ মান্দ্রাজী সার্কাসে যাই। তথায় দেখিলাম সেই ঘোড়ার খেলা। তবে এখানে এই তফাত ছিল যে সর্ব্বোপরি একজন অভিনেত্রীর কাঁধে একটী বালক ডিগ্‌বাজি করিতেছে। তখন আমার মনে পড়িল Maxmuller কৃত "Auld Lang Syne" বহির কথা এবং তাহার মর্ম্মান্তিক সমালোচনার বিষয়। বেশ বাজি করিতেছিল, আমি চিত্রার্পিতের ন্যায় দেখিতে ছিলাম এবং মনে হইয়াছিল যে কথা, সে কথা আমার এই ছাত্র বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম। 'এই যে ঘোড়ার বাজি দেখিয়া represent করে কি তুমি বলিতে পার? ছাত্র বন্ধুটী অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইতে ছিল।. খানিকক্ষণ পরে উত্তর ছিল, "আমি আপনার কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না।" তখন আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম 'এই ঘোড়াগুলি বর্ত্তমান ভারতবর্ষ এবং এই প্রধান অভিনেতা হচ্ছে ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট। সর্ব্ব উচ্চ শিরে যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেটী আছে, মেয়ে লোকের কাঁধে চড়িয়া সে হচ্ছে দেশীয় রাজ্য। আর

মাঝে মাঝে ঐ ছেলেটা ডিগবাজি খেলিতেছে তাহা হচ্ছে বর্ত্তমান উন্নত দেশীয় রাজ্যগুলি।' বেচারি আমার কথা কিছুই বুঝিল না। বাড়ী ফিরিবার সময় চন্দ্রালোকে মান্দ্রাজের Harbour (পোতাশ্রয়) দেখিতে গেলাম। গরম ছিল অত্যন্ত। কিন্তু সামুদ্রিক হাওয়ায় শরীর শীতল হইতেছিল এবং আমাদের আলাপ প্রলাপ চলিতেছিল অনেক ঘণ্টা পর্য্যন্ত। তখন তাহাকে বলিয়াছিলাম "মনে কর দেখি যদি হঠাৎ এই ঘোড়ার খেলা বিপদগ্রস্ত হইয়া পরে তখন এই খেলার মধ্যে ঐ বালকটীর জীবন সংশয় হইবে নিশ্চয়।" তখন আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম তুমি একজন মহীশূরবাসী, Representative assembly পাইয়াছ। Sir Sheshadrier এর পদপ্রান্তে বসিয়া দেশীয় রাজ্যের রাজনৈতিক আলোচনা কর কয়েক পুরুষ পর্য্যন্ত। ফলে হয় ত সময়ে তোমরা Parliament এর মত ক্ষমতা পাইতে পার। কিন্তু Mysore for Mysorean এই উক্তিটী চিরকালের জন্য পরিত্যাগ কর।" ইহা ২২ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সৌভাগ্য বশতঃ লেখক ত্রিপুররাজ্যের সহিত মহীশূর রাজ্যের কোন ঘটনায় পড়িয়া Sir Sheshadrier এর সুনজরে পড়িয়াছিল। আমি তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এ সূত্রেই আমি তথাকার রাজ-উদ্বাহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। কাজেই এই যাত্রায় 'রথ দেখা কলা বেচা' উভয় কার্য্য আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। এ উপলক্ষে আমি কয়েক জন রাজা ও রাজপ্রতিভূগণের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিতে পারিয়াছিলাম; সে কথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমার পক্ষে ইহা তীর্থ যাত্রার মত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র বৃহৎ কয়েকটী রাজ্যে গতিবিধি করিতে পারিয়াছিলাম। সৌভাগ্যের বিষয় এখন পর্য্যন্ত ঐ বন্ধু মহল আমার ভাগ্যে খোলা আছে। এখনও তাঁহাদের সহিত পত্রাদি দ্বারায় সূত্র রাখিতে সক্ষম হইতেছি। বিগত দুই দিল্লীর দরবারে ইহাদের দর্শন স্পর্শন সুখ পাইয়াছিলাম। কাজেই অল্প বিস্তর তাঁহাদেরই কথা বার্ত্তা লইয়া এই প্রবন্ধের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিয়াছি। পাঠকগণ মনে রাখিবেন এই প্রবন্ধগুলি আমারই স্বপ্ন লব্ধ প্রসঙ্গও হইতে পারে। হয় ত ইহা নিদ্রোত্থিতের কথা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ভুল ভ্রান্তি অনেক থাকিতে পারে। কিন্তু ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতি আমার যে ভক্তি শ্রদ্ধা তাহা দিন দিন বাড়িতেছে বই কমিতেছে না।

এক্ষণে প্রাসঙ্গিক কথার—অবতারণা করিতে চাই। যদি বিধাতা তেমন ঘটায় তখন এসব দেশীয় রাজ্যগুলি কি সমস্ত ভারত শাসন করিতে সক্ষম হইবে ? এবং বর্ত্তমান সময়ে দেশীয় রাজ্যগুলির নরপতিগণ সেজন্য প্রস্তুত আছেন কি ? আমার কিন্তু সন্দেহ হইতেছে যে, দেশীয় রাজ্যের শাসনকর্ত্তাগণ এখনও মণ্টেগু ও চেম্‌স্‌ফোর্ড্‌ প্রদত্ত রিফর্ম গভর্ণমেণ্টকে আকাশকুসুমই ভাবিতেন। ইহা অবশ্য সত্য যে Advanced এবং Model রাজ্যের রাজাগণকে ছাড়িয়া দিলে বহুসংখ্যক রাজ্যের রাজাগণ এখনও নিজ নিজ গণ্ডী ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক। ইহারা ইংলণ্ডের রাজার রাজভক্ত এবং তাঁহার উপর কায়মনোবাক্যে নির্ভর করিতেছে। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে আজও দেখা যাইতেছে কোন রাজ্যে জনৈক ইংরেজ প্রধানকর্ম্মচারী পরিদর্শনার্থ যাইবার সময় অতি বৃষ্টির দরুণ রাস্তার নিকটবর্ত্তী লোকালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া সে ঘরটাকে পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। "এমনই গোঁড়া হিন্দু" একথা জনৈক ইংরেজ কর্ম্মচারীর পুস্তকে উল্লেখ আছে। সৌরাষ্ট্রীয় ও কাথিওয়ার অনেক রাজ্যে এখনও বিলাতি মদ পর্য্যন্ত পান করে না। গৃহে চুয়ান মৌয়ার প্রস্তুতি মদ তাহাদের পানীয়। এ আচরণ দেখিয়া আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জনৈক বন্ধু রাজা উদরে হাত দিয়া বলিয়াছিলেন 'শির হইতে হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত ইংরেজকে দিয়াছি। কিন্তু উদরটাকে কিছুই দিতে পারি না।' কোন দেশীয় রাজ্যের Residencyতে রাজপুত সিপাহী পাহাড়ার কার্য্য করিতেছিল। এই ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিল "৮৲ টাকা পাইয়া আমি সিপাহীর কার্য্য করিয়া বক্ষস্থলে ইংরেজের বিরুদ্ধ গুলি খাইয়া মরিতে পারি কিন্তু ইংরেজের স্পর্শিত জল স্পর্শ করিতে কখনও রাজি হইতে পারি না।" প্রবন্ধ বাড়িয়া যায় এজন্য এসব কথা পাড়িয়া অবান্তর কথা বলিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলি সকলই ভাবপ্রবণ দেশ। Sentiments ত্যাগ করিতে পারে না এবং চায় না। ইহাও তাহারা জানে এবং মানে যে Sentiment rules the world যদি তাহা না হইত তাহা হইলে পবিত্র চিতোর নগরী অদ্য পর্য্যন্ত সমস্ত জাতি মাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিত কি ? এহেন Sentiment বজায় থাকিতে নব্য তন্ত্রের সব বিষয়ই তাঁহারা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক বরং তাহার গোড়া আঁকড়াইয়া আছেন। নব্য Chembers of the Princesকে লইয়া যত নাড়াচাড়া হইতেছে

এবং রকম বেরকমের গাম্ভীর্য্য পূর্ণ ভাব দেখান হইতেছে তথাচ অনেক ভারত নৃপতিকুল সে কূলে কিছুতেই যাইতে চায় না। তাহার কারণ Sir Valentine Chirol বিলাতের 'Time' পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন বিশদ ভাবে এবং পরিষ্কার রূপে তিনি বলিতেছেন :—

"Disguise it as one may the creation of a Council of Princes is a hazardous attempt to harness the most conservative forces in India to the new State chariot side by side with the democratic forces embodied in an elected Indian Legislative Assembly." কারণও যথেষ্ট দিয়াছেন।

"Some still very conservative and almost medieval, some on genuinely progressive lines, some with a mere veneer of European modernity, are all equally jealous of their rights and their dignity. The Native States cannot, however, live wholly water-tight compartments. They are all more or less directly affected by what goes on in British India just across their often very artificial boundaries. Their material interests are too closely bound up with those of their British Indian neighbours."

যে সব বাধা অগ্রবর্ত্তী রহিয়াছে সে বিষয় Chirol সাহেব নির্দ্দেশ করিতেছেন।

"But the creation at this juncture of a Council of Princes as an organic part of the new scheme of Constitutional Government raises very different issues. In the first place, though it has been engineered with great skill and energy by a small group of very distinguished Princes, mostly Rajput, it has received no support at all from other and more powerful Princes, such as the Nizam of Hyderabad, the Gaekwar of Baroda, and the Maharaja of Mysore."

গতবার Duke of Conought এই Chembers of Prince এর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সে সময় হঠাৎ কলিকাতা বাসায় বসিয়া Telephone পাইলাম আমার জনৈক বন্ধু ব্যক্তি His Highness কলিকাতায় উপস্থিত। Club হইতে খোঁজ লইয়া আমার বাসার ঠিকানা পাইয়াছেন। তাই তিনি আনন্দ এবং উৎকণ্ঠিত ভাবে আমাকে দেখিতে প্রতীক্ষা করিতেছেন। তের বৎসর পর দেখা। গাঢ় আলিঙ্গনের সহিত আমাকে নিজের কাছে টানিয়া লইলেন এবং জানিতে দিলেন, দিল্লীতে আজ Duke of Conought দরবারে বসিবেন। তিনি কম দরের লোক। এত অধিক দরের লোক উপস্থিত থাকিতে তাঁহার অনুপস্থিতিতে দরবারের কোন ক্ষতি হইবে না পরন্তু—

'পয়সা দেকে জুতি খানা—
এ'সা দরবার মে নেই জানা।'

তাই তিনি ডাক্তারের উপদেশ মত কলিকাতা চলিয়া আসিয়াছেন এবং বড় বাজারের সন্নিকটে বাসা লইয়াছেন। আশা করেন এ যাত্রা মুক্তার ব্যবসা করিয়া কিছু লাভ করিতে পারেন। বলা বাহুল্য রাজাটিকে লোকে বলে ভয়ানক কঞ্জুস। যেন কাঠের রুটী—মাছি পর্য্যন্ত বসে না। কিন্তু রাজাটী জানে জহরতের ব্যবসা পাকা রকমে। বাৎসরিক আয় ৬।৭ লক্ষ টাকা; কিন্তু মূল্যবান পাথর ক্রয় বিক্রয় করার দরুন যে লাভ পান Bank বলে তাহার সংখ্যা প্রায়—১০০০০০০৲ টাকা। কলিকাতা জহুরী বিশেষের যোগে এবৎসরের দরবার উপলক্ষে তিনি প্রায় ৩।৪ লক্ষ টাকা পাইবার আশা পাকা রকমে করেন। কোন এক ধনী মহারাজা নিখুঁত মুক্তার মালার জন্য প্রায় আহার নিদ্রা বর্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার নিকট সেইরূপ জিনিষ ছিল, তাই তিনি কলিকাতার জহুরীকে মধ্যস্থ করিয়া বেশ এক হাত মারিতে চান। উদ্দেশ্য এবারের লাভে তাঁহার রাজ্যে একটি খাল কাটাইতে হইবে প্রজার হিতার্থে ও রাজ্যের অর্থাগমের ইচ্ছায়। পিতৃপুরুষের কতক-গুলি কীর্ত্তি রক্ষণীয় মন্দিরের জীর্ণসংস্কার আশু কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। তাই তিনি কলিকাতা চলিয়া আসিয়াছেন। বন্ধু মহারাজা পাইতে চান একজন চক্ষু চিকিৎসক যিনি রোগটাকে একটু বাড়াবাড়ি করিয়া Certifify করেন। আমি ঐ রূপ ডাক্তারের খোঁজ জানি কিনা? বন্ধু রাজাটী যদিও কৃপণ বটেন কিন্তু এইরূপ সময় অর্থ ব্যয় করিতে কৃপণতা

দোষ বর্জ্জন করিতে পারেন। বলা বাহুল্য তিনি সেরূপ ডাক্তার পাইয়াছিলেন এবং বহু সহস্র টাকা দিয়া Certificate লইয়াছিলেন আমার যোগে নহে জহুরীর গুমস্তার যোগে।

এই অপ্রাসঙ্গীক কথা বলিবার উদ্দেশ্য,—লিখক তাঁহার রাজ্যে গিয়াছিল এবং তাঁহার ক্রিয়া কলাপ এবং হালচাল প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছি। রাজাটী বোম্বের দ্বিতীয় শ্রেণী ভুক্ত রাজা। তিনি রাজ্যশাসন করেন মচ্‌লন্দে বসিয়া, আলবোলায় তামাকু সেবন করিতে করিতে। অপরাহ্ন কালে কিঞ্চিৎ অহিফেন সেবন করিতেন দেশাচার মতে। ইনি তাঁহার রাজ্যের মা বাপ এবং প্রজা সকলের বন্ধু বান্ধব। দরবারে বসিয়া ইনি প্রত্যহ:একদিকে নৃত্য গীত দেখিতেন, অপর দিকে খাস মুন্সীকে লইয়া নথী প্রস্তুত করিতেন। জনৈক বৃদ্ধ রসিক লোকের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করিতেন Court Jester এর মত। সম্মুখে বসিয়া যে দুই ব্যক্তি বুদ্ধি চাল অর্থাৎ দাবাখেলা খেলিতে ছিল তাহাদের চালের মাত্রা বেশ watch করিতেন এবং বুঝাইয়া দিতেন। হঠাৎ যদি শুনেন প্রজাগণ মধ্যে কেহ উৎকট রোগে ভুগিতেছে অথবা Accident এ পড়িয়াছে তৎক্ষণাৎ দরবার কিয়ৎ কালের জন্য বরখাস্ত করিয়া সেই রোগীর নিকট যাইয়া আতুরের সেবা করিতেন। কাহারও মৃত্যু হইলে শবানুগমন করিতেন। কাজেই তিনি যে প্রজাবৎসল এ বিষয় বলা বাহুল্য। বোম্বে হইতে আমি তাঁহার সঙ্গে তাঁহার রাজ্যে যাই। ২।৩ দিনের জন্য গিয়াছিলাম কিন্তু আমাকে থাকিতে বাধ্য করা হইল এবং আমিও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আনন্দে একজন Model হিন্দুরাজা ও রাজ্য দেখিতে ও শুনিতে সুবিধা পাইয়াছিলাম। বলা বাহুল্য ইনি অদ্য পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছেন। ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ হইলেও সুখে ও ভোগে তিনি অদ্যাপি যুবকের ন্যায়। সব কার্য্যে তৎপর আছেন এবং Motar car পরিবর্ত্তে ঘোড়ার পিঠ পছন্দ করেন। হাওয়া গাড়ী দেখিলে সহাস্যে বলিয়া থাকেন 'ইয়ে রাজাকা সোয়ারি লায়েক নেহি হ্যায়।' রাজ কোষের তিনিই তহবিলদার। রাজপ্রাসাদের একটী অন্ধকার কামরা ছিল; Treasury র Iron-chest এর চাবি থাকিত মহাজার হাত বাক্‌সে। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার নিজ পরিবেক্ষনায় সব ব্যয় চলিত। দুই একজন রাজ সম্পর্কান্বিত কুমার শ্রেণীর লোক ছিল Treasury বিভাগের কর্ম্মচারী। তাঁহাদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলাম মহারাজা পারিত পক্ষে Post Card ব্যতীত দু'পয়সার Stamp দ্বারা Correspondence এ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত

হইতেন। আধুনিক উপায়ে ও ব্যয় সাধ্য ছাপা ডাক কাগজ ও লেফাফা ইনি ব্যবহার করিতেন না। কেবল মাত্র গভর্ণমেণ্টের সহিত Correspondence এ যাহা ব্যবহার করিতেন তাহা অতি মাত্রায় হিসাবের সহিত। আমার নিকট তাঁহার কতকগুলি পত্র আছে তাহা দেখিলে আধুনিক আমলাতন্ত্রের রাজ্যের কেরাণীকুল নিশ্চয় হাসিয়া ব্যাকুল হইবে।

কিন্তু তিনি তাই বলিয়া কৃপণ ছিলেন না। যদিও দান দাতব্য সম্বন্ধে মুক্তহস্ত ছিলেন না তথাপি প্রার্থীর আশাপূর্ণ করিতে কার্পণ্য করিতেন না। তবুও ঐ রাজ্যের Assistant Political Agent এর মুখে শুনিয়াছি 'He is hopelessly miser' এজন্য তাঁহার সহিত আমার অনেক মতান্তর ঘটে, তাহা বর্ণনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার মধ্যে আমি একজন হৃদয়বান রাজার প্রতিকৃতি যাহা পাইয়াছি তাহা চিরস্মরণীয়। এই মহাযুদ্ধে তাঁহার যুবরাজকে পাঠাইবার কালে তিনি আমাকে জানাইয়াছিলেন, 'ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করা আমাদের কর্ত্তব্য। পুত্র অর্থে 'পিতার যে অভিলাষ পূর্ণ করে, কাজেই আমার পুত্র এ বৃদ্ধ পিতার আশাপূর্ণ করিয়াছে ও পিতৃ আশীর্ব্বাদ পাইয়াছে ইহাই তাহার তথ্মা তাবিজ।"

অপর পক্ষে এবার Prince of Wales আসা উপলক্ষে একজন প্রসিদ্ধ এবং ধনাঢ্য দেশীয় নৃপতিকে দেখিতে সুবিধা পাইয়াছিলাম; কলিকাতায় বসিয়া। ইনি বিলাতি মজ্‌লিশে বিলাতিয়ানা ভাবে চলিতে সদা প্রস্তুত। Ball এ নাচিতে পারেন বলিয়া শুনিয়াছি এবং ইংরেজ মহিলা মজ্‌লিশে ইহার অবারিত দ্বার। ঘোড়দৌড়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা A. D. C র মুখে Club এ বসিয়া সেই নরপতি সম্বন্ধে অনেক গল্প গুজব শুনিয়াছি। তন্মধ্যে একটী কথা শুনিয়া আমার A. D. C. সহ মতান্তর ঘটিবার কারণ হইয়াছিল। মহারাজা বাস করেন ইংরেজী হোটেলে এবং তাঁহার বহুপত্নী বাস করেন ভাড়াটিয়া বাড়ীতে। কলিকাতার উপকণ্ঠে একটী সুবিস্তীর্ণ বাড়ীতে; বাড়ীটি সর্ব্বদা হোগলা বেড়ার ঘেরাটোপের ভিতর থাকিত এবং সদর দরজায় বাক্‌সওলার বাজার বসিত। রাণীরা সংখ্যায় কতজন A. D. C. মহাশয় তাহা বলিতে পারেন না। কারণ অন্দর মহলের খবর রাখা A. D. C র কর্ত্তব্য এবং করণীয় নহে। তখন আমি বলিয়াছিলাম 'লক্ষৌএর রাজকীয় কবরখানায় নবাবগণের অনেক বেগমের কঙ্কাল সমাহিত আছে। কিন্তু

কেহ যদি কবরখানা দেখিতে যায় তখন প্রহরিগণ জলদগম্ভীর স্বরে দর্শককে সাবধান করিয়া দেয়, 'উধার মৎ যানা, হুঁয়া বেগম-মহাল হ্যায়।' কথাটা A. D. C. মহাশয়ের মুখরোচক হয় নাই বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু আমারও রুচিকর হয় নাই যে ইংরেজ মহিলা মজলিশে যার অবিরাম গতি ইংরেজ মহিলাগণ এরূপ বহুপত্নীক রাজার সহিত করমর্দ্দন এবং Ballএ নাচিয়া থাকেন কিরূপ চিত্তে? অবশ্য প্রচুর অর্থে হয় ত তাহা ঢাকিয়া যায়। কারণ 'অর্থেন সর্ব্ববশা।'

এহু'টী রাজার ছায়াচিত্র পাশপাশি করিয়া ধরিলে মনে হয় বর্ত্তমান সময়ে ভারত নৃপতিকুল সেই সার্কাসের ঘোড়ার খেলার বালকের মতই রহিয়া গিয়াছেন। উঁহাদের নাকি ষাইট বৎসরেও নাবালকত্ব দূর হয় না। এই জনাই Chirol সাহেব বলিয়াছেন—

"Some are still very conservative almost medieval and some are with veneer of European modesty. But they are still equally jealous of their right and dignity."

প্রত্যেক নরপতির হাতে বিভিন্ন রঙ্গের সন্ধিপত্র রূপে তাস খণ্ডগুলি যা আছে তাহা মিলাইয়া 'বিস্তি খেলা' খেলাইতে অথবা ঐ সব সন্ধির স্বর্ত্তগুলির মাহাত্ম্য ত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় ভাবে 'Auction Bridge' খেলা খেলিতে খেলিতে জুয়ার মাত্রা বাড়াইয়া দিতে রাজি হইবে না। ততক্ষণ তাহারা গঞ্জিকা সেবন করিয়া গঞ্জিকা খেলা খেলিতে খেলিতে গঞ্জিকা সেবন জনিত ধূম্রলোচন they will watch the game. পঞ্জাবকেশরী রণজীত সিংহের মর্ম্মবাণী কথা দৈববাণী বলিয়া মানিতে হয় 'British Government is a safe friend but a dangerons enemy,

ইহা বিশেষ ভাবে বুঝিয়াও দেশীয় রাজন্যবর্গ water tight বাক্স বন্দী হইতে এখনও চান না এবং তাঁহাদের অভ্যাসের বিপরীত ভাবে চালিত হইতে যাওয়া কতদূর কষ্টকর হইবে সে বিষয় ভবিষ্যত প্রবন্ধে নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।

প্রলয়ের গান।

——:০:——

ওই শুনি প্রলয়ের ডাক
ওরে সরে দাঁড়া,
ভীরু আজ মহাদর্পভরে
ধরিয়াছে খাঁড়া।
বিশ্বে আজ বড় ছোট নাই
দিকে দিকে জেগেছে সবাই
ওরে ঘৃণা! পিছে পড়ে কেন!
আয় আয় ভাই!
আয় ছুটে চলে আয়
জেগেছে সবাই ॥

রে অস্পৃশ্য! আজ যারা তোরে
করিয়াছে দূর,
বলিয়াছে দূরে রহ ওরে
ঘৃণিত কুকুর।
আজ তারা দূরে পড়ে থাক
অহঙ্কার সরিয়া দাঁড়াক
ওই শুনি প্রলয়ের গান
জেগেছে সবাই
আয় ছুটে চলে আয়
কোন দ্বিধা নাই।

ওই শোন বাজে রণডঙ্কা
আজ মহারণ,
ওই শোন অসির ঝঙ্কার
রণন্ ঝনন্
আন্ আন্ অসি খরশান
দুনিয়া করিব খান খান্
ছিঁড়িয়া ফেলিব গ্রহ তারা
ওরে আন্ আন;
রক্ত দিয়ে ধুতে হবে আজ
যত অপমান।

দূরে রহ সমাজ-সংস্কার
দম্ভ অভিমান।
বজ্রতানে গর্জ্জিছে আবার
গর্জ্জিছে বিষাণ।
ভেদাভেদ ঘুচে যারে সব,
ওই সেই সঙ্গীত ভৈরব,
জেগেছে সবাই।
ওরে ঘৃণ্য! আয় আয় তবে
আর দেরী নাই॥

বিশ্বপতি যদি কেউ থাকে
থাক, থাক, থাক ;
শূন্যে, শূন্যে—মহা শূন্যোপরি
দাঁড়ায়ে নির্ব্বাক।
সমাজের ভগ্নরজ্জু লয়ে
খেল তোরা দোল,
মত্তপ্রাণে ছুটে চলে আয়
হাজার পাগল।
ওই ওই তর্জ্জে ঝঞ্ঝা
গর্জ্জে প্রভঞ্জন !
ওরে ভাই ! ছুটে চল্
আজ মহারণ ;
জীবন মরণ !
রক্ত দিয়ে ধুয়ে ফেলে আজ
যত অপমান !
পূর্ণ প্রাণে পূর্ণ কণ্ঠে গা
প্রলয়ের গান।

শ্রীশ্রীধর শ্যামল।

তটিনী
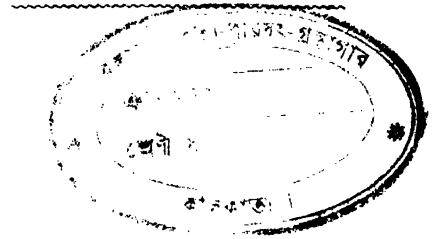
(২৩)

সমস্ত জানালা খোলা ছিল। তবু গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া তারিণী দেখিলেন তাঁর মাথার কাছে ছোট হাত-পাখাখানি নিঃশব্দে নড়িতেছে। তারিণী দৃঢ় আদেশের স্বরে বলিলেন "তিনু, এখনো জেগে আছ? যাও, শীগ্‌গীর গিয়ে ঘুমিয়ে পড়গে।"

এই আগন্তু মানুষটী যে তিনুই তা আর তাঁকে চোখ ফিরাইয়া দেখিতে হইত না। তটিনী মিনতিপূর্ণ মৃদু কণ্ঠে বলিত "যাচ্চি বাবা। আগে আপনার ঘুম আসুক।"

"তুমি অমন ক'রে বসে থাকলে তো আমার কক্ষনো ঘুম আসবে না মা,—আর ঘুম না হ'লেই তো আরো অসুখ বাড়বে, তুমি উঠে যাও ঘুমোও গে, আমিও ঘুমুই।"

তটিনী আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া উঠিয়া যাইত। কলিকাতায় আসিয়া অবধি তারিণী বাবুকে অধিকতর সতর্ক হইতে হইয়াছে। তাঁর শরীর সারে নাই। নিজে সাধ্যমত তিনি নিজেকে নীরোগ ভাবিবার চেষ্টা করিতেন কিন্তু রোগ তাঁকে ক্ষমা করিত না।

অনেকদিন হইতে দেশ ভ্রমণ ইত্যাদিতে তাঁর ব্যাবসার ক্ষতিও হইতেছিল। ইদানিং সঞ্চয়ের ঘরেই হাত দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চারিদিক হইতে ব্যয়ও অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

তটিনীকে তো পাশের ঘরে পাঠাইয়াদিলেন; কিন্তু তারিণীবাবুর চক্ষে নিদ্রার আভাসও দেখা দিল না। তাঁর অভাবে তাঁর আদরের তিনুকে এমন করিয়া কে দেখিবে শুনিবে সে চিন্তা তিনি একবার করিলেন। ভাবিলেন—কেন, তিনুকে কি আমি আত্মনির্ভরশীলা একজন প্রকৃত মানুষ করিয়া গড়িতে পারি নাই?" তার অবলম্বন সে নিজে! শিক্ষায় দীক্ষায় আমার তিনুকে তো আমি আজীবন ধরিয়া সাধারণের অনেক উঁচু করিয়া গড়িতে চেষ্টা করিয়াছি। তার জন্য আবার চিন্তা কেন?

সম্মুখের পাশের আবরণহীন জানালা দিয়ে দূরপ্রসারিত নীলাম্বরখানি বেশ দেখা যাইতেছিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি,—তাই চাঁদ ছিল না, অজস্র নক্ষত্র ফুটিয়াছিল। তারিণী বাবু কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলেন, ঘুম আসিল না।

সহসা বাল্যকালের পাঁচ কথা মনে পড়িল। কৃষ্ণবিহারীকেও মনে পড়িল। মনে মনে ভাবিলেন অত অভাব অনাটনের মাঝেও কৃষ্ণবিহারী সন্তানকে সন্তানের মত করিয়া তুলিতে পারিয়াছে বটে!

সহসা তাঁর মন কোমল হইয়া একখানি অতি সুন্দর কিশোর মুখ জাগিয়া উঠিয়া তাঁকে আকুল করিল। তিনি ভাবিলেন কে জানে যে সে এখন কোথায়?

সকালে তটিনী যখন তারিণীবাবুর সুমুখে ছোট টিপয়ের উপর দুধের বাটী রাখিয়া পাখার বাতাসে দুধ ঠাণ্ডা করিয়া দিতেছিল। উমাকান্ত আসিয়া বলিলেন—"আমি বেরুচ্চি তিনু মা, তুমি দ্যাখ তো বেদানা-টেদানা কিছু আনতে হবে কি না?"

তটিনী বলিল "না, সে সবই আছে। কালই সন্ধ্যে বেলা অতুল দা যে কতকগুলো কিনে এনেচে, বেশী একসঙ্গে আনালে পচে যায়।"

"তা হলে আমি যাই একটু ঘুরে আসি।"

"অতুল দা বাড়ীতে আছে তো? যদি কোনো ভদ্রলোক কেউ আসেন তা হলে?"

"না অতুলও বেরিয়েছে; সে শীগ্‌গীরই ফিরবে আমারও ফিরতে দেরী হবে না। এর মধ্যে আর কেই বা আসবে।"

"তা হলে ওরর থেকে পিসিমাকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে যাবেন যে, তাঁর যদি কিছু লাগে। তা নইলে আবার তিনি বকাবকি করবেন!"

"আচ্ছা!" বলিয়া উমাকান্ত তাঁর ছোট ও মোটা লাঠি গাছটি তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু শীঘ্র আসিবেন বলিয়া গিয়াও প্রায় চার ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিলেন।

অতুল এতক্ষণ বাড়ী ছিল না সেও তখনো ফেরে নাই। তারিণীবাবু মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। উমাকান্ত ফিরিয়া আসিলে তিনি বলিলেন "এত দেরী হ'ল কেন দাদা?"

উমাকান্ত প্রসন্ন মুখে একবার এদিক ওদিক চাহিয়া বলিলেন "বড্ড দেরী হয়ে গেল নয়? এখানে অনেক দিন পরে এসেছি পথে ঘাটে সর্ব্বত্রই চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়!"

"অতুল? হাঁা তাকেও দেখলাম যে! তিনু মা কোথায়?"

"স্নান ক'রতে গেল এখন। কেন?"

উমাকান্ত একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "আজ হঠাৎ বাদলকে দেখ্লাম অতুলের সঙ্গে—"

"বাদল! বাদল! ও হাঁা কৃষ্ণবিহারীর ছেলে!"

তারিণীবাবুর অনিচ্ছাতেই তাঁর মুখের ভাবে খানিকটা আগ্রহ প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "তা সে যে এখানে? এই কিছুদিন আগে নাকি বোম্বে কোথায় অসুখ হয়ে পড়েছিল, এখানে এলো কোথা থেকে?"

সেইখান থেকেই। ব্যারাম হয়ে পড়েছিল তা তার চেহারা দেখেই বোঝা যায়। বল্লে অল্পদিন হ'ল এখানে এসেচে। তোমাকে দেখতে আসবে একদিন!"

"আমাকে দেখ্তে? কেন, আমার ওপর তার অত দয়া হতে গেল কেন?"

উমাকান্ত স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন "তা এলে আর কি দোষ? ডাক্তারেরা তো আসে, সেও একজন ডাক্তার।"

"কি তার দরকার? কোনো দরকারই নেই।"

"তা নাই বা থাকলো দরকার! কেবল মৌখিক ভদ্রতার জন্যেই কি সে তার পিতৃ-বন্ধুকে দেখ্তে আস্তে পারে না? আর কিছু তুমি নাই বা মনে ক'রলে?"

তারিণীবাবু একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিলেন "এই এক আচ্ছা বিপদ!"

"তবে আমি খাওয়া দাওয়ার পর তাকে বারণ ক'রে আস্‌বো,—তা হ'লে তো তুমি সুখী হবে?"

তারিণীবাবু আর কোনো কথা বলিলেন না। তাঁর মনে যে কতখানি ব্যগ্রতা চাপা রহিয়াছে তা উমাকান্ত বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন কেবল তাঁকে আঘাত দিবার জন্যই বুঝি তারিণী বাদলের উপর এমন বিতৃষ্ণা ভাব প্রকাশ করেন।

তারিণীবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিলেন—"কৃষ্ণবিহারীর ছেলে কখন আস্‌তে চেয়েছে বল্‌লে ?"

"কাল সকালে, কি দুপুরে।"

"আচ্ছা আসুক সে,—তাকে আমার কিছু বলবার আছে, আমাকে সে কতকগুলো টাকা পাঠাতে গেল কিসের জন্যে ! আমি তো সে টাকা চাইও নি কখনও,—আমাকে টাকা দেবার কোনো কথা ছিল না তার। এবার তাকে এই কথাটা একবার জিজ্ঞাসা ক'রবো।"

তারপর আর একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"তাঁর এত টাকা হয়েছে যে রাখ্‌বার ঠাঁই খুঁজে পাচ্চেন না !"

উমাকান্ত বলিলেন "সে যদি আসে তো তাকেই ব'লো তোমার যা বল্‌তে হ'য়, কিন্তু সেও সদ্য অসুখ থেকে উঠেছে তার সঙ্গে তুমি ভদ্র ব্যবহার করো।"

তারিণীবাবু রুষ্ট কণ্ঠে বলিলেন "আমাকে এ পর্য্যন্ত অভদ্র কেউ বলে নি !"

"না, না ও-ভাবে কথা আমি বল্‌তে চাই নি, এখানে একটু অন্য রকম আছে ব'লেই বলছিলাম।"

"অন্য রকম কিছু নেই। আমি তো চাইনে যে তাকে কেউ নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে আসুক। আর অন্য রকম যদি কোনো আত্মীয়তার প্রত্যাশা করেন, তা হলে তার কাজ নেই আমার কাছে এসে !"

উমাকান্ত মনে মনে বলিলেন "একবারও তাকে ভাল করে দেখ নি তাই, একথা বল্‌ছো একবার যে তাকে ভাল ক'রে দেখেছে সে আর দূরে রাখতে চাইতে পারে না। তুমিও হয় তো পারবেনা !"

কিন্তু বারীন সম্বন্ধে কোনো কথা উঠিলেই তিনি প্রাণপণে সতর্ক হইয়া কথা বলিতেছেন। একেই ত সেই একবারকার নির্ব্বোধ কর্ত্তৃত্ব করিয়া তিনি চিরদিন অনুতাপবিদ্ধ। আর ইহাদের কোনো কাজে কোনও কথায় থাকিবেন না এমন প্রতিজ্ঞাও মনে মনে অনেকবার করিয়াছেন বটে ! কিন্তু কোলের স্নেহাকুল প্রাণ লইয়া স্থির হইয়া থাকিতে পারেন না বলিয়াই আবারও ছুটিয়া আসেন ! আবারও এদের সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হন।

(২৪)

মহেশ্বরীর ঘরের মেঝেয় বসিয়া তটিনী মায়াকে পত্র লিখিতেছিল ; মায়ার সুদীর্ঘ পত্র তার সুমুখ খোলা। অনেক দিন তটিনী তাকে পত্র দেয় নাই বলিয়া সে অভিমান করিয়া লিখিয়াছে ননদ হইয়া অবধি তটিনী মায়াকে এমন দু চক্ষের বিষ করিয়া ফেলিয়াছে।

এত দিন সে ভাগলপুরে পড়িয়া আছে তা তিনু'দি তার বা খোকাটার কোনো খোঁজ-খবর করে না! এবার সে খোকাটাকেই পাঠাইয়া দিবে আর নিজে আসিবে না;

তটিনী চিঠিখানা মহেশ্বরীকে পড়িয়া শুনাইয়া তারপর মিষ্ট কথায় উত্তর লিখিতে বসিয়াছিল। পিতার সেবাশুশ্রূষা ও কাজকর্ম্ম লইয়া সে অনেক দিন কাহাকেও চিঠিপত্র লিখিতে পারে নাই। ছেলে মানুষ মায়া তাই অভিমান করিয়া বসিয়াছে।

উপর হইতে উমাকান্ত ডাকিয়া বলিলেন "নিতাই, নিতাই,—তিনুকে একবার পাঠিয়ে দেত!"

কাগজ কলম রাখিয়া তটিনী উঠিয়া পড়িল।

তারিণীবাবু তখন উপরকার দালানে বড় চেয়ারে বসিয়াছিলেন। তটিনীকে দেখিয়া বলিলেন "আচ্ছা তিনুমা, আজ কাল আমি ভালই আছি।"

"মাত্র এই দুদিন!"

"তা হোক্,—ভাল আছি তো! এখন তুমি একটু আধটু বেরিয়ে ক'লকাতা দেখে আস্‌তে পারো!"

তটিনী একটু আশ্চর্য্য হইল। একবার বিস্মিত চোখ তুলিয়া উমাকান্ত ও তারিণীর মুখপানে চাহিল। তারপর বলিল "তার জন্যে তো তাড়াতাড়ি নেই কিছু বাবা!"

"তা নাইবা থাক্‌লো। অতুলকে ডাকো আমি বলে দিই আজই তোমায় সব দেখিয়ে শুনিয়ে আনুক,—তুমি তো এসে অবধি কোথাও বেরুতে পাওনি!"

কর্ত্তা তখনি অতুলকে ডাকিয়া তটিনীকে বেড়াইয়া আনিবার অনুমতি দিলেন। বলিলেন, "সন্ধ্যার কাছাকাছি ফিরে আসতে চেষ্টা ক'রো।"

অতুল "আচ্ছা,—তা হ'লে গাড়ী আন্‌তে বলে দি গে।"

সেদিন তটিনীর চিঠিলেখা অসম্পূর্ণই থাকিয়া গেল। গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া অতুল জিজ্ঞাসা করিল "আজ এমন অনুগ্রহটা আদায় ক'রলে কি ক'রে তিনু?"

তটিনী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়াছিল। একটু হাসিয়া বলিল "অনায়াসে!"

অতুল বুঝিল তটিনী যে কারণেই হউক বিশেষ অনুগৃহীত হয় নাই, তাই সেও আর কোনো কথা বলিল না।

এদের পিতাপুত্রীর দুই জনের মেজাজকেই অতুল ভয় করিত।

দুই প্রহরে বাহির হইয়া আলিপুর হইতে যখন তারা ফিরিয়া আসিল, তখন দিনান্তের ম্লান আলো প্রায় নিভিয়া আসিতেছে। দোতলা তেতলা বাড়ীগুলার উপর-তলায় ঝকঝকে রৌদ্র ও নীচের তলায় অন্ধকার নিবিড় হইয়া উঠিতেছিল।

গাড়ী তাদের বাড়ীর বারান্দার সিঁড়ির কাছে আসিয়া থামিল। অতুল লাফাইয়া নামিয়া পড়িল। তটিনী নামিবার জন্য মাথা বাহির করিয়াই সহসা বিদ্যুৎ আহতের মত বিবর্ণমুখে মাথা টানিয়া লইল।

তারপর ধীরে ধীরে নামিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। একটু দাঁড়াইয়া কোনো দিকে চাহিল না। বারীন তখন সেই সিঁড়ি দিয়াই নামিতেছিল সেও রাস্তার দিকে যাইতেছে দেখিয়া অতুল চীৎকার করিয়া বলিল "এই,—চলে যাচ্চো যে। ফেরো, ফেরো, একটু দাঁড়াও না!"

বারীন দাঁড়াইয়া বলিল "কেন?"

"কতক্ষণ এসেচো?"

"অনেকক্ষণ। এখন আর দাঁড়াবার সময় নেই ভাই, ট্রাম ধ'রতে হবে, এখনি।"

"কাল বাসায় গিয়ে দেখা পাব তো! থাক্‌বে বাসাতে?

"থাক্‌বো। যেও।"

বারীন আর দাঁড়াইল না। ট্রাম আসিয়া পড়াতে সে উঠিয়া পড়িল।

তটিনী অসহ্য বিস্ময় পুলকে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। প্রথমটা নিতান্ত আশ্চর্য্য হইয়াছিল কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে একটা হাল্‌কা বাতাস বহিয়া গেল। যেন অনেক দিনকার

সঞ্চিত দুর্ব্বহ কোন্ আবর্জ্জনার বোঝা ফাল্গুনের প্রমত্ত দক্ষিণ বায়ুর এক ঝট্‌কায় উড়িয়া গেল।

অতুল আসিয়া বলিল "এ-আবার কি নতুন ব্যাপার তিনু, তুমি কিছু জানো এর?"

"না, কিছু না।"

বলিয়া অতুলকে এড়াইয়া তটিনী তার নিজের ঘরে ঢুকিয়া বসিয়া পড়িল। তার তখন ইচ্ছা করিতেছিল সকলকার চোখ এড়াইয়া একটু বিশ্রাম করিতে, কিন্তু রুগ্ন পিতাকে অনেকক্ষণ দেখা হয় নাই বলিয়া সে স্থির হইয়া বসিতেও পারিতেছিল না।

সে ভাবিতেছিল যে 'অদৃষ্ট' দেবতা কি তাকে তাড়া করিয়া বেড়াইতেছেন নাকি? যদি প্রতিকারের চেয়ে গ্লানির বোঝা এমনি ক্রমাগত বাড়িয়াই চলে তা হইলে কোন্ লজ্জায় সে নিজের অন্তর্যামীকেও ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিবে? ফাঁকিই কি টিঁকিবে?

কিন্তু কে এ?

আজন্মের বাঁধন কাটিয়া এ কোন্ অতি প্রখর প্রভাবের নীরব আকর্ষণে সে আপনাকে এমন করিয়া নিঃস্ব করিয়া দিতে বসিয়াছে!

জন্মজন্মান্তরের কত বড় অধিকার এই শান্ত নির্ব্বাক লোকটীর করায়ত্ত হইয়া রহিয়াছে তার ঠিক নাই। তা নহিলে এদের আর তাদের কতটুকু পরিচয়? কেবল তো শৈশবে সেই এক মুহূর্ত্তের দৃষ্টি বিনিময় হইয়াছিল মাত্র!

এক মুহূর্ত্তের দৃষ্টি বিনিময়? সেই কি কম! এই এক মুহূর্ত্তের দৃষ্টি মিলনই এক শিশিরশিক্ত বসন্তের শিমুল-পলাশ-রাগ-রক্তিম তপোবনে নারীর প্রাণের প্রেমের ফুল ফুটাইয়া তুলিয়াছিল।

অনিবার্য্য বৈধব্য, চির বিচ্ছেদের আশঙ্কাও তাকে থামাইতে পারে নাই। মৃত্যুকে জয় করিয়াও এই প্রেম মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছিল। এ জগতে একটী পলক সময়ও অর্থহীন ব্যর্থ নয়!

বারীন যদি ধনবান্ ক্ষমতাবান্ বা গর্ব্বোদ্ধত প্রকৃতির হইত, তাহা হইলে হয় তো তটিনী তাকে অবজ্ঞা অবহেলা করিয়াই চলিতে পারিত! কিন্তু আশ্রয়হীন, অর্থহীন, আত্মপরি-

জনের স্নেহের ছায়া মাত্র হীন এই শান্ত বিনীত, তরুণ লোকটীর নম্রতায় তার মন স্বাভাবিকই সমবেদনায় কোমল হইয়া গিয়াছিল।

সন্ধ্যা উৎরাইয়া গিয়াছিল। তুলসী লণ্ঠন হাতে করিয়া আসিয়া বলিল "বেরিয়ে এসেই যে এমন ক'রে এলিয়ে প'ড়লে দিদিমণি, কি হয়েচে?"

তটিনী শ্রান্ত কণ্ঠে বলিল "কি আর হবে।"

তুলসী আলোটা টেবিলে তুলিয়া রাখিয়া যাইতেছিল অনেকক্ষণ অন্ধকারে থাকিয়া, আলো তটিনীর চোখে তীব্র লাগিল, সে বলিল "আলোটা সরিয়ে রেখে যা তুলসী, চোখে লাগে!"

তুলসী বলিল, "বাবুর ঘরে এখনও সব বাইরের ক'জন ভদ্রলোক বসে গল্প ক'রচেন, এখন তো সেখানে যাওয়া যাবে না, এই বেলা কাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে নাও গে না!"

"আচ্ছা সে হবে এখন। এখন তুই যা আমাকে জ্বালাসনে!"

তুলসী চলিয়া গেল। কিন্তু তটিনীরও আর আলস্যের আশ্রয়ে পড়িয়া থাকা চলিল না। সে রান্নাঘরে গিয়া পিতার পাত্রের পথ্য রুটী যথাসম্ভব পাৎলা করিতে ও দুধের জ্বাল ঠিক রাখিবার তদারক করিতে বসিল। না, হইলে হয়তো তাঁর পথ্য গুরুপাক হইয়া পড়িবে!

রাত্রে যখন দেখিল তিনি অত্যন্ত অন্যমনস্ক। যদিও নিজেই অনুমতি দিয়া আগ্রহ দেখাইয়া তাকে বেড়াইতে পাঠাইয়াছিলেন, তবু সাক্ষাতে একবার প্রশ্নও করিলেন না। যে সে কোথায় গিয়াছিল, বা কি দেখিয়া আসিয়াছে?

এমন নীরবতা তারিণীবাবুর নূতন নয়! তবু তটিনী তাঁর শরীর সুস্থ আছে কিনা ভাবিয়া শঙ্কিত হইল। কিন্তু তাঁকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। পাছে তাঁর স্তব্ধতা ভাঙ্গিতে গিয়া তাঁকে বিরক্ত করা হয়!

তারিণীবাবুর আহার শেষে সে নীচে আসিলে মহেশ্বরী তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁ রে তিনু আজ কি দেখে এলি?"

পায়ের ব্যথা বাড়িয়াছিল বলিয়া তিনি সেদিন প্রাতঃকাল হইতেই শুইয়া কাতরাইতে ছিলেন, তুলসী বার তিনেক কবিরাজী তেল মালিশ করিয়া দেওয়ার পর এ বেলা বালিশে ঠেসান দিয়া একটু বসিয়াছিলেন।

তটিনী মায়ার সেই অসমাপ্ত চিঠি শেষ করিবার জন্য কালি কলম লইয়া বসিয়া বলিল "দেখে এলাম চিড়িয়াখানা। শুনে কি ক'রবে পিসিমা তোমার তো যাওয়ার উপায় নেই?"

মহেশ্বরী ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আর এখন মরতে পারলে বাঁচি! এমন করেই ভেঙ্গে পড়েছি যে একটু কালীঘাটে যাব তারও ক্ষমতা নেই। এখন গঙ্গায় ঠাঁই পেলেই হয়!"

"আজ কেমন আছ? এ বেলা তো অমাবস্যা ছেড়ে গিয়াছে।"

"তাই, এবেলা একটু ব্যাথাটা কম আছে।"

"আচ্ছা, তা হলে কাল মোটে ঘুম হয় নি বলছিলে, পারোত আজ একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা কর। আমি এ চিঠিখানা শেষ করে ফেলি।"

বৌমাকে তাঁর আশীর্ব্বাদ জানাইতে বলিয়া মহেশ্বরী শুইয়া পড়িলেন। তটিনী আলোর কাছে বসিয়া চিঠিলেখা শেষ করিয়া শুইতে গেল।

ক্রমশঃ

শ্রীনীহারবালা দেবী।

কবির গান।

——:o:——

[টেনিসন্]

বাদল থামিয়া গেছে। চলিয়াছে কবি
লোকালয় রাজপথ সুদূরে ফেলিয়া—
আসে বায়ু কাঁপাইয়া কুসুম বিটপী,
খেলে আলো রাঙা মেঘস্পন্দনে হেলিয়া।

রচিয়াছে অস্তগামী রবি প্রতীচিতে
তরু গিরি শিরোপরে বিচিত্র তোরণ,
এ নির্জ্জনে ঝঙ্কারিয়া করযন্ত্রটিতে
গাহিল কবি সে এক গান সম্মোহন।

স্তব্ধ বলকার শ্রেণী দিক্‌চক্রবালে,
মূর্চ্ছিত পাপিয়া নভে, চকিত নাগিনী,
লক্ষ্যভ্রষ্ট পশে শ্যেন কিরাতের জালে,—
যদিও থামিয়া গেছে কবির রাগিণী।
পত্রকুঞ্জে ঝুরে বসি বিলাপী কোকিল
'এত গান সব বৃথা, ব্যর্থ কণ্ঠ মোর—
কই আমি মাতাইনু এমন নিখিল ?
ধন্য কবি, এ প্রেমের গানখানি তোর।'

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস।

সমাজ গঠনের দোষেই হউক, অথবা—সমাজে ধন বণ্টনের দুর্ব্যবস্থার জন্যই হউক, প্রত্যেক দেশেই কৃষক সম্প্রদায়ের দুর্গতির সীমা নাই। রৌদ্র বৃষ্টি মাথায় সহ্য করিয়া কৃষক দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রমে শষ্য উৎপন্ন করে, কিন্তু সে ধনে পুষ্ট হইয়া ধনীর সন্তান ক্রমশঃ বিলাস সাগরে ভাসিতে থাকেন; অথচ যে কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দশজনের জীবন-ধারণের জন্য অন্ন যোগায়, সে নিজে দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, পরিবার

কাপড় সংগ্রহ করিতে পারে না। সমাজের উচ্চস্তরে যে ধনী সম্প্রদায় তাঁহারা নিত্য নূতন বিলাস লালসা পূরণের জনাই ব্যস্ত, অথচ সমাজের নিম্নস্তরে কৃষককুলের দুঃখ দারিদ্র্য দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। ধনী ও দরিদ্রের অবস্থার মধ্যে এই যে ক্রম বিবর্দ্ধমান বৈষম্য, এই বৈষম্য জ্ঞানই য়ুরোপের রাষ্ট্র ও সমাজকে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িবার চেষ্টা করিতেছে। ভারতীয় কৃষকও দারিদ্রের নিষ্পেষণে বুকফাটা দুঃখে গুমরিয়া কাঁদিতেছে। আর তাহাদের দারিদ্রের জনা সমগ্র ভারত দরিদ্র। কারণ, এই দেশের তিন ভাগ লোক কৃষিজীবী। ভারতীয় কৃষক গ্রাম্য মহাজনের নিকট হইতে টাকা বা বীজ ধার করিয়া লইয়া ক্ষেত চাষ করিতে আরম্ভ করে। মহাজন এত অধিক সুদ লইয়া কৃষককে টাকা ধার দেন যে তাহা শুনিলেও বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। বাংলা গভর্নমেণ্টের কো-অপারেটিভ্ সোসাইটির সংগৃহীত খারিজ দলিলগুলি পরিক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় বাংলার গ্রামে গ্রামে কৃষকগণ শতকরা ২৫৲ টাকা হইতে শতকরা ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত সুদে টাকা ধার লইতে বাধ্য হয়। এই দেনার জন্য জমীর ফসল অথবা জমী টুকুই বন্ধক রাখিতে হয়। যদি শস্য ভাল হয় তাহা হইলে মহাজন ফসলের ভাল অংশটুকু বাজার হইতে সস্তা দরে সুদ বাবদ লইয়া যান। বাকী যাহা পড়িয়া থাকে তাহাই বিক্রয় করিয়া কৃষক জমীদারের খাজনা দেয় এবং সংসার প্রতিপালন করে। যে ফসল কৃষক ঋণ শোধ করিয়া ঘরে আনে তাহা দুই দিনেই ফুরাইয়া যায়। তারপর আবার মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হয়। তাহারা বিলাসের ধার ধারে না, নেশা করে না, তবুও তাহাদের জীবন বাঁচাইয়া রাখাই কষ্টকর। ফসল ভাল হইলেই আমাদের দেশী কৃষকের এই অবস্থা! অনাবৃষ্টি প্রভৃতির জনা যে বৎসর অজন্মা হয়, সেই বৎসর যে তাহাদের কি কষ্ট তাহা ভারতবর্ষের যে কোনো দুর্ভিক্ষের বিবরণ পড়িলেই টের পাওয়া যায়।

য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের স্বদেশপ্রেমিকগণ যখন যৌথ ঋণ দান সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া কৃষকদিগের দেনা কমাইতে কতকটা সমর্থ হইলেন, তখন আমাদের দেশেও রানাডে, উইলিয়াম ওয়েডেরবার্ণ প্রভৃতি মনস্বীগণ ঐ প্রকার সমিতি প্রতিষ্ঠায় মন দিলেন।

সার্ উলিয়াম্ ওয়েডেরবার্ণই প্রথম আমাদের দেশের কৃষকের দুরবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া উহা দূর করিবার জন্য ভারতগভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে ভারতগভর্ণমেণ্ট

[১৮৮২ খৃষ্টাব্দে পুণাতে একটী কৃষিব্যাঙ্ক খুলিবার জন্য বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কথা ছিল এই ব্যাঙ্ক দশজনের নিকট হইতে অল্প সুদে টাকা ঋণ করিয়া কিছু বেশী সুদে (কিন্তু গ্রাম্য মহাজন যে সুদ দাবী করেন তাহার চেয়ে কমে) রায়তদিগকে ধার দিবে। কিন্তু তখন কার ভারত সচিব ঐ প্রণালীতে কাজের সুবিধা হইবে না মনে করিয়া ঐ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে দিলেন না।

এই সমস্যা মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তাদিগের মাথারও ঢুকিল। মান্দ্রাজ প্রদেশের কোথাও কৃষিব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য তাঁহারা সার নিকোল্‌সনকে নিযুক্ত করিলেন। এদিকে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে লর্ড ম্যাক্‌ডোনেল্ চোক কাণ বুজিয়া যুক্ত-প্রদেশে প্রায় ২০ যৌথ ঋণ দান সমিতি খুলিয়া ফেলিলেন। সেই বছরই ভারতগভর্ণমেণ্টও বুঝিতে পারিলেন যে যৌথ-ঋণ-দান-সমিতি এই দেশবাসীর যথেষ্ট উপকারে আসিবে। ভারতবর্ষে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপনের নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট একটী কমিটি নিযুক্ত করিলেন। সার্ এড্‌ওয়ার্ড ল ছিলেন সেই কমিটির সভাপতি। এই কমিটির পরামর্শানুসারে গভর্ণমেণ্ট যৌথ-ঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে Co-operative Credit Societies Act (কো-অপারেটিভ্ ক্রেডিট্ সোসাইটী এ্যাক্ট) বিধিবদ্ধ করিলেন। এই সব সমিতির উদ্দেশ্য কৃষকদিগকে প্রয়োজন মতো অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়া। অথচ যাহাতে কৃষকগণ টাকা ধার করিয়া টাকার অপব্যয় না করে সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ধনী-লোককে এই সকল সমিতির সভ্য করা হয় না। সাধারণতঃ একগ্রামবাসী লোকজনেরা মিলিয়া একটি সমিতির সভ্য হয়। ইহাতে পরস্পর পরস্পরের জামীন হইবার সুবিধা হয়। অপবায়ী বা অসচ্চরিত্র লোককে এই সমিতির মেম্বর করা হয় না।

মেম্বর ব্যতীত অপর কেহ কো-অপারেটিভ্ সোসাইটী হইতে ধার লইতে পারে না। গভর্ণমেণ্ট এই সমিতিকে ইন্‌কম্‌টেক্স ও-রেজিষ্ট্রেশন ফির হাত হইতে মুক্তি দিয়াছেন।

সভ্যাদিগের একতা, পরস্পরের বিশ্বাস, এবং নৈতিক কর্ত্তব্য বোধ এই সকলই এই সমিতির ভিত্তি। এই সমিতির প্রধান সুবিধা এই যে, একজন গরীব লোক যে নিজের বাজার জমাতে (Credit) কিছুই ধার পায় না, সেও দশজনের সঙ্গে একত্র হইয়া মিলিত বাজার

সম্বন্ধে অল্প সুদে অনেক টাকা ধার পাইতে পারে। আরও দেখা গিয়াছে এই সকল সমিতির সভ্যগণ মিতব্যয়ী ও স্বাবলম্বী হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে কো-অপারেটিভ্ ক্রেডিট্ সোসাইটী খুব তাড়াতাড়ি বিস্তার লাভ করিয়াছে।

	১৯০৪-৫ খৃঃ	১৯১১-১২ খৃঃ।
সব রকম সমিতির মিলিত সংখ্যা—	৪০	৮৭১

গভর্ণমেণ্টের ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের কাগজপত্র হইতে দেখা যায় যে সেই বৎসর ভারতবর্ষে মোট ১২০০০ যৌথ-ঋণ-দান সমিতি ছিল। তাহার সভ্য সংখ্যা ছিল ৬০,০০০ জন এবং মূলধন ছিল ৫ কোটি টাকা। ভারতবর্ষে প্রতি ২০০,০০০ জন কৃষিজীবী লোকের জন্য একটী যৌথ ঋণ দান সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু ইটালীতে ঐ সংখ্যক লোকের জন্য ১৮টী ব্যাঙ্ক এবং জার্মানীতে ৫২টী। কাজেই দেখা যায় এখনো এদেশে যথেষ্ট যৌথ ঋণ-দান সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে। কিন্তু নূতন সমিতি প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, কারণ কোনও কারণে কোথাও একটী সমিতি উঠিয়া গেলে ভবিষ্যতে তথায় আর নূতন সমিতি প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

এতদিন কেবল ঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠার দিকেই নজর ছিল। কিন্তু কেবল ঋণ করিয়া কি কেহ অবস্থার উন্নতি করিতে পারে? কৃষক যাহাতে বীজ, হাল ইত্যাদি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রাদি সস্তায় পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা থাকাতে প্রয়োজন। আবার কৃষক যাহাতে উৎপন্ন জিনিষ বাজারের অবস্থা না বুঝিয়া সস্তায় বিক্রয় না করে সেই দিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার। এক কথায়, অল্প আয় যাহাদের তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে যৌথ ঋণদান সমিতির সঙ্গে সঙ্গে যৌথ ক্রয় ও বিক্রয় সমিতি প্রতিষ্ঠারও প্রয়োজন। কিন্তু ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের কো-অপারেটিভ্ এ্যাক্ট অনুসারে কেবল যৌথ ঋণদান সমিতিই রেজেষ্টরী করা চলিত। কাজেই যৌথ ক্রয় বিক্রয় সমিতি প্রতিষ্ঠা করা কষ্টকর হইয়া উঠিল। গভর্ণমেণ্ট সেই অসুবিধা দূর করিলেন ১৯১২ খৃষ্টাব্দে আর একটী নূতন ধারা বিধিবদ্ধ করিয়া।

১৯১২ খৃষ্টাব্দ হইতে বীজ ও কৃষিকার্য্যের উপযোগী যন্ত্রাদি ক্রয়ের জন্য এবং উৎপন্ন শস্যাদি বিক্রয়ের জন্য বহু সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। The Gauria Kalan Society, The Seed Supply Ltd, Sehora প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বীজ সরবরাহ

করিবার জন্য বর্ম্মা ও বেরারে, এবং সার জোগাইবার জন্য বোম্বাইর নিকট কল্যা মহিমে কতকগুলি সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। নাগপুর, কাশী, ঢাকা ও রংপুরে ডেইরী ফার্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশে রাইপুর জেলায় ভাল গরু জোগাইবার জন্যও একটী সমবায় সমিতির সৃষ্টি হইয়াছে।

সুতরাং দেখিতে পাওয়া যায় ১৯১২ খৃষ্টাব্দের কোঅপারেটিভ ধারা দ্বারা সামাজিক কল্যাণ সাধনের আর একটী পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত অধিকাংশ লোকই এখনো যৌথ ক্রয় বিক্রয় সমিতির উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করে নাই। এই নূতন পন্থা দ্বারা কেবল কৃষক কেন আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত গৃহস্থের যেরূপ আর্থিক দুরবস্থা তাহাতে তাঁহাদের অচিরে হয় পাশ্চাত্য ধরণের সমবায় সমিতির আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত, নয়তো দেশীয় ধর্ম্মগোলা, নিধি অথবা কুটু চিট্টি ফণ্ড ইত্যাদির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া কাজে লাগাইয়া অবস্থার উন্নতি করা দরকার। এই যৌথ ক্রয় বিক্রয় সমিতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আইরলাণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। কি করিয়া তাহা হইয়াছে সেই সব কথা সবিস্তারে অন্য প্রবন্ধে বলিব। এই পন্থানুসারে সমিতির সভ্যদিগের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া দোকান খোলা হয়। সেই দোকানে ফ্যাক্টরী হইতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সমূহ পাইকারী দরে কিনিয়া আনিয়া মজুত রাখা হয়। সমিতির সভ্যগণ পাইকারী দরেই প্রয়োজনীয় সামগ্রী ঐ দোকান হইতে ক্রয় করিতে পারেন; কিন্তু বাহিরের লোকের নিকট খুচরা বাজার দরে বিক্রয় হয়। এই উপায়ে সমিতির সভ্যগণ সংসার খরচ কমাইতে সক্ষম হন। আইরল্যাণ্ডের সমবায় সমিতির ইতিহাস পড়িলে জানিতে পারা যায় যে যৌথ ক্রয় বিক্রয় সমিতি সেই দেশের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার কি আশ্চর্য্যজনক পরিবর্ত্তন করিয়াছে। আমাদের দেশের শিক্ষিত জনমণ্ডলী ও অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া মাড়োয়ারীকে রক্ত চুষিতে না দিয়া একমন একপ্রাণ হইয়া মিলিত চেষ্টায় আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিয়া দেখুন কি আশ্চর্য্য ফল লাভ হয়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

কতিপয় আবিষ্কারের ইতিহাস।

গ্রামোফনের ইতিহাস।

আমেরিকার ওহিও প্রদেশস্থ মিল নামক ক্ষুদ্র নগরীতে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে টমাস্ আলভা এডিসনের জন্ম হয়। তাঁহার ন্যায় ক্ষণজন্মা পুরুষ জগতে বিরল, তাঁহার অদ্ভুত অদ্ভুত আবিষ্কারে জগৎ স্তম্ভিত, কিন্তু তিনি যেরূপ সামান্য অবস্থা হইতে জ্ঞান-রাজ্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, অতি অল্প লোকেই সেরূপ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। প্রথম অবস্থায় তিনি দেট্রোয়া ও পোর্ট হিউরন্ নামক দুই সহরের মধ্যবর্ত্তী ষ্টেসন গুলির প্লাটফরমে খবরের কাগজ, ফল এবং খেলনা বিক্রয় করিতেন, ইহাতে তাঁহার বেশ লাভ হইত এবং কিছু সঞ্চয়ও হইত। সেই সময়ে কতিপয় বিশেষ সংবাদের জন্য তত্রত্য লোক বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায়, এডিসন টেলিগ্রাফ আফিসের কর্ম্মচারীগণের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া ঐ সকল সংবাদ সর্ব্বাগ্রে আনাইয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং দুই আনার কাগজ আগ্রহাতিশয় বিশিষ্ট ক্রেতাবর্গকে আট আনায় বিক্রয় করিতে লাগিলেন। তখন হইতে টেলিগ্রাফ ও ছাপাখানার উপর তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। তিনি একটী পুরাতন ছাপিবার কল ও কতকগুলি পুরাতন অক্ষর লইয়া ট্রেণের একখানি মাল গাড়ীতে Grand Trunk Herald নামক একখানি খবরের কাগজ ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে তাঁহার এত লাভ হইল যে, তিনি Paul Pry নামক আর একখানি কাগজ বাহির করিলেন। কিন্তু এই কাগজে কোন ব্যক্তি বিশেষকে ঠাট্টা করাতে সেই ব্যক্তি এডিসনকে ধরিয়া নদীতে ফেলিয়া দেয়। সেই অবধি তিনি ছাপাখানার কার্য্য পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হন।

ইত্যবসরে তিনি নানাবিধ রাসায়নিক পরীক্ষায়ও নিযুক্ত ছিলেন। একদিন দৈবক্রমে রাসায়নিক পদার্থগুলি সেই মাল গাড়ীতে পড়িয়া যাওয়ায় ট্রেণে আগুন লাগিবার উপক্রম হয়, তজ্জন্য গার্ড সাহেব রাগিয়া এডিসনকে ধাক্কা দিয়া গাড়ী হইতে ফেলিয়া দেয় এবং তাঁহার কাণে এমন এক ঘুঁসি মারে যে, আজ পর্য্যন্ত এডিসন ঐ কাণে কিছু কম শোনেন। হায়,

গার্ড সাহেব তখন স্বপ্নেও ভাবে নাই যে সেই ফল, মূল ও খবরের কাগজ বিক্রেতা (যাহার কাণে সে আঘাত করিল) বুদ্ধি ও বিদ্যা বলে জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া নরজগতে অমরত্ব লাভ করিবে।

এডিসন যখন খবরের কাগজ প্রকাশ করেন, সেই সময় হইতেই টেলিগ্রাফের উপর তাঁহার বিশেষ ঝোঁক পড়ে। তিনি ঐ বিষয় শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে একজন টেলিগ্রাফের কেরাণীপদে নিযুক্ত হন। তাঁহার অধ্যবসায় ও আগ্রহ দর্শনে সকলেই বুঝিল যে, এডিসন সামান্য বালক নহে। তিনি কখনও মদ্যপান করিতেন না, অথবা আলস্যে অনর্থক ক্রীড়া কৌতুকে সময় নষ্ট করিতেন না—সর্ব্বদা কোনও না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন।

যখন টেলিগ্রাম আফিসে কার্য্য করিতেন, তখন এডিসন বৈদ্যুতিক বার্ত্তাবহের নূতন নূতন শক্তির পরিচয় পাইলেন। তিনি দেখিলেন একই তারের দ্বারা দুই বা ততোধিক বার্ত্তা ভিন্ন ভিন্ন দিকে পাঠান যাইতে পারে। এই সময়ে তিনি নানাবিধ আবিষ্কার করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিতে লাগিলেন। গ্রামোফোন, বায়স্কোপ, মাইক্রোফোন প্রভৃতি তাঁহার সহস্রাধিক আবিষ্কারের মধ্যে কয়েকটী মাত্র। তাঁহার সমুদয় আবিষ্কারের সংখ্যা এক সহস্রের উপর।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সার চার্লস্ হুইট্‌ষ্টোন্ ও উলিয়াম কুক্ প্রথম টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেন। সেই আবিষ্কার এক যুগান্তর উপস্থিত করে কারণ তাহার পর হইতে আবিষ্কারের পর আবিষ্কার আরম্ভ হয় ও এখন পর্য্যন্ত চলিতেছে। সুবিখ্যাত লর্ড কেল্‌ভিন্ ঐ সকল আবিষ্কারের কতকগুলি বাহির করেন, কিন্তু অধিকাংশগুলি এডিসনের দ্বারায় আবিষ্কৃত হয়।

টেলিফোন যন্ত্র যদিও এডিসনের দ্বারা আবিষ্কৃত হয় নাই, তথাপি তাঁহার দ্বারা উহার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণির অন্তর্গত ফ্রাঙ্কফোর্ট নামক স্থানের রিস্ নামক এক ব্যক্তি আবিষ্কার করেন যে সঙ্গীত যন্ত্রের ধ্বনি বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে অনেক দূরে পাঠান যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রথম টেলিফোন যন্ত্র অর্থাৎ মনুষ্যের কথা একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রেরণ করিতে সক্ষম, এরূপ যন্ত্র আমেরিকা নিবাসী প্রফেসার গ্রেহাম বেল্ কর্ত্তৃক ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়। সেই বৎসরেই এডিসন তাঁহার "কার্ব্বণ ট্রান্সমিটার" নামক যন্ত্র বাহির করেন, এই যন্ত্র না থাকিলে গ্রেহাম বেলের টেলিফোন বিশেষ

কাযে আসিত না, কারণ এডিসনের "কার্ব্বণ ট্রান্সমিটার"কে প্রকৃত পক্ষে মাইক্রোফোন অর্থাৎ সামান্য শব্দকে বহুগুণ বাড়াইবার যন্ত্র বলা যাইতে পারে। এই মাইক্রোফোন যন্ত্রের দ্বারা শব্দ এত বৃদ্ধি পায় যে মক্ষিকার পদধ্বনি সৈন্য শ্রেণীর গম্ভীর পদবিক্ষেপ বলিয়া ভ্রম হয়। চিত্রকরের তুলিকা কাগজে টানিলে যে শব্দ হয়, তাহা ত কানে আদৌও শুনা যায় না, কিন্তু মাইক্রোফোনের সাহায্যে শুনিলে উহাকে অরণ্যের প্রবল ঝটিকা বলিয়া বোধ হইবে।

এডিসন আর সেই সংবাদপত্র বিক্রেতা নহে, তখন তাঁহার ধন ও মান যশঃ যথেষ্ট। কিন্তু বয়স মোটে ২৬ বৎসর মাত্র। নিউইয়র্ক হইতে ১৪ মাইল দূরে মেন্‌লো পার্কে তখন তাঁহার সুবিস্তৃত কারখানা, এই কারখানার ভিতরে লাইব্রেরী ও নানাবিধ কল প্রভৃতি স্থাপিত। এই কারখানার যে অংশে পরীক্ষার কার্য্য সম্পন্ন হইত শুধু সেই অংশ নানাবিধ যন্ত্রাদি দ্বারা সজ্জিত করিতে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহা হইতে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় মেন্‌লো পার্কের সমুদয় কারখানা নির্ম্মাণ করিতে কত টাকা ব্যয় হইয়াছে। এডিসনকে লোকে মেনলো পার্কের যাদুকর বলিত। বাস্তবিক তাঁহার অদ্ভুত ও বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলির কথা শ্রবণ করিলে তাঁহাকে যাদুকর বলিয়াই মনে হয়।

এক্ষণে কিরূপে গ্রামোফোন আবিষ্কৃত হইল তাহার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত এই,—১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে একদিন এডিসন যখন টেলিফোন লইয়া ব্যস্ত, তিনি একটি ছোট নলের (Cyliner) উপর আল্‌পিন বা সেইরূপ কোনও তীক্ষ্ণ পদার্থের দ্বারা টেলিগ্রাফে যেরূপ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। টেলিগ্রাফের চিহ্ন বা অক্ষরগুলি টেলিফোনে ব্যবহার করিবার অভিপ্রায়ে তিনি যখন টেলিফোন যন্ত্রে কথা কহিতেছিলেন, তখন হঠাৎ সেই আলপিন তাঁহার ফুটিয়া যায়। অপর লোক হইলে এ বিষয় গ্রাহ্যই করিত না। কিন্তু তাঁহার আঙ্গুলে এই আল্‌পিন ফোটাই ফনোগ্রাফ আবিষ্কারের মূল।

জলে একখণ্ড প্রস্তর ফেলিলে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, এবং ঐ তরঙ্গগুলি চক্রাকারে ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে কিনারায় আসিয়া মিশিয়া যায়, সেইরূপ আমরা যখন কথা কহি বা কোনও শব্দ করি, তখন ইথার নামক একপ্রকার সর্ব্বব্যাপী অতি সূক্ষ্ম পদার্থের ঐরূপ কম্পন (Vibration) উৎপন্ন হয়, সেই কম্পন বা তরঙ্গ আমাদের কর্ণপটাহে আসিয়া আঘাত করিলে তবে আমরা ঐ কথা বা শব্দ শুনিতে পাই। এডিসনের আঙ্গুলে যখন আল্‌পিন

ফুটিল তখন তিনি ভাবিলেন যে, ইথারের কম্পন বা তরঙ্গের যখন এত জোর যে উহা আমার অঙ্গুলিতে আল্‌পিন বিদ্ধ করিয়া দিল, তখন ঐ আল্‌পিন সাহায্যে ঐ কম্পনগুলির চিহ্ন কোন না কোনও পদার্থের উপর অঙ্কিত করা যাইতে পারিলে অবশ্য তরঙ্গগুলির চিহ্ন রক্ষা করা সম্ভব, এবং একবার ঐ চিহ্নগুলি রক্ষা করিতে পারিলে যেমন সীসার হরপে যে কোনও অক্ষর যতবার ইচ্ছা ছাপা যায় সেইরূপ ঐ রক্ষিত চিহ্নগুলির দ্বারা সেই শব্দ কেন না যতবার ইচ্ছা উৎপন্ন করা যাইবে? যুক্তি অকাট্য, এডিসন ঐ যুক্তি কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিলেন।

তিনি টেলিফোন যন্ত্রের মুখে 'হ্যালো' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং সেই সময়ে একখণ্ড টেলিগ্রাফের কাগজ ঐ যন্ত্রের অপর দিকে যে পিন্ সংলগ্ন ছিল তাহার নীচে কথা কহিবার সময় সরিয়া সরিয়া যায়। তাহার পর ঐ কাগজখণ্ড ঐ আল্‌পিনের নীচে দিয়া বিপরীত দিকে যেমনি ফিরাইতে লাগিলেন, অমনি তাঁহার উচ্চারিত 'হ্যালো' 'হ্যালো' এই কথা মৃদুস্বরে পুনরুচ্চারিত হইতে শুনিতে পাইয়া পুলকিত হইলেন। তাঁহার যুক্তি যে অকাট্য তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাইলেন। এখন তিনি কোন্ পদার্থের উপর ঐ ইথারের কম্পন বা তরঙ্গ ধরিয়া রাখিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। নানাবিধ পদার্থ পরীক্ষা করিয়া এডিসন অবশেষে মোম নির্ম্মিত রেকর্ডের উপর ঐ তরঙ্গ ধরিয়া রাখিবার অর্থাৎ রেকর্ড প্রস্তুত করিবার কল্পনা করিলেন। তিনি তাঁহার সহকারী মিঃ ক্রুজিকে তাঁহার প্রথম ফনোগ্রাফ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন। ক্রুজি তাঁহার কথামত ঐ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন বটে, তবে ফলাফল সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান হইলেন। যন্ত্রের মুখে এডিসন যখন কথা কহিতে লাগিলেন তখন ক্রুজি দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন সেই নল বা সিলেণ্ডার অর্থাৎ রেকর্ড বিপরীত দিকে ফিরাইতে লাগিলেন তখন ঐ ফনোগ্রাফ যন্ত্র হইতে তাঁহার কথা পুনরুচ্চারিত হইতে লাগিল। তাহা শুনিয়া ভয়ে ক্রুজি পতনপ্রায় হইলেন, এডিসন নিজে স্বীকার করিলেন যে তিনি স্বয়ং অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। এইরূপে ফনোগ্রাফ সৃষ্টি হইল। এখন ঘরে ঘরে গ্রামফোনের সঙ্গীতে শত শত লোক বিমলানন্দ উপভোগ করিতেছে।

গ্যাসের আলো আবিষ্কার।

স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী উইলিয়াম মারডচ্ সর্ব্বপ্রথমে কয়লা হইতে গ্যাসের আলো আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারে তাঁহার কোনরূপ আর্থিক উন্নতি না হইলেও এজন্য তিনি প্রভূত যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

আয়ার সায়ারের অন্তর্গত ওল্ড কামনক্ গ্রামে তাঁহার পিতা একজন সামান্য কলের মিস্ত্রি ছিলেন। ১৬০ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামে পর্ণ কুটীরে তাহার জন্ম হয়। যৌবন কালে তিনি গতিশীল জান প্রস্তুত করিতে বিশেষ কৌশল প্রয়োগ করেন। একটি কাঠের ঘোড়া তৈয়ার করিয়া তিনি ভাইদের সহিত তাহার উপর চড়িয়া কামনক্ গ্রামের স্কুলে পড়িতে যাইতেন। নব্যযুগে যত প্রকার গতিশীল যান আবিষ্কার হইয়াছিল তাহার মধ্যে এটিও বেশ প্রশংসার সহিত স্থানলাভ করিয়াছিল।

২৩ বৎসর বয়সে তিনি ইংলণ্ডে আগমন করিয়া বারমিংহাম সহরে মেসার্স বুল্টন এণ্ড ওয়াট্ নামক কোম্পানিতে চাকরী করিতে আরম্ভ করেন। ইংরাজেরা চ ভাল উচ্চারণ করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহার নাম মারডচ্ বদলাইয়া মারডক্ করিতে হয়। এই বারমিংহাম সহরে একজন প্রতিভাসম্পন্ন লোকের সহিত তাহার আলাপ পরিচয় হয়। এই ওয়াটই ষ্টীম ইঞ্জিনের অনেক বিখ্যাত আবিষ্কারক। যখন তিনি কার্য্যালয় হইতে রাত্রে বাড়ী ফিরিতেন তখন তহার আলোর দরকার হইত। এজন্য তিনি সকল প্রকার কয়লার শক্তি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং অবশেষে তিনি কৃতকার্য্য হইলেন। ইহার পর হইতে রাত্রিতে বাড়ী যাইবার সময় বাহুর নিম্নে তিনি একটি গ্যাসপূর্ণ থলে লইয়া যাইতেন। কনুইএর দ্বারা এই পাত্রস্থিত গ্যাসকে চাপ দিলে পাত্রসংলগ্ন নলের প্রান্তভাগে গ্যাস জ্বলিয়া উঠিত।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বারমিংহামে তাঁহার কারখানা আলোকিত করিবার জন্য এক যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। ব্যবসাক্ষেত্রে গ্যাসের ব্যবহার এই প্রথম হয়। ৪৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি সপ্তাহে এক পাউণ্ডের অধিক বেতন পাইতেন না। এই সামান্য উপার্জ্জনেই তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট থাকিতেন, কখন অধিক অর্থের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। যাহা হউক ৮৫ বৎসর বয়সে বারমিংহাম সহরে দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্ব বৎসরে তিনি মাত্র এক হজার পাউণ্ড অর্জ্জন করিয়াছেন।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার।

কথিত আছে যে এক জন হল্যাণ্ডবাসী চশমা প্রস্তুতকারী সর্ব্বপ্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। একদিন দোকান ঘরে তাঁহার পুত্রকন্যাগণ খেলা করিতে করিতে দুইখানি কুব্জ ও ন্যুব্জ কাচ এমনভাবে স্থাপন করিল যে, যাহার মধ্য দিয়া দূরের বস্তু নিকটে ও বড় দেখা যাইতে লাগিল। আবিষ্কারক তখন তাহাদের নিকটেই ছিলেন,—তিনি এই সন্ধান হইতে ক্রমে দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইলেন।

নূতন নক্ষত্র।

সম্প্রতি সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ প্লাস্কেট্ সাহেব একটি নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ইনি নিজের নামে ইহার নাম রাখিয়াছেন। নবাবিষ্কৃত এই প্লাস্কেট্ নক্ষত্র পৃথিবী হইতে পাঁচ লক্ষ পঁচিশ হাজার ছয় শত মাইল দূরে রহিয়াছে, এবং পৃথিবীতে তার আলো আসিতে দশ হাজার বৎসর লাগিয়াছে। পৃথিবী হইতে ঘণ্টায় ২০০ মাইল বেগে এরোপ্লেন চালাইয়া ইহার নিকট পৌঁছিতে তিন লক্ষ বৎসরের আবশ্যক হয়।

"সম্মিলনী"।

স্ত্রীজাতির অবনতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদের শয়ন-কক্ষে যেমন সূর্য্যালোক প্রবেশ না করে, তদ্রূপ মন-কক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পায় না। যেহেতু আমাদের উপযুক্ত স্কুল কলেজ এক প্রকার নাই। পুরুষ যত ইচ্ছা অধ্যয়ন করিতে পারেন—কিন্তু আমাদের নিমিত্ত জ্ঞানরূপ সুধাভাণ্ডারের দ্বার কখনও সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইবে কি? যদি কোন উদারচেতা মহাত্মা দয়া করিয়া আমাদের হাত ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সহস্র জনে বাধা বিঘ্ন উপস্থিত করেন।

সহস্র জনের বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া একজনের কার্য্য নহে। তাই একটু আশার আলোক দীপ্তি পাইতে না পাইতে চির নিরাশার অন্ধকারে বিলীন হয়। স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে অধিকাংশ লোকের কেমন একটা কুসংস্কার আছে যে তাঁহারা "স্ত্রী শিক্ষা" শব্দ শুনিলেই "শিক্ষার কুফলের" একটা ভাবী বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শত দোষ সমাজ অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া থাকে, কিন্তু সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলা দোষ না না করিলেও সমাজ কোন কল্পিত দোষ শতগুণ বাড়াইয়া সে বেচারীর ঐ "শিক্ষার" ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় এবং শতকণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে "স্ত্রীশিক্ষাকে নমস্কার!"

আজি কালি অধিকাংশ লোকে শিক্ষাকে কেবল চাকরী লাভের পথ মনে করে। মহিলাগণের চাকরী গ্রহণ অসম্ভব সুতরাং এই সকল লোকের পক্ষে স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

ফাঁকা তর্কের অনুরোধে আবার কোন নেটিভ খৃষ্টিয়ান হয়ত মনে করিবেন যে রমণীর জ্ঞানপিপাসাই মানবজাতির অধঃপাতের কারণ; যেহেতু শাস্ত্রে (Genesisএ) দেখা যায়, আদিমাতা হাভা (Eve) জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি এবং আদম উভয়েই স্বর্গচ্যুত হইয়াছেন!*

যাহা হউক "শিক্ষার" অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের 'অন্ধ অনুকরণ' নহে। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা (Faculty) দিয়াছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি (Develop) করাই শিক্ষা। ঐ গুণের সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ। ঈশ্বর আমাদিগকে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মন এবং চিন্তাশক্তি দিয়াছেন। যদি আমরা অনুশীলন দ্বারা হস্তপদ সবল করি, হস্তদ্বারা সৎকার্য্য করি, চক্ষু দ্বারা মনোযোগ সহকারে দর্শন

---

* পরন্তু ইউরোপীয় খৃষ্টানদের বিশ্বাস যে Eve অভিশপ্তা হইয়াছিলেন, সত্য; কিন্তু যীশুখৃষ্ট আসিয়া নারীজাতিকে সে অভিশাপ হইতে মুক্তি দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন "Through woman came curse and sin; and through woman came blessing and salvation also"—(ভাবার্থ-নারীর দোষে জগতে অভিশাপ এবং পাপ আসিয়াছে এবং নারীর কল্যাণেই আশীর্ব্বাদ এবং মুক্তি আসিয়াছে)। পুরুষ খৃষ্টের পিতা হয় নাই, কিন্তু রমণী যীশুখৃষ্টের মাতৃপদ প্রাপ্তে গৌরবান্বিতা হইয়াছেন।

(বা Observe) করি, কর্ণদ্বারা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করি, এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিতে শিখি—তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আমরা কেবল "পাশকরা বিদ্যা"কে প্রকৃত শিক্ষা বলি না। দর্শনশক্তির বৃদ্ধি বা বিকাশ সম্বন্ধে একটি উদাহরণ দিতেছি—

যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু ধূলি কর্দ্দম ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না, সেখানে (বিজ্ঞানের) শিক্ষিত চক্ষু অনেক মনোরম চমৎকার বস্তু দেখিতে পায়। আমাদের পদদলিত যে কাদাকে আমরা কেবল মাটী, বালি, কয়লার কালী ও জল মিশ্রিত পদার্থ বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করি, বিজ্ঞানবিদ্ তাহা বিশ্লিষ্ট করিলে নিম্নলিখিত বস্তু চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইবেন। যথা—বালুকা বিশ্লেষণ করিলে শাদা পাথর বিশেষ (Opal) ; কর্দ্দম পৃথক করিলে চিনেবাসন প্রস্তুত করণোপযোগী মৃত্তিকা, অথচা নীলকান্ত মণি ; পাথর-কয়লার কালি দ্বারা হীরক। এবং জল দ্বারা একবিন্দু নীহার! দেখিলেন ভগিনি! যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু কর্দ্দম দেখে, সেখানে শিক্ষিত চক্ষু হীরা মাণিক দেখে! আমরা যে এহেন চক্ষুকে চিরঅন্ধ করিয়া রাখি, এজন্য খোদার নিকট কি উত্তর দিব ?

মনে করুন আপনার দাসীকে আপনি একটা সম্মার্জ্জনী দিয়া বলিলেন, "যা, আমার অমুক বাড়ী পরিষ্কার রাখিস্।" দাসী সম্মার্জ্জনীটা আপনার দান মনে করিয়া অতি যত্নে জরির ওয়াড়ে ঢাকিয়া উচ্চস্থানে তুলিয়া রাখিল—কোন কালে ব্যবহার করিল না। এ দিকে আপনার বাড়ী ক্রমে ক্রমে আবর্জ্জনাপূর্ণ হইয়া বাসের অযোগ্য হইল! অতঃপর আপনি যখন দাসীর কার্য্যের হিসাব লইবেন, তখন বাড়ীর দুরবস্থা দেখিয়া আপনার মনে কি হইবে ? শতমুখী ব্যবহার করিয়া বাড়ী পরিষ্কার রাখিলে আপনি খুসী হইবেন, না তাহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিলে সন্তুষ্ট হইবেন ?

বিবেক আমাদিগকে আমাদের প্রকৃত অবনতি দেখাইয়া দিতেছে—এখন উন্নতির চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

আমাদের উচিত যে স্বহস্তে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করি। একস্থলে আমি বলিয়াছি "ভরসা কেবল পতিতপাবন" কিন্তু ইহার স্মরণ রাখা উচিত যে, উর্দ্ধে হস্ত উত্তোলন না করিলে পতিতপাবনও হাত-ধরিয়া তুলিবেন না। ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য করেন যে নিজে নিজের সাহায্য করে, "(God helps those who help themselves)।" তাই বলি আমাদের অবস্থা

আমরা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না। ভাবিলেও তাহাতে আমাদের ষোলআনা উপকার হইবে না।

অনেকে মনে করেন যে পুরুষের উপার্জ্জিত ধন ভোগ করে বলিয়া নারী তাহার প্রভুত্ব সহ্য করে। কথাটা অনেক পরিমাণে ঠিক। বোধ হয় স্ত্রীজাতি প্রথমে শারীরিক শ্রমে অক্ষম হইয়া পরের উপার্জ্জিত ধনভোগে বাধ্য হয়। এবং সেই জন্য তাহার মস্তক নত করিতে হয়। কিন্তু এখন স্ত্রীজাতির মন পর্যন্ত দাস (Enslaved) হওয়ায় দেখা যায়, যে স্থলে দরিদ্রা স্ত্রীলোকের সূচীকর্ম্ম বা দাসীবৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পতি-পুত্র পালন করে, সেখানেও ঐ অকর্ম্মণ্য পুরুষেরাই "স্বামী" থাকে। আবার যিনি স্বয়ং উপার্জ্জন না করিয়া প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করেন তিনিও ত স্ত্রীর উপর প্রভুত্ব করেন এবং স্ত্রী তাঁহার প্রভুত্বে আপত্তি করেন না।* ইহার কারণ এই যে বহুকাল হইতে নারী হৃদয়ের উচ্চবৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায় নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিষ্ক, হৃদয় সবই "দাসী" হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর আমাদের হৃদয়ে স্বাধীনতা, ও ওজস্বিতা বলিয়া কোন বস্তু নাই—এবং তাহা লাভ করিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত লক্ষিত হয় না। তাই বলিতে চাই—

"অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনি!

প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে, জানি; সমাজ মহা গোলযোগ বাধাইবে জানি; ভারত-বাসী মুসলমান আমাদের জন্য "কৎল"এর (অর্থাৎ প্রাণদণ্ডের) বিধান দিবেন এবং হিন্দু চিতানল বা তুষানলের ব্যবস্থা দিবেন, জানি!† (এবং ভগিনিদিগেরও জাগিবার ইচ্ছা নাই জানি!) কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত জাগিতে হইবেই। বলিয়াছি ত কোন ভাল কাজ অনায়াসে করা যায় না। কারামুক্ত হইয়াও গালিলিও বলিয়াছিলেন, কিন্তু যাহাই

---

* বঙ্গীয় কোন কোন সমাজের স্ত্রীলোক যে স্বাধীনতার দাবী করিয়া থাকেন, তাহা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে—ফাঁকা আওয়াজ মাত্র।

† সমাজের সমজদার (Reasonable) পুরুষেরা প্রাণ দণ্ডের বিধান নাও দিতে পারেন, কিন্তু "Unreasonable" অবলা সরলাগণ (যাঁহারা যুক্তি তর্কের ধার ধারেন না, তাঁহারা) শতমুখী বা আঁইস বঁটীর ব্যবস্থা নিশ্চয় দিবেন, জানি।

হউক পৃথিবী ঘুরিতেছে (But nevertheless it (Earth) does move) !!" আমাদিগকেও ঐরূপ বিবিধ নির্য্যাতন সহ্য করিয়া জাগিতে হইবে। এস্থলে পার্সী নারীদের একটী উদাহরণ দিতেছি। নিম্নলিখিত কতিপয় পংক্তি একখণ্ড উর্দ্দু সংবাদপত্র হইতে অনুদিত হইল।—

এই পঞ্চাশ বর্ষের মধ্যে পার্সী মহিলাদের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বিলাতী সভ্যতা, যাহা তাঁহারা এখন লাভ করিয়াছেন, পূর্ব্বে ইহার নাম মাত্র জানিতেন না। মুসলমানদের ন্যায় তাঁহারাও পর্দ্দায় (অর্থাৎ অন্তঃপুরে) থাকিতেন। রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাঁহারা ছত্র ব্যবহারে অধিকারিণী ছিলেন না। প্রখর রবির উত্তাপ সহিতে না পারিলে জুতাই ছত্ররূপে ব্যবহার করিতেন !! গাড়ীর ভিতর বসিলেও তাহাতে পর্দ্দা থাকিত। অন্যের সম্মুখে স্বামীর সহিত আলাপ করিতে পাইতেন না। কিন্তু আজি কালি পার্সী মহিলাগণ পর্দ্দা ছাড়িয়াছেন! খোলা গাড়ীতে বেড়াইয়া থাকেন। অন্যান্য পুরুষের সহিত আলাপ করেন। নিজেরা ব্যবসায় (দোকানদারী) করেন। প্রথমে যখন কতিপয় ভদ্রলোক তাঁহাদের স্ত্রীকে পর্দ্দার বাহির করিয়াছিলেন, তখন চারিদিকে ভীষণ কলরব উঠিয়াছিল। ধবলকেশ বুদ্ধিমানগণ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর ধ্বংশকাল উপস্থিত হইল!"

কই পৃথিবী ত ধ্বংশ হয় নাই। তাই বলি, একবার একই সঙ্গে সকলে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হও, সময়ে সবই সহিয়া যাইবে। স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা বুঝিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কি করিলে লুপ্তরত্ন উদ্ধার হইবে? কি করিলে আমরা দেশের উপযুক্ত কন্যা হইব? প্রথমতঃ সাংসারিক জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলিবার ইচ্ছা অথবা দৃঢ় সংকল্প আবশ্যক এবং আমরা যে গোলাম জাতি নই, এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

পুরুষের সমকক্ষতা ‡ লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব।

---

‡ আমাদের উন্নতির ভাব বুঝাইবার জন্য পুরুষের সমকক্ষতা বলিতেছি। নচেৎ কিসের সহিত এ উন্নতির তুলনা দিব? পুরুষদের অবস্থাই আমাদের উন্নতির আদর্শ।

আবশ্যক হইলে আমরা লেডী কেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী ম্যাজিষ্ট্রেট, লেডী ব্যারিষ্টর, লেডী জজ—সবই হইব। পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডী Viceroy হইয়া এদেশের সমস্ত নারীকে "রাণী" করিয়া ফেলিব! উপার্জ্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, পা নাই? কি নাই? যে পরিশ্রম আমরা স্বামীর গৃহকার্য্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?*

আমরা যদি রাজকীয় কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিব। ভারতে বর দুর্লভ হইয়াছে বলিয়া কন্যাদায়ে কাঁদিয়া মরি কেন? কন্যাগুলিকে

একটা পরিবারের পুত্র ও কন্যায় যে প্রকার সমকক্ষতা থাকা উচিত, আমরা তাহাই চাই। যেহেতু পুরুষ সমাজের পুত্র, আমরা সমাজের কন্যা! আমরা ইহা বলি না যে, "কুমারের মাথায় উষ্ণীষ দিয়াছেন, কুমারীর মাথায়ও তাহাই দিবেন।" বরং এই বলি, কুমারের মস্তক শিরস্ত্রাণে সাজাইতে যতখানি যত্ন ও ব্যয় করা হয় কুমারীর মাথা ঢাকিবার ওড়নাখানা প্রস্তুতের নিমিত্ত ততখানি যত্ন ব্যয় করা হউক।"

* কিন্তু আমাদিগকে তাহা করিতে হইবে কেন? কৃষক প্রজা থাকিতে জমিদার কাঁধে লাঙ্গল লইবেন কেন? শুধু রাজার চাকুরী ছাড়া কি কোন উচ্চদরের কার্য্য কি আমরা করিতে পারি না? কেরাণী ইত্যাদি কথা কেবল উদাহরণ স্বরূপ বলা হইল। যেমন স্বর্গের বর্ণনায় বলিতে হয়—সেখানে শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, কেবল চিরবসন্ত বিরাজমান থাকে। স্বর্গোদ্যানে মরকত লতিকায় হীরক-প্রসূন ফোটে!! তাই আমাদে উচ্চ আশা বুঝাইবার নিমিত্ত লেডী ভাইসরয়ের কথা না বলিলে কিসের সহিত আমাদের সে উচ্চদরের কার্য্যের উপমা দিব?

আবার ইহাও বলি, লেডী কেরাণী হওয়ার কথা কেবল বঙ্গদেশে যেমন shocking বোধ হয়, সেরূপ অন্যত্র বোধ হয় না। আমেরিকায় লেডী কেরাণী বা লেডী ব্যারিষ্টার বিরল নহে। এবং এমন একদিনও ছিল যখন অন্যান্য দেশের মুসলমান সমাজে "স্ত্রীকবি, স্ত্রী-দার্শনিক, স্ত্রীঐতিহাসিক, স্ত্রীবৈজ্ঞানিক, স্ত্রীবক্তা, স্ত্রীচিকিৎসক, স্ত্রীরাজনীতিবিদ্" প্রভৃতি কিছুরই অভাব ছিল না। কেবল বঙ্গীয় মোসলেম সমাজে ওরূপ রমণীরত্ন নাই।

সুশিক্ষিতা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জ্জন করুক। কার্য্যক্ষেত্রেও পুরুষের পরিশ্রমের মূল্য বেশী, নারীর কাজ সস্তায় বিক্রয় হয়। নিম্নশ্রেণীর পুরুষ যে কাজ করিলে মাসে দুই টাকা বেতন পায় ঠিক সেই কাজে স্ত্রীলোক ১৲ পায়। চাকরের খোরাকী মাসে ৮৲ আর চাকরাণীর খোরাকী ৬৲। অবশ্য কথন কথন স্ত্রীলোককে পারিশ্রমিক বেশী পাইতেও দেখা যায়।

যদি বল, আমরা দুর্ব্বলভূজা, মূর্খ, হীনবুদ্ধি নারী। সে দোষ কাহার? আমাদের। আমরা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তাহা হীনতেজ হইয়াছে এখন অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করিব। যে বাহুলতা পরিশ্রম না করায় হীনবল হইয়াছে, তাহাকে খাটাইয়া সবল করিলে হয় না? এখন একবার জ্ঞানচর্চ্চা করিয়া দেখি ত এ অনুর্ব্বর মস্তিষ্ক (dull head) সুতীক্ষ্ণ হয় কি না!

পরিশেষে বলি, আমরা সমাজেরই অর্দ্ধ অঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে—একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতামাতা—উভয়েরই সমান দরকার। কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সংসারিক জীবনের পথে—সর্ব্বত্র আমরা যাহাতে তাঁহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক। প্রথমতঃ উন্নতির পথে তাঁহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন—আমরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম। এখন তাঁহারা উন্নতি রাজ্যে গিয়া দেখিতেছেন সেখানে তাঁহাদের সঙ্গিনী নাই বলিয়া তাঁহারা একাকী হইয়া আছেন! তাই আবার ফিরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইতেছেন! এবং জগতের যে সকল সমাজের পুরুষেরা সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন। আমাদের উচিত যে তাঁহাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝা বিশেষ না হইয়া আমরা সহচরী সহকর্ম্মিণী সহধর্ম্মিণী ইত্যাদি হইয়া তাঁহাদের সহায়তা করি। আমরা অকর্ম্মণ্য পুতুল-জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই একথা নিশ্চিত।

ভরসা করি আমাদের সুযোগ্যা ভগ্নীগণ এ বিষয়ে আলোচনা করিবেন। আন্দোলন না করিলেও একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

'এডুকেশন গেজেট' শ্রীমতী রকেয়া হোসেন।

স্ত্রী-স্বাধীনতা।

এই কলি-যুগে স্বল্প পরমায়ু ও অধম মানব জাতির উদ্ধারের জন্যে চৈতন্য দেব যেমন সহজ উপায়ে হরিনাম সুধামৃত পানের ব্যবস্থা দিয়ে গিছ্‌লেন, তেমনি আমাদের কর্ম্ম-জীবনেও পরাধীনতার নাগপাশের সব বাঁধনগুলি একে একে ছিঁড়ে ফেলে স্বাধীন হওয়ার জন্যে কে যে কর্ম্মের দুরূহ পথটী ত্যাগ ক'রে, শুধু উচ্চ ঘোষণায় নাম-জপের সহজ উপায়টী দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, তা ঠিক্‌ আমার জানা নেই। তবে সেই থেকেই যে, দেশে কাযের চেয়ে বক্তৃতা আর লেখনীর প্রাদুর্ভাবটা বেশ বেড়ে গেছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এই উপায়ে কোথাও কোন জাতি স্বাধীনতা পেয়েছে কি না, তা আমাদের জানা না থাকলেও, আমরা বাঙ্গলার নারীসমাজেও ঐ একই পথ অনুসরণ ক'রে একই মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়েছি। আর বহুদিনের ভারতের অলস পরাধীন পুরুষজাতি যখন কর্ত্তব্য ভুলে স্বাধীনতার রসাস্বাদনের জন্যে উন্মত্ত ও লালায়িত, তখন আমরা নারী জাতিই বা চুপ ক'রে থাক্‌তে যাই কেন। আমাদেরও যে স্বাধীনতা চাই। কিন্তু সে স্বাধীনতা যেমনি হউক, আর তার স্বরূপ যাই কেন হউক না—বিশেষতঃ নারী ত' শুধু রাজনীতি ক্ষেত্রে পরাধীন নয়—সে যে সব ক্ষেত্রেই পরাধীন।

সমাজে, শিক্ষায়, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, কোনটাতেই ত' তার অধিকার নেই, সে যে সব দিকে আষ্টে পৃষ্টে বাঁধা, কিন্তু এ বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে স্বাধীনতা লাভের উপায় কি? তবে কি আমাদের অভিভাবকেরা যে সকল পথ অনুসরণ করে চলেছেন, আমরাও সেই সকল পথ অনুসরণ ক'রে চলব! কিন্তু কার কাছে গিয়ে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দাঁড়াব—ঘরের কাছে, না পরের কাছে? মিথ্যা লিখে, বক্তৃতা দিয়ে বিদ্রোহ করলে, কি কিছু ফল হ'বে—না আন্দোলনে, না ঘোষণায় স্বাধীনতা মিল্‌বে। শেষ কালে কি বাড়ী বাড়ী ধর্ম্মঘট করতে হবে? এ সকল উপায় ছাড়া আর কোন উপায়ও ত আমাদের শিক্ষা-গুরুদের কাছ হ'তে আমরা কোন দিন-ই পাইনি। যদি বলি তাঁদের কাছে আমরা কোন বিষয়েই ঋণী নই, তাহ'লে মিথ্যা বলা হবে, কেন না যা কিছু আমাদের শিক্ষা দীক্ষা সকলই'ত পুরুষের কাছে, আর তাঁদেরই অনুকরণে। তাই বলে পুরুষের দানে যে কোন দিনই আমাদের পেট ভর্‌তে পারে না, সে কথাও ধ্রুব সত্য।

সুতরাং আমাদের উপায়টাও যেমন একটু নূতন রকম করে ভেবে নিতে হবে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভাবতে হবে যে আমাদের পাওয়ার জিনিষটারও কিছু রদ বদল করতে হবে কি না। তাহ'লে আমাদের দেখতে হবে যে আমরা শুধু পরের বাঁধনেই বাঁধা, না নিজেদের খেই-হারা জীবনের শতেক ছিন্নসূত্র গ্রন্থিতে নিজেরাই জড়িয়ে পড়ে রইছি? যে চুরি করে, সে ত চিরকালের চোর, কিন্তু যারা সেই চোরকে আবহমানকাল প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে, আর শুধু প্রশ্রয় নয়, এমন কি চুরির উপস্বত্ব পর্য্যন্ত ভোগ করতে গিয়ে তার বিরুদ্ধে একটা কথা পর্য্যন্ত বলতে পারেনি তারাই সাধু? তারাও যে স্ত্রীলোক অবলা বলে, পার পেতে পারে না, একথা সবাই স্বীকার করবে! পুরুষের সঙ্গে আমরাও যে ধাপে ধাপে কত দূর নেমে এসেছি, তাকি আমরা একবারও চেয়ে দেখেছি?

আমাদের যে শত দোষ শত অপরাধ, আমাদেরও যে আর ময়লা মাটীতে চেনা যায় না। সেই আর্য্য রমণী যাঁদের চরিত্র, শিক্ষা, দীক্ষা, কর্ম্ম শুধু দেব দেবীদেরই সহিত তুলনা হতে পারতো, তাঁদের কি, সভ্য জগতের কোন রমণী সমাজের তুলনায় নিকৃষ্ট বলে পরিগণিত করতে পারা যায়?

আমরা সত্য সত্যই যদি নারী জাতীর প্রকৃত অধিকার চাই, আর মর্য্যাদা বুঝতে পেরে থাকি, তা হলে আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলবো যে, আমরা স্বাধীনতা চাই না—আমরা চাই মুক্তি। কেননা নির্দ্দোষ যে, সে চাইতে পারে স্বাধীনতা, কিন্তু দোষী তা পারে না, সে কেবল চাইতে পারে মুক্তি। নিরীহের উপর প্রবল যখন অন্যায় অত্যাচার করতে থাকে, মুক্তিকে যখন মুক্তির আলো থেকে টেনে এনে সয়তান তার পরাধীনতার কঠিন শৃঙ্খল পরিয়ে দেয়, অথবা ধার্ম্মিককে অধার্ম্মিক যখনি পেয়ে বসে, তখন তাদের বিরুদ্ধে স্ব, স্ব, আনুষঙ্গিক অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে দাঁড়ানর নাম বিদ্রোহ, আর তাদের পরাভব করে, নিজেদের জয় প্রতিষ্ঠার নাম স্বাধীনতা লাভ।

কিন্তু আমাদের এ সঙ্কোচ-কুণ্ঠিত অন্ধকারময় কলঙ্কিত জীবন নিয়ে পলাতক ফেরারী আসামীর মত সাধু সন্ন্যাসীর বেশ ধরে দেবতার মন্দিরে মুক্তি চাইতে যাব কোন মুখে? যে দিন আমরা আমাদের বহুকালের পুঞ্জীভূত অন্ধকার এবং কলঙ্ক কালিমাময় জীবনকে কর্ম্মের

দীপের শিখায় জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে খাঁটি উজ্জ্বল করে এনে তাঁর দ্বারে এসে পৌছাতে পারবো, সেই দিন সেই ক্ষণেই আমরা পাব তাঁরই দেওয়া আশীর্ব্বাদ—মুক্তিও চাই।

তাই আমরা বলতে চাই যে, কারও কাছে চাইবার আমাদের কিছু নেই। কিসের অভিমান? কিসের আক্ষেপ? কি নিয়ে আমরা অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাতে যাব, আমরা সব ভেঙ্গে ফেলে আবার নূতন করে নিজেদের গড়তে চাই যে গড়ন হবে সম্পূর্ণ নূতন, অথচ তার ভিত্তি হবে আমাদেরই দেশের ইট্ চুণ, বালি যা ধার করা নয়, অথচ সুকঠিন সুদৃঢ়।

নয় তো যে ভিত্তির উপর উঁচু মাথায় দাঁড়িয়ে আজ তোমরা আন্দোলনের ঢেউ তুলচো আর দেশে বিদেশে চোরাবালি মুঠো মুঠো করে কুড়িয়ে এনে নিজেদের ভিত্তি সুদৃঢ় করছো, আর পরেই ইমারতের তুলনা করে ভাবচো দ্রুত অগ্রসর হচ্চি, তারই ফল যখন একদিন (ঘোর-কাটা) চোখে দেখবে সেই দিন বুঝতে পারবে যে ঐ তোমাদেরই পার্শ্বে তোমাদের আপনার জন পুরুষেরা, যে গতিতে—যে শিক্ষায় দীক্ষায়, রীতিতে নীতিতে, আচারে অনুষ্ঠানে, গড়া ভাঙ্গায়, গড়ে উঠচে, তোমরাও তার একচুলও পরিবর্ত্তন করতে পার নি। আর যাদের সমাজের অগ্রগতি শুধু পতনের দিকে, যাদের শিক্ষা দীক্ষায় শুধু সঙ্কোচ এনে দেয়, যাদের অনুষ্ঠানের ফল শুধু জাতীয়তা মুছে ফেলে দেয়, যাদের ভবিষ্যত কেরাণীগিরির জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে তাদেরই মত তোমারও একদিন, টাইপ করতে, নয় টিকিট্ বিক্রয় করতে ছেলে স্কুলে চলেছ। জোর হয় ত দুখানা নভেল লিখবে, তাতে'ত মনুষ্য জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধন হবে না, তাই আমরাও বলি যে, সে স্বাধীনতার উঁচু মুখে আমাদের দরকার নেই, তা অপেক্ষা যদি আমরা সারা জীবন পরাধীন হয়ে থাকি সেও ভাল, কেননা পরোক্ষ ভাবে হয় ত আমাদের কোন পাপ স্পর্শ করবে না।

"বিজলি" শ্রীচারুশীলা দেবী।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

-:০:-

পরোপকারের ন্যায় মহত-ব্রত আর নাই কিন্তু যদি স্বার্থটা উহার অন্তরালে উঁকিঝুঁকি মারিতে না থাকে! মুখের মিষ্ট কথা শুনিতে বেশ—প্রাণ ঠাণ্ডা করে কিন্তু প্রাণ ঠাণ্ডার সহিত দেহটাকে ঠাণ্ডা করিবার মত অনুপাণ তাহাতে থাকিলে—মিষ্ট কথার পরিণাম হয় মরণ! মরণটা সর্ব্বদুঃখহর—যন্ত্রণার অবসানে হয় ত সুখের,—কিন্তু জীবন-মধু যে সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট,—জীবের চির-আকাঙ্ক্ষিত,—মৃত্যু তাহা হরণ করে, সুতরাং মরণ-সুখ যে দান করিতে চায় সে বন্ধু নহে। শক্তিহীনকে সাহায্য করে যে সে মহৎ কিন্তু যে শক্তিহীনকে সাহায্য করিবার অছিলায় আরও তাকে চিরপঙ্গু করিয়া চির অধীন করিতে চায়—সে মহত জনের বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী!—তাহা অতি মূঢ়ও বুঝে!

অষ্টপ্রহর দিবাকর-কর-সমুজ্জল সাম্রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় প্রধান মন্ত্রীর পার্লামেণ্টে এবারের ভারত সম্বন্ধে বক্তৃতায় অনেকের মনেই পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অনেক কথা উদিত হইয়াছে,—মন্ত্রীপ্রবরের মনের ভাব যদি আমাদের মহামতি সম্রাটের হইত তাহা হইলে বলিতে হইত 'সর্ব্বনাশ!' আমাদের আশা—সম্রাট ও সচিব এক নহেন,—একজন অস্থায়ী কর্ম্মচারী আর একজন প্রজার রক্ষক,—মহামনা আলেকজাণ্ড্রিয়া ভিক্টোরিয়ার বংশধর।

মিঃ লয়েড জর্জ্জ বলিয়াছেন—'ভারতের জনসাধারণের প্রতি আমাদের দায়িত্ব গুরুতর, আমাদের সে কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে না পারিলে ভারতে আমাদের প্রবেশ অধিকার নাই।' কথাটা অতি সত্য ও ন্যায়সঙ্গত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু হা হরি! এটা যদি তাঁহার মুখের কথা না হইয়া বুকের ভিতরের কথা হইত তাহা হইলে সত্যই ও স্বতঃই আমরা সহস্রমুখে আজ গাহিতাম—'জয় প্রধান সচিব লয়েড জর্জ্জের জয়!' কিন্তু এ উক্তির অন্তরালে যে একটা স্বার্থের তীব্র শিখা জ্বলিয়া উঠিয়া মন্ত্রীবরের উক্তিকে নিষ্প্রভ ম্লান করিয়া দিতেছে—তাহা ভুক্তভোগী ভারতবাসীর দৃষ্টি এড়াইবার নয়। পিতামাতা সন্তানকে পালন করেন—তাঁহার মধ্যে এটী সুশ্রী, ওটী কুরূপ, এটী ভাল, ওটী মন্দ তাহার বিচার রাখেন না।

নিজের স্নেহের বশে কর্ত্তব্যের অনুরোধে পিতামাতা সন্তান পালন করেন। ভারত দেশের রাজাকে জানে পিতামাতারূপে, সেই সঙ্গে সে ইহাও জানে যিনি রং দেখিয়া ঢং করিয়া সন্তানের প্রতি ভালবাসার ভাগাভাগি করেন তিনি পিতৃ নামের উপযুক্ত ত নহেনই তাঁহার সহিত আত্মীয়তা করাও নিরাপদ নয়। সাধু সাবধান। যে দেশের প্রতিপদে বুঝিতে হয়—শ্বেত ও অশ্বেতের মধ্যে বিচারে আচারে ব্যবহারে বিভিন্নতা রাখিবার চেষ্টা প্রায় প্রতিকার্য্যে বর্ত্তমান,—যে দেশে শ্বেতবর্ণের খুনী রক্ত-তরঙ্গে নৃত্য করিলেও বিদেশী বিচারক বলিয়া দেন যে সেটা এই গরম দেশে ঠাণ্ডাদেশবাসী আসিয়া হঠাৎ উষ্ম মস্তিষ্ক হইয়া যাইবার ফল সে দেশে কি চোখে অঙ্গুল দিয়া দেখাইতে হয় বিদেশী শাসক আমলাতন্ত্রের উত্তেজনায় কিরূপে গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ শাসনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া প্রজাবৃন্দের হৃদয় স্নেহ রসে আর্দ্র করিতে প্রয়াস পাইতেছেন—'প্রজা-সাধারণের মনে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করাই গভর্ণমেণ্টের মূল নীতি।' খুব ভাল কথা ভারতবাসীও ত তাহাই চায়, তাহারা বহু বিপদ আপদে তাহাদের অকপট রাজভক্তি প্রমাণ করিয়াছে কিন্তু যদি বিদেশীর এই গরম দেশে আবির্ভাব হইবামাত্রই মস্তকের বিকৃতি ঘটে তাহা হইলে কি ভারতবাসী অত্যাচার প্রয়াসী হইয়া স্বয়ং সম্রাটের নিকট সানুনয় প্রার্থনা করিতে অধিকারী নয় যে 'হে ধন প্রাণ দেহের রক্ষক সুশাসক সম্রাট, হে দেবতা, আমাদের রক্ষা কর!—তোমার দেশের এই সকল অপদেবতাগুলিকে তাহাদের এই মস্তিষ্ক হারাইয়া পাগল হইবার দেশে আর না পাঠাইয়া। আমাদের এ গরম দেশের উপযুক্ত সুশিক্ষিত ব্যক্তি শাসন করুক আমাদিগকে, সর্ব্ব বিষয়ে আমাদের দেশের উপযুক্ত দেশীয় ভাবে শাসিত হই আমরা। হে ন্যায়বান্, তোমার ন্যায়পরায়ণতা আমাদের অন্তরে এইরূপে দৃঢ় হউক,—ধন্য হই আমরা!'

লয়েড জর্জ্জ বলিতেছেন 'ইংলণ্ড ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলে তথায় কেবল বাদ বিসম্বাদ যুদ্ধ ও অরাজকতায় প্রতিষ্ঠিত হইবে * * *। আমরা যদি তাহাই করিতে চাই তাহা হইলে অতি বড় বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে।' বন্ধুর মত কথা বটে! বর্ত্তমানে জগতের জাতিতে জাতিতে যে একটা মহাবন্ধন ঘটিয়াছে, যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে দিয়াও যে একটী বন্ধনীতে বিশ্ব-মানব-সঙ্ঘের মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা জগৎ জুড়িয়া অস্তিত্বলাভ করিয়াছে তাহাতে কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিয়া বড় হইতে চাহিলেও সে স্বার্থ কিছুতেই মাথা তুলিতে পারিবে না। এমন অবস্থায় ভারত, ইংলণ্ডের সৌহার্দ্দ্য বন্ধুত্ব সাহায্য সম্পূর্ণ ভাবে অন্তরের সহিত ইচ্ছা করে তাহার অন্তর্দ্ধান কিছুতেই অভিলষিত নহে। কিন্তু দেশের মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা দায়িত্ব অতি-দয়া-পরবশ হইয়া মন্ত্রীপ্রবর যে ভাবে আত্মস্কন্ধে স্থাপন করিয়া ভারতকে উপকৃত করিতে চান তাহা ভারতবাসীর পক্ষে স্পৃহণীয় নহে কিছুতেই। তাহাদের মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা

দায়িত্ব ফেলিয়া দেওয়া হউক তাহাদের স্কন্ধে। উন্নত বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট হউন তাঁহাদের সহায়ক, বন্ধু—বস্!

মিঃ লয়েড জর্জ্জ নিজ মুখেই স্বীকার করিতেছেন 'ভারতবর্ষে ইংলণ্ডেশ্বরের যে অসংখ্য করদ ও মিত্ররাজ্য বর্ত্তমান; অতি সঙ্কট সময়েও এই সকল মিত্ররাজ অতুলনীয় রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের গৌরবের বিষয় এই যে যখনই কি আমাদের স্বদেশ কি পৃথিবীব্যাপী আমাদের প্রয়োজনে আমাদের এই সকল নৃপতিবৃন্দের সাহায্য গ্রহণ করার প্রয়োজন হইয়াছে তখনই এই নৃপতিবৃন্দ ও ভারতীয় বৃটিশ প্রজা সাধারণ আমাদের সাহায্যার্থ অকুণ্ঠচিত্তে দণ্ডায়মান হইয়াছেন।' প্রধান সচিবের এই উক্তি আন্তরিক হউক, তিনি যদি ভারতবাসীর এই অবিচলিত রাজভক্তির অকাট্য প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন তখন আর দ্বিধা কি—তখন আর কার্পণ্য কেন—তাহাদের আর পরশক্তির দ্বারা আবৃত না রাখিয়া যাহাতে তাহাদের আত্ম-শক্তি উদ্বুদ্ধ হয়, যাহাতে ভারতবাসী আপনার পদে দাঁড়াইয়া নিজকে কৃতী সফল-কাম করিয়া তুলিতে পারে, যে অদ্ভুত শক্তির উত্তেজনায় ভারতবাসী কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে চায় তাহার সে অধিকার প্রদান করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের অকলঙ্ক ন্যায় দণ্ডের সম্মান রক্ষিত হউক নতুবা এযুগে কথার মার-প্যাঁচে তুষ্ট থাকিবার দিন আর নাই।

* * *

জীবন যদি রক্ষা না হয় তাহা হইলে সমস্তই বৃথা। চোখ মুদিলে দুনিয়া অন্ধকার! বিগত আদম শুমারীতে হিন্দুদিগের সংখ্যা যেরূপ দ্রুতভাবে হ্রাস হইতেছে দেখা গিয়াছে তাহা বস্তুতঃই ভয়াবহ। বিগত ১০ বৎসরে সমগ্র ভারতে পূর্ব্বাপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা সাত লক্ষ কমিয়াছে। কেন? আর মুসলমানের সংখ্যা ২০ লক্ষ খৃষ্টানের সংখ্যা ১০ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। হিন্দুগণ ইহা দেখিয়া কি বলিতে চান? বলা ত দূরের কথা এ সংবাদ সাড়ে পনর আনা হিন্দু রাখেন কি না সন্দেহ। রাখিলেও ইহার প্রতিকারকল্পে চিন্তা করেন না সাড়ে নিরনব্বই জন। বাল্য-বিবাহ, বরপণের অত্যাচার, জোরজবরদস্তিতে বালবিধবার ব্রহ্মচর্য্যে দেবীত্ব স্থাপনের বৃথা চেষ্টা, সুকুমার কুসুমকোরককে অকালে বিনাশ করিয়া ধর্ম্মের নামে বলির বাহাদুরী, অস্পৃশ্যকে নিম্নশ্রেণীকে চির হেয় অবস্থায় রাখিবার চেষ্টা হেতু তাহাদের খৃষ্টান হইয়া আত্ম অবস্থার উন্নতি করিবার প্রচেষ্টাই কি এই ভয়াবহ হ্রাসের কারণ নহে? সমাজপতি সময় থাকিতে কি সাবধান হইবেন না? মধ্যবিত্ত হিন্দু জাতির এই ভয়াবহ সংবাদ অবগত হইয়াও কি চিরনিদ্রার প্রতীক্ষায় ভারতীয় হিন্দুগণ থাকিবেন নিশ্চেষ্ট!

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।'
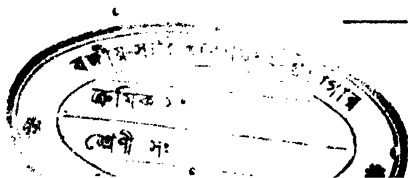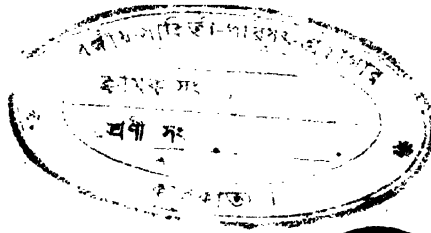
৬ষ্ঠ বর্ষ। } আশ্বিন, ১৩২৯ সাল। { ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা।

আগমনী।

কাহার স্নিগ্ধ হাসিটি আজিকে ফুটিয়া উঠিল রে
শুভ্র শারদ উষাতে!
কাহার মৃদুল পরশে পরাণ ভরিয়া উঠিল রে,
পারি না যে তারে বুঝাতে!
এমন করিয়া শেফালি কেন গো লুটিয়া পড়িছে ঐ;
কাহার চরণ স্মরিয়া!
ধরণীর গায়ে শ্যামল আঁচল দুলিয়া উঠিছে ঐ
কাহারে লইতে বরিয়া!

গরবের ভরে কেন রে কমল, কেন রে শিশিরে সে
লইছে বুকেতে বাঁধিয়া !
দোয়েল শাখাতে বসিয়া একাটি কোন্ সুখের আবেশে
পরাণ দিতেছে ঢালিয়া !
হাসিছে অবনী হাসে দিনমণি মলিনতা আজি কৈ ?
সকল বিষাদ ঘুচাতে
হের গো জননী হাস্য-আননে আসিছেন যে গো ঐ
সকল বেদনা মুছাতে !

শ্রীঅনন্তকুমার সান্যাল।

অবাক্।

(১৫)

গৃহকর্ত্তা বাহির হইয়া যাইবামাত্র —আবু সহেব চেয়ারখানি ঘুরাইয়া লইয়া, বেগমের ঠিক সামনে, সোজাসুজি হইয়া বসিলেন। সোফিয়ার সঙ্গে চোখে চোখে কি নিঃশব্দ কথাবার্ত্তা হইল, অন্তর্য্যামীই জানেন,—কাশিয়া গলা শানাইয়া লইয়া, রীতিমত উকীলী চালে, সুস্পষ্ট পরিষ্কার উচ্চারণে—বেগমের উদ্দেশে বলিলেন "আমাদের তিন জনের ওপরই যখন দৈবক্রমে এই অতিথিটির সৎকার ভার পড়্‌ল, তখন কাযের আসরে তিন জনের দায়িত্বই সমান, কি বলুন ? আমাদের এখন colleague মনে করেই আপনাকে তা হ'লে চল্‌তে হবে, কি বলুন চল্‌বেন তো ?"

বেগম অনেক কষ্টে, মাথা নাড়িয়া, নিঃশব্দে স্বীকার লক্ষণ জানাইল।

আবু সাহেব তদ্দণ্ডেই আবার সুরু করিলেন—"বাধিত হলুম, অনেক ধন্যবাদ!—এখন তা হলে গোটাকতক কথা আমার নিবেদন করবার আছে, প্রথম কথা,—colleagueদের আপনি বলেও কায চালানো যায় বটে, সে জন্য নয়,—তবে অদৃষ্ট দোষে, সম্পর্কের প্যাঁচে পড়ে, আপনার এই বয়োজ্যেষ্ঠাকে 'তুমি' বলতেই নাকি বহুদিন থেকে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি, ...তাই! মাফ্ করবেন! এটা ঘরোয়া কথা আলোচনার ক্ষেত্র নয়,—আকাশ বাতাসের খবর ছাড়া এখানে আর কিছুই আলোচনা হওয়া উচিত নয়,—সেটা মনে আছে অবশ্য! তত্রাচ জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হচ্ছি, 'আপনি' বলাটা শোভন হবে কি আপনাকে?"

বেগম দেখিল,—আজ অদৃষ্টে অনেক দুর্গতি ভোগ অনিবার্য্য! সহিষ্ণু ভাবে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া,—কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিল "'তুমি' বলুন। তাহলেই আমি খুশী হব।"

"বহুৎ আচ্ছা! আবার ধন্যবাদ। তা হলে ঘাড়টা এখন তুলে বসতে মর্জ্জি হোক্। কারণ, ও রকম ঘাড়-ভাঙা colleague নিয়ে কায চালানো আমাদের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর। তা ছাড়া, অতিথির পক্ষেও আনন্দজনক নয় বলেই মনে করি।"

মুহূর্ত্তে সোফিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া, দু'হাতে বেগমের মুখখানা ধরিয়া,—সোজা করিয়া তুলিল। মণিরুদ্দীনের উদ্দেশে বলিল "এই রকম, কি বলুন? চেয়ে দেখুন এদিকে,—কালো জামা কাপড়ের ওপর এই সুন্দর মুখখানি ঠিক,—অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলোর মতই দেখাচ্ছে, নয়?"

মণিরুদ্দীন তখন ঊর্দ্ধে দৃষ্টি তুলিয়া একখানা সুদৃশ্য ছবির দিকে একান্ত মনোযোগে চাহিয়াছিলেন। সোফিয়ার ব্যগ্র আহ্বানে, দৃষ্টি নামাইয়া একবার বেগমের দিকে চকিত দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াই,—অন্য দিকে চোখ ফিরাইয়া লইলেন। উদাস ভাবে, সলজ্জ স্মিত হাস্যে বলিলেন "দেখুন যা আপনাদের মর্জ্জি!—"

সোফিয়া তৎক্ষণাৎ অতীব বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল "ও বাবা! অবস্থা সঙ্গীন্! আমাদের মর্জ্জির ওপরই একান্ত বিশ্বস্ত নির্ভর, আজ!—"

আবু সাহের গম্ভীর হইয়া বলিলেন "তাই তো মন্নু, তোমায় এমন অন্যমনস্ক দেখ্‌ছি কেন ?"

বেগমের দিকটা, চোখের সামনে হইতে একটু আড়াল পড়িবার মত করিয়া,—চেয়ারটা আড় ভাবে একটু ঘুরাইয়া লইয়া, মন্নু ভ্রাতাটির সহিত ঠিক মুখোমুখি হইয়া বসিলেন। প্রসন্ন-স্নিগ্ধ হাসিভরা মুখে বলিলেন "তোমার চোখে তো আমি বরাবরই অন্যমনস্ক! তুমি কবেই-বা আমার মনোযোগী ছাত্রটীর মত চেহারায় দেখ্‌তে পাও ?"

অধিকতর গম্ভীর হইয়া আবু সাহেব বলিলেন "তা হলেও এ ক্ষেত্রে—"

বাধা দিয়া হাসিমুখে মন্নু বলিলেন "সেই খুকিটিকে ডাক। সে বেশ চুন্দোল্ হাৎ, চুন্দোল্ হাৎ, করে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, তার কথা শুন্‌তে আমার বড্ড ভাল লাগে ; তাকে ডাকো—"

সকাল বেলার কথা স্মরণ করিয়া বেগম মনে মনে অত্যন্তই অনুতপ্ত হইয়া উঠিল ! হায়, হায় ! কি মূর্খতাই সে করিয়াছে ! সেই সকাল বেলা ভাই-বোনদের ঝগড়ার মাঝে পড়িয়া, যখন—এই 'সুন্দর হাত-গুলা' লোকটির সন্ধান পাইয়াছিল, সেই সুযোগে ভাই বোন দুটির কাছে যদি এই লোকটির সবিশেষ পরিচয় জানিয়া লইতে পারিত,—তবে আর কিছু না হউক,—অন্ততঃ সোফিয়াদের 'যুগল মূর্ত্তির' দুর্ব্বৃত্ততা প্রকাশের পথটা বন্ধ করিবার একটা উপায় এতক্ষণ নিশ্চয়ই আবিষ্কার করিয়া ফেলিত ! হায় ! কেনই যে অনাবশ্যক—কৌতূহল ভাবিয়া ব্যাপারটা উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিয়া অমন নিশ্চিন্ত হইয়াছিল ! কেনই যে অমন পরিষ্কার-সূত্রটা হাতে পাইয়াও অবহেলা ভরে ছাড়িয়া দিয়াছিল !

কিন্তু এ আক্ষেপ চিন্তার তন্ময়তাও,—পাপ-সোফিয়াটার উপদ্রবে দুদণ্ড নিশ্চিন্ত হইয়া টিঁকিতে পারিল না ! চমকোৎকণ্ঠিত চিত্তে, সহসা উৎকর্ণ হইয়া বেগম শুনিল 'ঠাকরুণ'টি ইতিমধ্যেই তাঁহার স্বভাব অভ্যস্ত 'মধুর বচন' বর্ষণ সুরু করিয়াছেন,—"তার জন্যে দুঃখু কি ? সে ছেলে মানুষ, এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু এই একজন আমার পাশে উপস্থিত রয়েছে,—ওর আবার যা মিষ্টি মিষ্টি কথা, শুনলে আপনি অ—বা—ক্ হয়ে যাবেন ! সে শুধু 'সুন্দর হাত' বলেছে, এ আবার 'সুন্দর মুখ, সুন্দর মুখ' করে কত কথা আপনাকে বল্‌তে পারবে ! বিশ্বাস না হয়—"

অত্যন্ত অপ্রস্তুত বিব্রত হইয়া মণিরুদ্দীন বলিয়া উঠিলেন, "আঃ, বড় অত্যাচার করেন আপনি!—"——কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। পিছনের আলমারীটার দিকে চাহিয়া হাসি মুখে বইগুলি দেখিতে লাগিলেন।

সোফিয়া মহা পরিতাপ ভরে ঘোরতর উষ্ণ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল "ও আর কি দেখছেন বলুন? ও, সবই আধ্যাত্মিক! আধিভৌতিক---ওর মধ্যে কিছুই নেই!

মৃদু হাসিয়া প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া মণিরুদ্দীন সবিনয়ে বলিলেন "আমি যে আধিভৌতিকের সন্ধানে বিশেষ দুশ্চিন্তাকাতর হয়ে রয়েছি, এমন কথা মনে করবার কোন কারণ আপনার নাই! আপনি দয়া করে ঐ ওকালতি প্যাঁচগুলি ছেড়ে দেন দেখি, বড়—অনুগৃহীত হব!"

কথাটার উত্তর দেওয়া খুব নিরাপদ নয় দেখিয়া সোফিয়া চিন্তিত ভাবে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। স্বামীটি—মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন.---"এ, মনু; বস বস। বলি তোমার বিষয়ের এক্সিকিউটার কি আমায় সত্যিই করছ?"

কথাবার্ত্তার গতি অন্যদিকে ফিরিল দেখিয়া, মনিরুদ্দিন যো হয় কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন,—কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে তাঁহার ভরসা হইল না। চেয়ারের পিঠে ঈষৎ হেলিয়া দাঁড়াইয়া, হাসি হাসি মুখে ভ্রাতার দিকে চাহিয়া বলিলেন "আবার কিছু মোচড় দেবার মৎলব আছে, নয়? কেন জ্বালাচ্ছ?"

"বলি, বসুন-না"—সোফিয়া চেয়ারখানা ঠেলিয়া দিয়া অসহিষ্ণু ভাবে বলিল "একি পাঠশালার গুরুমশাই-এর কাছে পরীক্ষা দিতে এসেছেন যে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হবে!"

"আপনারা দুজনে যা হয়ে দাঁড়িয়েছেন, গুরুমশায়ের পরীক্ষার চেয়ে পাঁচ শো পঁচিশ গুণ জবরদস্ত!—" মণিরুদ্দিন বলিলেন। উর্দ্ধমুখে দেয়ালের সেই ছবিখানার দিকে চাহিয়া, উদাস হাস্যে বলিলেন "দেখুন,—যা আপনাদের খুশী হয়, করুন।—"

দরদী ভ্রাতাটি তৎক্ষণাৎ স্নেহ জানাইয়া, আগ্রহ ভরে প্রশ্ন করিলেন "এতটা উদাসীন হবার কারণ কি মনু?—"

টেবিলের উপর কুনুয়ের ভর রাখিয়া, আড়ভাবে ঈষৎ হেলিয়া বসিয়া মনু বলিলেন

"তোমরা যা কাণ্ড কারখানা সুরু করেছ, তাতে—কিছু কিঞ্চিৎ উদাসীন হওয়ার চেষ্টাই নিরাপদ দেখ্‌ছি।"

"ওহে এ দুনীয়ার আর যে জিনিসের জন্য যত চেষ্টা কর, ক্ষতি নাই! কিন্তু দিনরাত যখন হচ্ছে, চাঁদ সূর্য্যি যখন উঠ্‌ছে, আর নেহাৎ'ই যখন মাটীর বুকে পা রেখে হাঁটছ, তখন এত তাড়াতাড়ি উদাসীন হবার চেষ্টাটার জন্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি কোর না, কোর না! বরং স্বপ্ন বিভোর দৃষ্টি যুগলকে প্রাণপণে সচেতন বিস্ফারিত করে দুনীয়াটার দিকে তাকাও, অনেক কিছু শিখ্‌তে পারবে!—কবির ভাষাতেই কবুল জবাব দিচ্ছি,—As you are now, so was once I.—" কিন্তু এখন সব ওলট্‌ পালট্‌ হয়ে গেছে রে দাদা,—সব! সেই জন্যেই অনুরোধ কর্‌ছি,—"Therefore prepare to follow me."

ভ্রাতার বক্তৃতার বহর দেখিয়া, মণিরুদ্দিন হাসিলেন। ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া,—নিঃশব্দে উপর্য্যুপরি মাথা নাড়িয়া সলজ্জ-বিনয়ে অস্বীকার জানাইলেন 'সেটা হইতে পারে না!—'

সোফিয়া রাগ জানাইয়া বলিল "ও, ঘাড় নাড়া, মাথা নাড়ার মানে আমরা বুঝ্‌তে পারি না।—একটু কথা কয়েই বলুন-না, কি বলছেন?"

"কেন আর কষ্ট দেন? আমি যা বল্‌ছি, সে তো আপনারা মনে মনে বেশই বুঝ্‌তে পারছেন।"

"কি বুঝ্‌তে পারব বলুন? আপনি এক পদাঘাতে হিমালয় পাহাড় টলাবেন, না একলাফে আট্‌লাণ্টিক সাগর ডিঙুবেন, না লক্ষ্মীছেলের মত সোজা সুজি আমাদের কথা শুনবেন, কোনটে বুঝ্‌ব বলুন?"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, মণিরুদ্দিন হাসিমুখে অনুনয়ের স্বরে বলিলেন "এবার বাড়ী চলুন-না। ছেলেরা এতক্ষণ নিশ্চয় কান্না কাটি সুরু করেছে। রাতও অনেকখানি হয়ে গেছে।"

আলস্য ভাঙিতে ভাঙিতে আবু সাহেব হঠাৎ মিহিসুরে বলিলেন "বেগম, তোমার ঘরে চুরুট্‌ টুরট্‌ আছে?"

"আমার ঘরে!"—সবিস্ময় দৃষ্টি তুলিয়া বেগম মুহূর্ত্তের জন্য চাহিল। পরক্ষণেই ভদ্র-লোকটির প্রচ্ছন্ন কৌতুকোজ্জল মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই,—সলজ্জ কুণ্ঠায় ঈষৎ হাসিয়া, মাথা

নাড়িয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল। নম্র-বিনয়ে মৃদুস্বরে বলিল "আপনি চেয়ারটা একটু সরিয়ে নিন,—আমি বাইরে থেকে চুরুট্ আনিয়ে দিচ্ছি।—"

খুব নিরীহ ভাবে ভগিনীপতি বলিলেন "এবং এই সুযোগে আপদগুলার কব্জা থেকে খসে পড়ে বাঁচি, কি বল?"

কিন্তু বেগম কিছু বলিবার আগেই সোফিয়া তাহার জামার দেশ ধরিয়া এক টান্ দিয়া বলিল "তুই বস্ তো! নেশার সন্ধান উনি নিজেই দেখবেন, ওঁর পকেট ভর্ত্তিই আছে!"

সোফিয়ার টানে বেগম বসিয়া পড়িতেই বাধ্য হইল।—কিন্তু বেচারার মনে অনেক আপত্তিই ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—যেগুলার একবর্ণও উচ্চারণ করা মহা আপত্তিজনক! সঙ্কোচ-শঙ্কিত চিত্তে মাথা হেঁট করিয়া নীরব রহিল।

গোপন হাস্য-রুদ্ধ অধরে ভ্রাতার দিকে চাহিয়া মণিরুদ্দীন অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—"ঐ চেয়ার শুদ্ধু তুলেই, তোমায় এক আছাড়্ দিতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে!"

ফোঁস করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া পরম ক্ষোভের সুরে আবু সাহেব বলিলেন "তা হবে বৈ কি! সে তো আমি আগেই জানি!—সাধে বলছিলুম, "As I am now, so you must be!" দেখ্‌লে তো, হাতে হাতে ধরা পড়লে!—"

সলজ্জ হাস্যে মণিরুদ্দীন বলিলেন "এবার তোমার ভাষাতেই তোমায় বল্‌ব না কি—'অনেক ধন্যবাদ!'—"

দুর্ম্মুখ সোফিয়া তৎক্ষণাৎ ফট্ করিয়া বলিয়া উঠিল,—"উঃ! দেখ্‌ছ, কি আঁতের টান! এর মধ্যে বেগমের ওপর এত দরদ জেগে উঠেছে যে, ওকে কেউ একটা কথা বল্‌লে, তাও এঁর সহ্য হয় না! সেটাও সুদ সমেত ফেরৎ দিতে ব্যস্ত!"

মনে মনে অত্যন্তই অসহিষ্ণু হইয়া বেগম, আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। সোফিয়ার দিকে চাহিয়া খুব বিনীত ভাবে বলিল, "তোমরা বসো, আমি খাবারের যোগাড় দেখি।—একটু রাস্তা ছাড়ো।—"

"সে ব্যবস্থা দেখ্‌বার লোক বাড়ীতে ঢের আছে, তোমায় অত ছুট্ ফট্ কর্‌তে হবে না,—থামো।" বলিয়া বলিয়া সোফিয়া এক ঠেলায় বেগমকে আবার বসাইয়া দিল।

মণিরুদ্দীন ততক্ষণে—ঘাড় বাঁকাইয়া উদাস দৃষ্টিতে আবার আলমারীটা নিরীক্ষণে মনোযোগী হইয়াছিলেন। সোফিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া,—সুগম্ভীরে বলিল "অত করুণ দৃষ্টিতে আলমারীটার দিকে চেয়ে রয়েছেন কেন? ওটার গুপ্ত-পরিচয় টের পেয়েছেন না কি?"

দপ্ করিয়া বেগমের মনে পড়িয়া গেল,—সেই এক দিনের পরিহাস। ভয়ে তাহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল! এই নিতান্ত দুর্ম্মুখ-বর্ব্বর ভগিনীটির দ্বিধা বোধ করিবার মত দুষ্কার্য্য যে জগতে খুব কমই আছে,—সেটা বেগম ভালই জানে!—সসঙ্কোচে ব্যাকুল-মিনতি-মাখা দৃষ্টি তুলিয়া সোফিয়ার দিকে চাহিল, কিন্তু নির্দ্দয় সোফিয়া নিতান্তই খাতির-নদারৎ চালে, সে দৃষ্টিকে সম্পূর্ণই উপেক্ষা করিয়া, বিস্ময় নির্ব্বাক দেবরটির মুখের দিকে পুনশ্চ বলিল "শুনবেন্ এর গোপন পরিচয়?"

দেবরটি একটু ইতস্ততঃ করিয়া ধীর ভাবে দৃষ্টি তুলিয়া,—সকলের মুখের দিকে চাহিলেন। সোফিয়ার ও আবু সাহেবের মুখ ভাব, প্রদীপ্ত-কৌতুকোজ্জ্বল! দু জনেরই চোখে ঠোঁটে যেন, দুরন্ত দুষ্টামী, দুর্দ্দান্ত প্রতাপে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে!

কিন্তু এই নির্দ্দয়-পরিহাস-প্রিয় যুগল মূর্ত্তির মাঝখানে নিরুপায় বন্দিনীটির অবস্থা?...... বেগমের লজ্জা-বিপন্ন, করুণ-মিনতি-কোমল মূর্ত্তিটির দিকে চাহিয়া,—এই উদার স্নেহশীল, বলিষ্ঠ-ন্যায়-পরায়ণ ভদ্র যুবকটির অন্তঃকরণ,—সহসা ক্ষুব্ধ-বেদনায় ব্যগ্র-সহানুভূতি ভরে সাড়া দিয়া উঠিল, এবং নিমেষেই আর্ত্ত-রক্ষায় চেষ্টায় তাঁহাকে ক্ষাত্র-ধর্ম্মে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল!

সহসা সোফিয়ার দিকে সসম্মান-ভৎর্সনার দৃষ্টি হানিয়া তিনি ক্ষুব্ধ অনুযোগের স্বরে বলিলেন "আচ্ছা, এ সব কি দুষ্টু বুদ্ধি আপনাদের বলুন দেখি? যেন-তেন-প্রকারেণ একটি নিরীহ মানুষকে উৎপীড়িত করে তুল্‌তে পার্‌লেই কি খুব আনন্দ পাওয়া যায়? আমি তা হলে আপনাদের সঙ্গে এক মত নই! আলমারীটার কি টেবিলটার গোপন-ইতিহাস যদি কিছু থাকে, থাক! আমি সেটা শুন্‌তে মোটেই রাজী নই!—উঠুন, এবার বাড়ী চলুন, ঘুমে আমার চোখ জ্বালা কর্‌ছে!"

"অবাক্!" নিপুণ দক্ষতার সহিত গালে হাত দিয়া,—যৎপরোনাস্তি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া সোফিয়া বলিল,—"ঢের ঢের মনের-মিলের, মহামারী-কাণ্ড দেখেছি, কিন্তু এমনটি আর কোথাও দেখি নি! বেগম, তুই তো ঢের দর্শন-ফর্শন পড়েছিস, এখন নিজের বুকে হাত রেখে সাচ্চা বল্—এমন অদ্ভুত কায়দা-কসরৎ কখনো দেখেছিস্?

মুখ লাল করিয়া,—বেগম বিনা বাক্যে হঠাৎ টেবিলের নীচে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, পায়ের কাছে কি একটা জিনিস খুঁজিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল!

বেগমের আচরণে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া, সোফিয়া নিজ মনেই উপর্য্যুপরি বিস্ময় বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়া চলিল,—"উঃ! তাই! তাই দুজনের মনে মনে এমন সাংঘাতিক মতের মিল! উনি গোঁ ধরেছেন বিয়ে করব না, এঁরও কি ছাই—ঠিক তাই, পণ্! কারুর মুখে আর দোসরা বুলিটি নাই! কেউ ভুলেও মত বদ্‌লে বলতে চায় না, 'হাঁ বাপু, তাই হোক্! —তোমাদের পাঁচ জনকে খুশী করবার জন্যে,—তাই, বিয়েটাই করব! কই, বলাও দেখি,—দেখি কেমন দুজনের এক জনের মুখ থেকেও—কথাটা বেরোয়?"

স্বামীর দিকে চাহিয়া, সোফিয়া শেষের আদেশটা জ্ঞাপন করিয়া,—নিতান্তই হতাশ-ক্লান্ত ভাবে চেয়ারের পিঠে হেলিয়া পড়িল! স্বামী ততোধিক হতাশা-ব্যঞ্জক স্বরে,—বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন "হায়! তাহলে যে মতের মিলে গরমিল এসে পড়বে!"

ফুলদানির উপর হইতে একটা ফুল তুলিয়া লইয়া হাসিমুখে সেটাকে পরীক্ষা করিতে করিতে মণিরুদ্দীন বলিলেন "নেহাৎ জলপড়ার ভুত ঠাউরেছ নয়?"

"জলপড়ার ভুত! শৌভাগ্যরা! ফাঁশি-ছেঁড়া-বদ্‌মাস বলতে যাদের বোঝায়,—তোমরা হচ্ছ, সেই শ্রীমান্ এবং শ্রীমতী! বাপ, তোমাদের একরোখা মতের সঙ্গে ধবস্তাধ্বস্তি করতে করতে আমাদের গোষ্ঠিশুদ্ধ সকলের মাথা বিগড়ে যাবার যো হয়েছে তবু তোমরা এতটুকু নরম হতে রাজী নও! কি শোচনীয় মনস্তাপ বল দেখি!—"

মণিরুদ্দীন বলিলেন "সেই জন্যেই তো, পরচর্চ্চা, আর অনধিকার চর্চ্চাকে হিতোপদেষ্টারা পাপ বলে গণ্য করেছেন। যিনি পাপ করবেন, পীড়ন ভোগ তাঁর পক্ষেই অপরিহার্য্য! এর জন্যে 'শোচনীয় মনস্তাপ, টনস্তাপ' করে চেঁচিয়ে কোন লাভ নাই! নিজেদের দুষ্কার্য্যের

উৎসাহকে সংযত কর, তা হলে তোমরাও শান্তি পাবে আমরাও স্বস্তি পেয়ে নিজের নিজের পথ দেখব!"

"উঃ! হোলো কি! 'আমি' একেবারে 'আমরা'য় পরিণত হোল! দেখছ, দ্বিবচন সুরু হয়েছে!—" স্ত্রীর দিকে চাহিয়া কথাটা বলিয়াই আবুসাহেব একটা অর্থসূচক ইঙ্গিত করিলেন। তারপর সোজা হইয়া বসিয়া সহসা সুর বদলাইয়া বলিলেন "এ সব বাজে কথা বাদ দেওয়া যাক্। আমি একটা গল্প আরম্ভ করি, তোমরা শোন। বেগম, তুমি এখন কাঁধের ওপর মাথাটা স্বচ্ছন্দে স্থাপন করে সোজা হয়ে বোসো। ওঠো, লক্ষ্মী বহিন্ আমার ঠিক্ হয়ে বোসো। শোনো আমার গল্প।"

বেগম—কষ্টেসৃষ্টে একটু হাসিয়া, যথাসাধ্য প্রসন্নভাবে আদেশটা পালন করিল।

কিন্তু স্বামীর কথায় নিতান্ত অধীর বিচলিত হইয়া সোফিয়া অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিল "কি হবে? গল্প? হুঁঃ! বলে 'এ ঘরে ও ঘরে আমার প্রাণ ধড়্ফড়্ করে'!—তুমিও ওদের নিশ্চিন্তির নেশা দেখে নেশায় পড়লে? দুনীয়ার সমস্ত দরকারী খবর ফেলে রেখে, এই তোমার নিশ্চিন্তি হয়ে গল্প বল্বার সময় হোল?"

মাথা চুলকাইয়া উদাস ভাবে স্বামী বলিলেন "কি করি বল? যতই দুশ্চিন্তা প্রকাশের দুশ্চেষ্টা করা যাক, ওঁদের ঐ 'মর্ম্মান্তিক মতের মিল'—না,—কি যে বল্লে সেই মিঠে মধুর কথাটি,—কি বেগম বল ত?—" তিনি নিতান্তই নিরীহ ভদ্রতার সহিত অমায়িক-সরলভাবে প্রশ্নোৎসুক দৃষ্টিতে বেগমের দিকে চাহিলেন।—

বলা বাহুল্য, প্রশ্ন শুনিয়া বেগমের হৃৎপিণ্ডটা কৃতার্থ আনন্দে, আহ্লাদেই লাফাইয়া উঠিল! কিন্তু একেবারে নিরুত্তর থাকিলে পাছে আবার কোন নূতন বিপদ আসিয়া ঘাড়ে চাপে সেই ভয়ে, সোফিয়াকে নির্দ্দেশ করিয়া সবিনয়ে বলিল "ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন "

কিন্তু হায়!—"বিধির মার দুনির্য়ার বার"!—বেগম চাহিল নিরাপদ হইতে, উল্টা বিপদ বাড়িল, তাহাতেই! বেগমের এই প্রশ্ন-এড়ানো চেষ্টাটা দেখিয়া দরদী ভগিনীপতিটি তৎক্ষণাৎ মহা ক্ষোভ ও অনুতাপ ভরে বলিয়া উঠিলেন "কেন বল দেখি? তুমি কি তাহলে সেই,—'ভেকেরা যেথায় বক্তা সেথায়, নীরব থাকাই ঠিক' নীতিটা মনে মনে স্মরণ করছ? হায়

ভগবান !—এই হতভাগা ভেকগুলোর কর্কশ কণ্ঠস্বর,—যত বড় অসহনীয় কর্কশই হোক, কিন্তু বর্ষার আগমনী গান বেজে ওঠে, এই দুর্ভাগাদের কণ্ঠেই ! বেগম তুমি কি দয়া করে এটুকুও মনে রাখবে না ?"

চুপ করিয়া থাকার চেয়ে বড় বিপদ যেক্ষেত্রে নাই,—সেক্ষেত্রে,—প্রাণপণ শক্তিতে কথা বলার চেষ্টাই বেগম দেখিল,—অপেক্ষাকৃত ভাল ! রুমালখানা অঙ্গুলের ডগায় জড়াইতে জড়াইতে, সেই দিকে দৃষ্টি সংযত রাখিয়া, মৃদু হাস্যে বলিল "বর্ষার আগমনী গান যাঁদের কণ্ঠে বাজে, তাঁরা দুর্ভাগ্যই হোন্, আর সৌভাগ্যবানই হোন্,—আমার মত ক্ষুদ্রশক্তি মানুষের দয়া মায়া যে তাঁদের কোন উপকারে লাগা সম্ভব নয়,—সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ! কই, আপনার গল্পটা বল্‌লেন না ?"

টেবিলের উপর, কনুয়ের ভর রাখিয়া, হাতের উপর মাথাটা কাৎ করিয়া, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া, ঈষৎ হেলিয়া বসিতে বসিতে, স্মিত মুখে মণিরুদ্দীন ঠিক যেন—স্বগতোক্তি করিলেন "ও নিমন্ত্রণের লোভটা ছেড়ে দেওয়াই কিন্তু নিরাপদ ছিল। কারণ ভাইজির গল্পগুলি সচরাচর সাংঘাতিক বিপদ আপদ পূর্ণ ভিন্ন হয়-ই না ! হতে পারে বলেও বিশ্বাস করি না !"

"উঃ !—'ইসারায় কত কথা বলে ! 'বালাসখার' বচন আর কি !"—বলিয়াই হঠাৎ সোফিয়া সটান সোজা হইয়া বসিয়া, স্বামীর মুখের দিকে স্থির বিস্ফারিত দৃষ্টি রাখিয়া বলিল "দেখ্‌ছ ?"

ফোঁশ করিয়া একটা মস্ত নিঃশ্বাস ফেলিয়া,—সাতিশয় ক্ষোভ অভিমান প্রকাশ করিয়া স্বামী বলিলেন "দেখ্‌ছি সবই ! ভাব্‌ছিও অনেক কথা !...আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে ওঁদের একজন হলেন উদাসীন একজন হলেন অবাক্ ! কিন্তু এখন ওঁদের কাণ্ড-কারখানা দেখে আমাদের দুজন যে কোন অবস্থায় পৌঁছুনো উচিত, সে সমস্যার সমাধান করবে কে ?"

গম্ভীর ভাবে, দেবরের দিকে চাহিয়া সোফিয়া বলিল "বলুন এবার আমরা কোথা যাই ?"

উচ্ছ্বসিত কৌতুক-ভরে সহসা হাসিয়া ফেলিয়া, মণিরুদ্দীন সপরিহাসে বলিলেন "নাঃ ! সহধর্ম্ম ব্রত পালনে, এমন নিখুঁত চরমোৎকর্ষতা লাভ,—এ রকমটি আর কোথাও দেখ্‌তে

পাই নি! বড় সৌভাগ্যের দিন আজ আমার, বাস্তবিকই!—আমার আন্তরিক-আনন্দ-অভিনন্দন জানাচ্ছি, তবে—"

বাকী কথায় বাধা দিয়া সোফিয়া শশব্যস্তে বলিল "শুন্‌লে শুন্‌লে! আমরা এবার কোথা যাই, জিজ্ঞাসা মাত্রেই অম্নি—'সৌভাগ্যের দিন' এসে পড়্‌ল, আন্তরিক-আনন্দ উচ্ছ্বাসের ফোয়ারা খুলে গেল! তার মনে হচ্ছে, "এই আপদ বালাই দুটো বিদেয় হলেই এখন আমরা বাঁচি, নয়?"

অম্লান বদনেই, গম্ভীর প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টি তুলিয়া, সোফিয়া অসঙ্কোচে একবার দেবরের দিকে চাহিল, একবার ভগিনীর দিকে চাহিল।

চকিত নেত্রে মণিরুদ্দীন চাহিয়া দেখিলেন,—অধোবদনে নিরুত্তর বেগম এবার অত্যন্তই বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে!—কুণ্ঠিত হইয়া, মাথা নীচু করিয়া টেবিলের নীচের অন্ধকারে কি যেন একটা জিনিস লক্ষ্য করিতে করিতে,—অপ্রতিভ হাস্যে ক্ষুণ্ণ অনুযোগের স্বরে তিনি বলিলেন "আপনার সঙ্গে কথা বলা বিষম বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে দেখ্‌ছি! আচ্ছা,—গালাগালি শূলোশূলি যা বর্ষণ কর্‌বার ইচ্ছে আছে, আমার একার ঘাড়েই সেগুলি দয়া করে বর্ষণ করুন-না! নিরপরাধ মানুষদের নামশুদ্ধ তাতে জড়াচ্ছেন কেন? এটা বড় অবিচার হচ্ছে।"

সোফিয়া সে কথার কোন জবাব দেওয়ার আবশ্যকতা বোধ করিল না,—সম্ভবতঃ কোন জবাব মনেই পড়িল না!—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেবরের দৃষ্টি লক্ষ্যে চাহিয়া, ক্ষণেক নীরব থাকিয়া—হঠাৎ বলিল "অত মুগ্ধ দৃষ্টিতে টেবিলের নীচে কি দেখ্‌ছেন? বেগমের জুতো যোড়াটা?"—

কথা বলিতে বলিতেই, ক্ষিপ্র ঝুঁকিয়া পড়িয়া,—বেগম কিছু বুঝিবার আগেই অতর্কিতে তাহার পা হইতে সোণালী চুম্‌কির কায করা লাল মখমলের চটি যোড়াটি খুলিয়া লইয়া, কাহাকেও কিছু ভাবিবার চিন্তিবার লেশমাত্র অবসর না দিয়া, টেবিলে,—সোজা মণিরুদ্দীনের সামনে,—বিনা দ্বিধায় স্থাপন করিল। সপ্রতিভ-গাম্ভীর্য্যে বলিল "এই নিন্, এবার মনের সাধে—আশ মিটিয়ে দেখুন! দিব্যি লাল টুকটুক, না?"

মণিরুদ্দীন অবাক্! আবু সাহেব সুপ্রচুর কৌতুকোচ্ছ্বাসে হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন!—এবং তদ্দণ্ডেই বেগমের নিঃশেষে ধৈর্য্য লোপ! অধীর ভাবে উঠিয়া পড়িয়া, সে কন্যাকে সবলে ঠেলিয়া সরাইয়া, টেবিলের উপর হইতে জুতা তুলিয়া লইবার জন্য, বেগম ঝুঁকিয়া হাত বাড়াইল! কিন্তু মুহূর্ত্তে সতর্ক সোফিয়া ও তাহার সুযোগ্য সহধর্ম্মীটির চারখানা হাত—অকস্মাৎ অগ্রসর হইয়া,—এক যোড়া আগলাইল জুতাকে, আর এক যোড়া আটকাইল, বেগমকে! সঙ্গে সঙ্গে সেই 'মাণিক যোড়' দুটির সুকোমল ওষ্ঠচ্যুত হইয়া এমন কতকগুলি মনোরম-সুন্দর 'মধুর বচন' ঝরিয়া পড়িল,—যার প্রচণ্ড পীড়নে, তরুণ কুমার কুমারী দুইটির কর্ণমূল সদ্যঃ লাল হইয়া উঠিল!

সহসা মণিরুদ্দীন এক অভাবনীয় কাণ্ড করিয়া বসিলেন!—অসঙ্কোচ-স্থির দৃষ্টিতে, একবার সকলের মুখের দিকে চাহিয়া,—কোন কথাটি না বলিয়া,—হঠাৎ স্বহস্তে জুতা জোড়াটি তুলিয়া লইয়া, টেবিলের নীচে বেগমের পায়ের কাছে পৌঁছাইয়া দিলেন। তারপর মাথা তুলিয়া, সোজা হইয়া বসিয়া, স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বেগমের দিকে চাহিয়া, শান্ত ধীর স্বরে বলিলেন "নিন্, জুতো পরুন,—কিছু মনে করবেন না। এঁরা বড় উত্যক্ত করছেন,—আমার বে-আদবী মাফ্ করবেন্, এবার আপনার পক্ষ নিয়ে,—এঁদের 'চ্যালেঞ্জ' করতে দাঁড়াতে বাধ্য হলুম! ক্ষমা করবেন আমায়।"

স্তম্ভিত নির্ব্বাক বেগম, নিজের অজ্ঞাতেই প্রীতি-মুগ্ধ—প্রসন্নোজ্জ্বল দৃষ্টি তুলিয়া, একবার লোকটির দিকে চাহিল! কোন কৃতজ্ঞ-ধন্যবাদের বাণী তাহার রসনায় সরিল না,—শুধু গভীর শ্রদ্ধাভরে মাথা ঝুঁকাইয়া—লোকটির অসাধারণ-সৌজন্যশীলতার উদ্দেশে, নীরব-অভিবাদন জানাইয়া, বসিয়া পড়িল।

মুহূর্ত্তে, 'মাণিক-জোড়' যুগলের দুই যোড়া হাত ঘুরিয়া গিয়া, নিজের নিজের দুই গালে সশব্দে আছড়াইয়া পড়িল! যুগপৎ যুগ্ম কণ্ঠে উচ্চারিত হইল,—"অ—বা—ক্!"

কুমারী তখন মুহ্যমানা! কুমারটি তখন স্তব্ধ-গম্ভীর!

---

(৬)

সাত দিন পরের কথা।

সহপাঠিনী বন্ধুর দল, হুড় মুড় করিয়া ঘরে ঢুকিয়া, তুমুল উল্লাস কোলাহলে চারিদিক মুখরিত করিয়া,—সমস্বরে প্রশ্ন করিল—"কর্‌লে কি বেগম সাহেবা? পাকা ঘুঁটি সত্যি সত্যিই কাঁচালে?"

এক পাশে সদ্যঃ বিবাহিতা জোহ্‌রাকে অন্যপাশে তাহার 'এক দশা' শোভনাকে লইয়া, ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া,—সুনীতি হাসিমুখে বলিল "আজকের আসরে,—'হক্ কথা ঠক্ করে' বলে দিয়ে, "পাজীর-পা-ঝাড়া" নামক সুন্দর উপাধিতে বিভূষিত হয়ে ওঠ্‌বার দিন আমার! কি হোল, বেগম সাহেবা? আমার সেই 'সুদূরের পিয়াসীর মাঝপথে গলাটিপুনী' খাওয়ার অভিশাপটা হাতে হাতেই ফল্‌ল?"

সকলের হাত ধরিয়া আসনে বসাইতে বসাইতে বেগম সলজ্জ দৃষ্টি তুলিয়া স্মিত হাস্য সুন্দর মুখে উত্তর দিল,—"আশীর্ব্বাদের আকারে! .....কিন্তু তোমরা এত তাড়াতাড়ি খবরটা পেলে কার কাছে?"

সকলের পিছনে,—ভিড়ের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া অদৃশ্য ভাবে দণ্ডায়মান সোফিয়া,—ত্রস্তে মুখ বাড়াইয়া সাফাই গাহিল "আমি কিন্তু কাউকে কিছু বলি নি।"

প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বেগম বলিল "সে আমি পূর্ব্বাহ্নেই আন্দাজ কর্‌তে পেরেছি, আর বৃথা কৈফিয়ৎ দিয়ে কষ্ট পেতে হবে না।"

সুনীতি আসন গ্রহণ করিয়া আবার বক্তৃতা সুরু করিল,—"তাতো হোল! কিন্তু তুমি বেগম সাহেবা,—কোন বিচারে, এমন অন্যায় অবিচার করে, সোফিয়া-দি'কে বাদ্‌শাই থেকে খারিজ্ কর্‌লে, তার কৈফিয়ৎ দাও তো, আগে শুনি।"

সহাস্যে বেগম বলিল "আমি কিছুমাত্র অবিচার করিনি! সে কসুরের জন্যে সোফি নিজেই সর্ব্বতো ভাবে দায়ী,—ওকেই জিজ্ঞাসা কর।"

বিপুল বিস্ময়ে, দু চক্ষু কপালে তুলিয়া ব্যগ্র আপত্তির ঝঙ্কার হানিয়া সোফিয়া বলিল "তা তো বল্‌বেই! এখন সবই দাদার ওপর বরাৎ!.........বলি তোমাদের দুই মূর্ত্তির

সেই,—'সাংঘাতিক মতের মিলনটা' যে এক সঙ্গে হঠাৎ মোড় ঘুরে গিয়ে,—আমাদের সবাইকে 'অবাক্' বানিয়ে এমন বিস্‌মিল্লায় গলদ্ করে বস্‌ল,—এর জন্যে দায়ী কে?"

স্মিত-মধুর লালা-রঞ্জিত মুখে বেগম এবার— সম্পূর্ণ নিরুত্তর!

সুনীতি হতাশ ভাবে খুব একটা জোর নিঃশ্বাস ছাড়িয়া প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের স্বরে বলিল "হায়! সৃষ্টি কর্ত্তার সৃষ্টির মধ্যে এতদিন তবু একটা বৈচিত্র্য বজায় ছিল,—বেগম বিয়ের দিকে এগিয়ে আজ সেটাও লোপ করে দিলে! কি পরিতাপ!"

বেগম উত্তর দিল "ভুল করছ বন্ধু! বৈচিত্র্য লোপ করি নি,—বৈচিত্র্যটাকে শোভা এবং সামর্থ্যের সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত করবার দিকেই এগিয়ে দিলুম। আমার এই খুদে-গুরুজন সোফিয়া বিবির নির্দ্দেশ মত,—আনন্দ উৎসবের পর্ব্বটা শেষ করেই আমি আবার,—আমার সেই পুরোণো ছাত্রী জীবনেই ফিরে চলব—"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সোফিয়া বলিল,—"এবং দ্বিতীয় প্রাণীটি আমেরিকার ক্ষেত-খামারের খবর নিতে সাগর পারে,—অনেক হাজার মাইল তফাতের দিকে চল্‌বেন!— বুঝলে ভাই, ওরা কি কম ধড়িবাজ ফাঁসুড়ে!—এখন কেবল ধাপ্পা দিয়ে, গুরুজনদের খুশী করবার দিক্‌টা বজায় রাখ্‌চে মাত্র,—নইলে আসলে ওদের 'মতের মিল' টা তালে-ঠিক আছে!—সাধে বলি 'অবাক্?'"

দলের একপ্রান্ত হইতে,—অসহিষ্ণু কণ্ঠে সুষমা সুন্দরী বলিয়া উঠিলেন "তা হলে ফুল-শয্যার আমোদ......?"

প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া, বেগম সহাস্যে উত্তর দিল,—"সে পবিত্র-কর্ত্তব্যটা,— অসময়ে, অনাচার-বিধ্বস্ত বাঁদ্‌রামো'য় পরিণত কর্‌বার দিকে উৎসাহ নেই।—শিক্ষার তপস্যা শেষে, যোগ্য গৃহী জীবনের অঙ্কে তার স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে.—চটো-না লক্ষ্মী, থামো!"

"মঙ্গল হোক্!"—উৎফুল্ল হাস্য-সুন্দর মুখে সুনীতি বলিল "ভগবান তোমাদের কল্যাণ করুন। আমরা এখন তোমাদের,—"দু'জনায় বলে সবল দুজন, "জীবনের কাষ সাধিও

নীরবে" বলে আশীর্ব্বাদ করে, একটু খুশীর কোলাহল সৃষ্টি করি! সুষমা, তুই বাজনায় বোস্, আমরা সকলে মিলে গান সুরু করি।"

বারো বৎসর পরের কথা।

যথাসময়ে শিক্ষা শেষ করিয়া মণিরুদ্দীন দেশে ফিরিয়াছেন। তাঁহার বিস্তীর্ণ জমিদারীতে বিপুল আয়োজনে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য সুরু হইয়া গিয়াছে। শ্রমজীবিদের উন্নতির জন্য তিনি বহুল প্রচেষ্টায় নানাবিধ সদনুষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। জমিদারীর সর্ব্বসাধারণের, এই কয় বৎসরে বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি এবং মঙ্গলজনক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

বেগম বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করিয়া,—ধাত্রী বিদ্যা শিখিয়া, এখন কর্ম্ম-জীবনে ঢুকিয়াছে। স্বামীর প্রতিষ্ঠিত সমস্ত শিক্ষা মন্দির এবং দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির তত্ত্বাবধান ব্যাপারের সঙ্গে, এখন তাহার ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ-যোগ স্থাপিত হইয়াছে। সে এখন দুইটি সন্তানের জননী বড় ছেলেটি এখন ছয় বছরের, ছোটটি মাস ছয়ের।

সেদিন সকালে বেগম নিজের পুস্তকাগারে টেবিলের কাছে বসিয়া একমনে কি একটা হিসাব মিলাইতেছিল। নিকটেই দোল্‌নায় ছোট ছেলেটি ঘুমাইতেছিল। লিখিতে লিখিতেই কলম্ হাতে করিয়াই—বেগম মাঝে মাঝে দোল্‌নায় দোল্ দিতেছিল। প্রয়োজনমত মাঝে মাঝে উঠিয়া গিয়া,—গৃহের কাজকর্ম্মের তদারক করিয়াও আসিতেছিল।

সুদীর্ঘ হিসাব মিলাইতে মিলাইতে অনেকক্ষণ সময় কাটিয়া গেল। মণিরুদ্দীন বাহিরের কাজ সারিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। নিঃশব্দে দোল্‌নার কাছে আসিয়া, ঘুমন্ত শিশুর দিকে স্নেহময় দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন "এ ভদ্রলোক বেশ অগাধে ঘুমুচ্ছে ত?"

বেগম মাথা তুলিয়া চাহিয়া, মুহূর্ত্তে কলম রাখিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সুগম্ভীর মুখে বলিল "ও ভদ্রলোক জানে যে আমার মায়ের কাজ রয়েছে, অসময়ে উঠে চেঁচামেচি করা অন্যায় হবে, তাই ঘুমুচ্ছে! এখন তুমি এস দেখি, স্কুলের এই হিসেবটা, শেষ করে দাও। আর-তো আমার মাথায় ঢুকছে না।"

"ও মাথায় হিসেব ঢুকেছে না ! আশ্চর্য্য ! হিসেবকে তা হলে বাহাদুর বলতে হবে ! কৈ দেখি ?—" মণিরুদ্দীন চেয়ারটা টানিয়া লইয়া হিসাব দেখিতে বসিলেন।

ছেলের দোলনায় জোরে একটা দোল দিয়া, বেগম কি একটা কায দেখিয়া আসিবার জন্য বাহিরে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরিয়া আসিল। শেল্ফের তাকে কয়েকখানা বই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল, নিঃশব্দে সেগুলিকে গুছাইয়া রাখিতে লাগিল।

কায করিতে করিতে—কি একটা কথা মনে পড়ায় মণিরুদ্দীন মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন "শোন, আজবকে আর একটু কড়া করেই ধম্‌কে দিও ত। ছোক্‌রা বড় বদমাইস্ হয়েছে। পড়্‌তে পড়্‌তে—পড়ার মাঝখানেই, মাষ্টারের কাছ থেকে পনের মিনিটের ছুটি চেয়ে নিয়ে বাগানে ছুটোছুটি কর্‌তে চলে গেছে। আমি আসবার সময় দেখলুম,—মাষ্টারটি বই খাতা নিয়ে বাসর জাগিয়ে চুপ চাপ বসে আছেন।—"

ঈষৎ হাসিয়া বেগম বলিল "আর তুমি অমি নিশ্চিন্ত হয়ে সটান্ চলে এলে ? কেন, সেইখানেই ছেলেটাকে ডেকে একটু শাসন করে আস্‌তে পার্‌লে না ?"

"আহা, মাষ্টার যে-আবার, খুশী হয়েই তাঁর ছাত্রকে খেলে আস্‌বার জন্যেই ছুটি দিয়েছেন বল্লেন। সে ছুটি আমি মেরে দিই কি করে বল ? তবে এরকম ছুটি নেওয়া যে তার পক্ষে ভাল নয়, সেটা তাকে বুঝিয়ে, একটু বলে-করে দিও।"

সকৌতুক দৃষ্টিতে চাহিয়া, সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের স্বরে বেগম বলিল "কেন তুমিই নিজে 'একটু বলে-কয়ে' দাও না,—একটু শাসন-ই করনা একদিন ! আমি একটু দেখি !"

অপ্রতিভ হাস্যে মণিরুদ্দীন বলিলেন "শাসন কর্‌ব কি বল ? যা দুর্দ্দান্ত ধড়িবাজ ছেলে ! চোখ রাঙিয়ে শাসন কর্‌তে গেলেই,—আগে আমায় হাসিয়ে দেবে ! ওর বদমাইসির বহর দেখলে আমি কিছুতেই হাসি সামলাতে পারি নে।—তোমায় ত বরং খাতির করে চলে !"

"যেমন দেখে !.........নাও, নাও, হিসাবটা শীঘ্রী শেষ করে ফেল, নাও ! খাওয়ার সময় ক্রমেই এগিয়ে আস্‌ছে !—"

মণিরুদ্দীন আবার হিসাবে মন দিলেন। দুমিনিট পরেই,—সহসা বাহিরে, ব্যগ্র-উৎসাহিত শিশুকণ্ঠের আহ্বান ধ্বনিত হইল,—"আম্মা,—ঘরে আছ ?"

মণিরুদ্দীন লিখিতে লিখিতে বলিলেন "ঐ! আগে জিজ্ঞেস্ কর, এতক্ষণ কোথায় ছিল, কি করছিল, তারপর…"

বেগম গম্ভীর হইয়া বলিল "আছি আজব, এখানে এস।"

ছেলে বাহির হইতেই ত্রস্তে বলিল "না, না ওখানে নয়, শীগ্‌গীর ছুরিখানা নিয়ে একবার এস তো আম্মা, একটা মস্ত সাপ ধরেছি! প্রকাণ্ড ল্যাজ! আমার গলা পর্য্যন্ত পৌঁছে গেছে!"

সবিস্ময়ে মণিরুদ্দীন বলিলেন "কি? সাপ? সাপ ধরা কি রে? কি সাপ?—" তিনি কলম হাতে করিয়াই,—দ্রুত চেয়ার ছাড়িয়া বারেণ্ডায় বাহির হইলেন। বেগম টেবিলের উপর হইতে পেন্সিল-কাটিবার ছুরিখানা তুলিয়া লইয়া, পিছনে বাহির হইল।

উভয়ে বাহিরে আসিয়া, স্তম্ভিত হইয়া দেখিলেন,—এক প্রকাণ্ড গোখুরা সাপের মুখে রুমাল জড়াইয়া,—নির্ভীক শিশু স্বচ্ছন্দে সাপের মুখটা সবলে ডানহাতে মুঠাইয়া ধরিয়াছে। নিরুপায় সর্প তাহার কোটের হাতটা শুদ্ধ সমস্ত হাতখানা ল্যাজের পাকে জড়াইয়া,—কোটের কলারের উপর ল্যাজ সাপ্টা হানিয়া গলাটা জড়াইয়া লইবার ব্যর্থ চেষ্টায় উপর্য্যুপরি অধীরতা জানাইতেছে! অসম সাহসী বালক, অম্লান বদনে মুঠা দুলাইয়া, বারেণ্ডায় জুতা ঠুকিয়া ধেই ধেই নৃত্য করিতেছে!

উৎকণ্ঠা ব্যাকুল মণিরুদ্দীন উত্তেজিত স্বরে বলিলেন "করেছিস কি রে হতভাগা, ছাড়্, ছাড়্!—"

"উহু"—বলিয়াই বেগম ত্রস্তে আগাইয়া গিয়া—ছেলের সবল মুঠা,—কঠিন চাপে মুঠাইয়া ধরিল। দাঁতে ধরিয়া ছুরির ফলা খুলিয়া ফেলিয়া, স্বামীর হাতে দিয়া বলিল "ল্যাজের দিক থেকে বরাবর প্যাঁচ্ কেটে কেটে এস। ওকে এখন কিছু বোলো না, ভয় পাবার সময় এ নয়। ধরে যখন ফেলেছে, তখন, ছাড়্‌বার চেষ্টা—আর চল্‌বে না!—কেটে ফেল।—"

কলম ফেলিয়া, উত্তেজনারক্ত মুখে দ্রুত স্পন্দিত বক্ষে মণিরুদ্দীন নিরুত্তরে ক্ষিপ্রহস্তে দ্রুত ছুরি চালাইয়া টুকরা টুকরা করিয়া প্যাঁচগুলি কাটিয়া ফেলিতে লাগিলেন। অধীর গর্জ্জনে সাপটা হাতে প্রচণ্ড মোচড় দিয়া, মুখ খুলিয়া লইবার জন্য সবলে চেষ্টা করিতে লাগিল।

মণিরুদ্দীনের হাত কাঁপিতে লাগিল,—আতঙ্ক-উদ্বেগে ! অধীর ওষ্ঠ সবলে দাঁতে চাপিয়া তিনি ছুরি চালাইতে লাগিলেন। বালক ধীর এতক্ষণের পর মনে মনে কিঞ্চিৎ শঙ্কা অনুভব করিয়া,—মাতার প্রস্তর-কঠিন স্তব্ধ-নির্ব্বাক্ মুখের দিকে চাহিয়া—হাসি-হাসি মুখখানি ঈষৎ দোলাইয়া শুষ্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন "সাপটার গায়ে কিন্তু,—খুব—খু—উ—ব বেশী জোর নেই, নেই—না—আম্মা ?"

"হুঁ, জোরে মুঠো ধর,—আরো জোরে।"—মাতার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত নীরস।

মণিবন্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত পাঁচ্ কাটা হইল—গুটাইবার চেষ্টায়, মুঠার মধ্যে সাপটা তখনো অধীর আস্ফালনে, রুদ্ধ গর্জ্জনে ফুঁসিতেছে! বেগম উঠানের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া উৎসাহ সূচক কণ্ঠে বলিল "এবার জোরে,—দূরে ছুড়ে ফেল রুমাল সমেত !"

হাতের বাঁধন খোলা পাইয়া শিশুর তখন স্ফূর্ত্তির সীমা নাই। নিমেষে রুমাল জড়ানো সর্পমুণ্ডটা খেলিবার 'বলে'র মতই,—সবলে উঠানে ছুড়িয়া দিল! আছাড় খাইয়া পড়িয়া রুমালের ভিতর মুণ্ডটা ধড়ফড়্ করিয়া লাফাইতে লাগিল। শিশুর ইচ্ছা হইল, মুক্ত চীৎকারে,—খুনীর উচ্ছ্বাসে জোর-করতালি পিটিয়া, মুণ্ডটার সঙ্গে সঙ্গে সেও তালে তালে খানিক নাচিয়া লয়,—অথবা ছুটিয়া গিয়া মুণ্ডটার উপর জুতা চাপাইয়া দিয়া, আর একটু নিরাপদ-বীরত্ব প্রকাশ করে! কিন্তু সেই সময় মাকে ক্লান্ত ভাবে বসিয়া পড়িতে দেখিয়া, এবং পিতাকে রোষকষায়িত লোচনে স্তব্ধ-গম্ভীর মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া,—সে সদিচ্ছা শুধু পালন করিবার চেষ্টা দূরে থাক, ঘাড় তুলিয়া চাহিতেই বেচারার লজ্জাবোধ হইতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরেই মুণ্ডটা অবসন্ন ভাবে রুমাল সমেত কাৎ হইয়া পড়িল। সাপের রক্ত-মাখা কোটের বোতাম খুলিতে খুলিতে, মিটি মিটি চক্ষে মা'র দিকে চাহিয়া গুণ্ গুণ্ স্বরের অনুকরণে মৃদুগুঞ্জনে বালকবীর বলিলেন "আমি এবার মাষ্টারের কাছে পড়তে যাচ্ছি।"—সঙ্গে সঙ্গে গুটি গুটি চরণে অত্র সুন্দর চালে প্রস্থানোপক্রম !—

পিতা রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "এই রাস্কেল, দাঁড়া!—এই প্রকাণ্ড গোখ্রো তুই কি করে ধরলি ?—"

বালক, মার মুখের দিকে বক্র কটাক্ষে একবার চাহিয়া,—এক নিঃশ্বাসে দ্রুতস্বরে খোলসা

উত্তর দান করিল,—"আমি বাগানে ছুটোছুটি করতে করতে আচমকা সাপটার ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়েছিলুম, আমায় দেখেই ভয় পেয়ে,—ওরা সক্কলেই ভয় পায়,—আর বড্ড বোকা কিনা? —ফোঁস্ করে ফণা তুলেছে। আমিও অমনি সামনে রুমালটা ফেলে দিয়ে,—সাপটা রুমালে ছোবল দিতে না দিতেই চোখে একমুঠো ধুলো ছড়িয়ে দিলুম। তারপরই ওর ঘাড়ে জুতো চাপিয়ে দিয়ে, রুমালশুদ্ধ মুখটা মুঠিয়ে ধরলুম।"

বালক চুপ করিল। প্রশান্ত হাস্যে বেগম বলিল "তারপর—সাপটা যখন হাতে প্যাঁচ লাগাচ্ছিল, তখন খোশ খেয়ালে ধেই ধেই করে এক চোট্ নেচে নিয়েছিলুম, তা বল?"

সবিস্ময় বালক বলিল "তুমি কি করে জানলে বল দেখি?"—তারপর পিতার দিকে চাহিয়া হাসি মুখে সবিনয়ে বলিল "তুমি,—তুমি কিন্তু সাপ ধরতে পারো না, আব্বা! তুমি কেবল—ভয় পাও!"

নির্বাক-স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বেগম হাসিল। ছেলের দিকে চোখ ফিরাইয়া সকোপে বলিল "যাও এবার তোমার দাদির কাছে, তিনি তোমায় 'কুটে' ফেলবেন আজ! দস্যি ছেলে,—হেলে সাপ ধরিস্ ধরিস্,—গোখ্রো কেউটে সাপ নিয়ে খেলা কি রে? আচ্ছা যাও আগে তোমার মাষ্টারকে ছুটি দিয়ে এস, সাপের রক্ত মেখে ঘিন্নি হয়েছে, এখন আগে গোসল খানায় যেতে হবে, বলে এস।—"

বালক একলাফে সিঁড়ি কয়টা ডিঙাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দ্রুত পলাইল।—

ক্ষুব্ধ-বিস্ময়ে মণিরুদ্দীন বলিলেন "উঃ! কি ভয়ানক ছেলে বল দেখি! বুকে একটু ভয় ডর নেই, স্বচ্ছন্দে অত বড় সাপটাকে মুঠিয়ে ধরে এনেছে! যদি একটুকু মুঠো ঢিলে দিত........."

বেগম উঠিয়া দাঁড়াইল। স্নিগ্ধ-কোমল বিদ্রূপ সুন্দর হাস্যে, মাথা দুলাইয়া বলিল "চটছ কেন? সিংহিনীর সন্তান সিংহ-ই হবে! শৃগাল হওয়াটা ওর কুষ্টিতেই লেখে নাই—ওর জন্যে তোমার আফশোস করা মিথ্যে! এখন ঠাণ্ডা হয়ে, হাত ধোবে চল।"

একদৃষ্টে বেগমের মুখের দিকে চাহিয়া, ক্ষণেক নির্ব্বাক থাকিয়া, হঠাৎ মণিরুদ্দীন উচ্চ উচ্ছ্বাসে হাসিয়া ফেলিলেন! বলিলেন "ভাবী সাহেবার কথা আমার মনে পড়ছে! তোমায় দেখে আজ আমারো মুক্ত কণ্ঠে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে,—'অবাক্।'

সবিনয়ে বেগম বলিল "অথাস্ত! অনেক ধন্যবাদ!—এখন ঠাণ্ডা হও, ঢের কাজ পড়ে রয়েছে।"

সমাপ্ত।

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

আগমনী।

-:০:-

[রচনা—শ্রীকালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর]

মা এসেছে আজি ওগো পুরবাসী
　　তোমাদেরে গৃহে ডাকি।
বাঁশরীতে বাজে বারোঁয়া রাগিণী
　　গৃহে-দ্বারে থাকি থাকি॥
কত দিন হ'তে পথ পানে চাওয়া,
নাহি জননীর খাওয়া—পরা—নাওয়া;
দূরদিগন্তে প্রতি তরী পানে
　　চেয়ে আছে কত আঁখি॥
হেথা শিউলি কুসুমে আঙিনা ভরেছে,
　　আলিপনা আধ' ঢকা।
অলি পাখীকুলে আবাহন সভা,
　　রচেছে দাড়িম শাখা;
কদলীকুঞ্জ কাঁধিভারে নত
আঙিনায় ফল সঞ্চিত কত
সব আয়োজন হইয়াছে শেষ;
　　তোমরাই শুধু বাকী॥

স্বরলিপি।

—:০:—

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

বারোঁয়া——কাহারওয়া।

আস্থায়ী।

১´ ০ ১´
II{ সা -া ন্‌না সা । সা -রা -জ্ঞা জ্ঞা I রা রা মা পা ।
মা ০ এসে ছে আ ০ ০ জি ও গো প র

০ ১´ ০
। গা -া মা -া I মা পা মা পা । রা -জ্ঞা সা -রা I
বা ০ সী ০ তো মা দে রে গৃ ০ হে ০

১´ ০ ১´
I ন্‌া -া -া -সা । সা -া -া -া }I{ ন্‌া সা গা মা ।
ডা ০ ০ ০ কি ০ ০ ০ বাঁ শ রী তে

০ ১´ ০
। পা -া -া পা I গা মা পা ধা । পা -ধণা ণা পা I
বা ০ ০ জে আ লোঁ কাঁ ০ রা ০০ গি ণী

১´ ০ ১´
I র্সা ণা ধা পা । মা -া পা -া I সা -গা -মা -পা ।
গৃ হ দ্বা রে খা ০ কি ০ আ ০ ০ ০

০ ১´ ০
। গা -া -মা -া }I মা পা মা পা । রা -জ্ঞা সা রা I
কি ০ ০ ০ তো মা দে রে গৃ ০ হে ০

১´ ০
I ন্‌া -া -া -সা । সা -া -া -া II
ডা ০ ০ ০ কি ০ ০ ০

অন্তরা।

১´　　　　　　০　　　　　　১
II{র্রা র্রা র্রা র্রা । র্রা -া র্রা -া I র্সা র্রা র্রা র্রা ।
ক ত দি ন　হ ০ তে ০　প থ পা নে

০　　　　　　১´　　　　　　০
। র্সা -র্রা র্জ্ঞা র্জ্ঞা I র্রা র্সা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্রা -া র্রা -া I
চা ০ ও য়া　না হি জ ন　নী ০ র ০

১´　　　　　　০　　　　　　১´
I র্না ন্না না না । পা -নর্সা র্রা র্সা }I{ পা -া পা ধা ।
খা ওয়া প রা　না ০০ ও য়া　দূ ০ র দি

০　　　　　　১´　　　　　　০
। পা -া -া মা I গা মা পা পা । পা -ধা -পা পা I
গ ০ ন্ তে　প্র তি ভ রী　পা ০ ০ নে

১´　　　　　　০　　　　　　১´
I র্সা পা ধা পা । মা -া গা -া I সা -গা -মা -পা ।
চে য়ে আ ছে　ক ০ ভ ০　আঁ ০ ০ ০

০　　　　　　১´　　　　　　০
। গা -া -মা -া }I মা পা মা পা । রা -জ্ঞা সা -রা -I
খি ০ ০ ০　তো মা দে রে　গৃ ০ হে ০

১　　　　　　০
I ন্া -া -া -সা । সা -া -া । II
ভা ০ ০ ০　কি ০ ০ ০

সঞ্চারী।

১´　　　　　　০　　　　　　১
II{প্া প্া ন্া -া । ন্া ঋা সা দা I ম্া সা রা জ্ঞা ।
হে থা শি উ　লি কু সু মে　আ ঙি না ত

| জ্ঞা -া জ্ঞা -া I রা পা মা পা । মা -জ্ঞা সা -রা I
রে ০ ছে ০ আ লি প না আ ০ ধ ০

১´ ০ ১´
I ন্‌া -া -সা -া । সা -া -া । I মা মা পা পা ।
টা ০ ০ ০ কা ০ ০ ০ অ লি পা খী

০ ১´ ০
। পা -া গা -মা I গা মা পা ধা । পা -ধা -ণা ণা I
কু ০ লে ০ আ বা হ ন স ০ ০ ভা

১´ ০ ১´
I র্স ণা ধা পা । মা -া গা -া I সা -গা -মা -পা ।
র চে ছে দা ড়ি ০ ম ০ শা ০ ০ ০

০
। গা -া -মা -া }I
খা ০ ০ ০

আভোগ।

১´ ০ ১´
I{র্রা র্রা র্রা -া । র্রা -া র্রা -া I র্সা র্রা র্রা র্রা ।
ক দ লী ০ কু ঞ্জ ০ কাঁ খি ভা রে

০ ১´ ০
। র্সা -র্রা র্জ্ঞা -া I র্রা র্মা র্জ্ঞা -া । র্রা -া র্রা । I
ন ০ ড ০ আ ঙি না য় ফু ০ ল ০

১´ ০ ১´
I না -া না না । পনা -র্সর্রা র্সা । }I{ গা গা ধা পা ।
স ঞ্চি ত ক০ ০০ ড ০ স ব আ য়ো

০ ১´ ০
। মা -া -া । I গা মা পা ধা । পা -ধা -ণা । I
জ ০ ন্ ০ হ ই য়া ছে শে ০ ষ্ ০

I র্সা ণা ধা পা । মা -া গা -া I সা -গা -মা -পা ।
তো ম রা ই শু ০ ধু ০ বা ০ ০ ০
০ ১´ ০

। গা -া -মা । }I মা পা মা পা । রা -জ্ঞা সা -রা I
কী ০ ০ ০ তো মা দে রে গৃ ০ হে ০
১´ ০

I ন্‌া -া -া -সা । সা -া -া । II II
ডা ০ ০ ০ কি ০ ০ ০

দাগ ।

—:●:—

কমলার বরপুত্র নিমাই মিত্রের ফুলবাগানে পুষ্পিত আশোকগাছের নীচে দাঁড়াইয়া তাঁর ছোট মেয়ে ইন্দু আরো তিন চারটি সঙ্গিনী জুটাইয়া কচিগলার ঝঙ্কার তুলিয়া লাঠির ঘায়ে ফুলের স্তবকগুলি ক্ষত বিক্ষত করিতেছিল।

বসন্ত প্রভাতের মধু সঞ্চয়ী মৌমাছির দল নাড়া পাইয়া বন্‌বন্‌ করিয়া উড়িয়া উঠিবা মাত্র ভয় পাইয়া দাঁড়াইতেছিল। তাদের অনেক কষ্টে ফুল ঝরিয়া পড়িল বটে, কিন্তু কুঁড় একটীও ঝরিল না।

দোতলার জান্‌লায় দাঁড়াইয়া নিমাই মিত্র হাসি মুখে তাদের এই রঙ্গ দেখিতেছিলেন, তিনি ডাকিলেন “ছোট মা, ওকি হচ্ছে ?”

মুখ উঁচু করিয়া ইন্দু বলিল “আজ যে অশোক ষষ্ঠি বাবা, কুঁড়ি পারছি মা খাবেন।”

“তার জন্যে তোমার অত দুঃখু পেতে হবে না. ঢের লোক আছে, তুমি চলে এস।”

ইন্দু একবার অন্য মেয়েদের মুখ পানে চাহিয়া দেখিয়া বলিল “না বাবা, আমি ফুল পাড়্‌বো।”

নীচেকার বড় দালানে বসিয়া বাড়ীর গিন্নি ইন্দুর মা বাঁধাকপি কাটিতেছিলেন, কর্ত্তা আসিয়া বলিলেন "ইন্দু গেছে তোমার জন্যে অশোক ফুল আন্‌তে।"

গিন্নি বলিলেন "সে তার সখ্‌—আমি তো আর তাকে বলি নি।"

"বেশ দেখাচ্ছিল কিন্তু, শকুন্তলার মত।"

"হুঁ, দুষ্মন্ত তো তোমার ওই নীলু বোসের ছেলে?"

"বড় ভালো ছেলে গো, তা নইলে আমি কি পছন্দ করি, কেন তুমি কি অমত কর?"

গিন্নি স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন "নাঃ অমত কেন ক'র্‌বো তোমার চেয়ে কি আর আমি বেশী বুঝি?"

ইন্দু এই বৃদ্ধ দম্পতির সর্ব্বশেষ সন্তান। এইটীকে পাত্রস্থ দেখিয়া যাইবার আগ্রহ নিমাই মিত্রের খুব ছিল। যদিই কালের তলবে ইতিমধ্যেই সংসারের ডেরা উঠাইতে হয় তা হলে এই কাজটা তো বাকীই থাকিয়া যাইবে!

কলিকাতায় নীলমণি বোসের ছেলে সুধীর বোসের সঙ্গে ইন্দুর বিবাহের কথা পাকা হইয়াছিল। সুধীর নীলমণি বসুর একমাত্র ছেলে, এর জন্যে হয় তো এক ছেলের বৌ বলিয়া ইন্দু শ্বশুর শাশুড়ীর কাছে খুব আদর পাইতে পারিবে এই মনে করিয়া নিমাই মিত্র কথা দিয়াছিলেন। নীলমণি বসুও যথেষ্ট ভদ্রতা করিয়া ইন্দুকে এক রকম যাচিয়া লইয়াছিলেন।

ইঁহাদের মধ্যস্থ ঘটক ছিলেন নীলমণিবাবুর প্রতিবেশিনীও নিমাই মিত্রের ভগিনী সুশীলা। তিনিই খুব খুসী হইয়া বলিয়াছিলেন "এই বিয়েই দাও দাদা, আমিও সদা সর্ব্বদা ইন্দুকে দেখতে পাব।"

ইন্দুর মায়ের একথাটা খুব মনে লাগিয়াছিল শ্বশুর বাড়ী গিয়াও মেয়ে পিসির চোখের উপর থাকিবে। আর ছেলের মনে মনে খুসী হইলেন এই ভাবিয়া যে, বড়লোকের বাড়ীর পদ্মফুলটীর মত সুন্দরী মেয়ে একরাশি হীরামুক্তার জলুষ লইয়া আসিয়া বাড়ীঘর আলো করিয়া দিবে।

সুধীর তখন সেকেণ্ডইয়ারে পড়িতেছিল। তবে খুব ভাল ছেলে, খুব 'মেধাবী' বলিয়া তার সুখ্যাতি সকলে করিত! ফাগুণ মাসের শেষাশেষি সুধীরের পরীক্ষা হইয়া গেল।

চৈত্র মাসটা বাদ দিয়া বৈশাখ মাসের প্রথমেই তার সঙ্গে ইন্দুর শুভবিবাহ খুব ধুমধামে সম্পন্ন হইয়া গেল।

অজানা অচেনা লোকেদের সঙ্গে পরের বাড়ী বিদায় হইবার সময় ইন্দু নিতান্ত অনিচ্ছায় তার বৃদ্ধ বাপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ছিল, কিন্তু চারিদিকে চাহিয়া তিনিও তাকে গাড়ীতেই বসাইয়া দিলেন। চোখ তাঁর জলে ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছিল, ধরা গলা থেকে একটু প্রবোধ বাণীও তিনি বাহির করিতে পারিলেন না, পাছে কচি মেয়ের সঙ্গে বুড়ারও এই দুর্ব্বলতা দেখিয়া লোকে হাসে!

প্রথম বারে শ্বশুরবাড়ী গিয়া দিন সাতেক পরেই আবার ইন্দু ফিরিয়া আসিল। শ্বশুর বাড়ী থাকিতে তার ভালো লাগে নাই কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া মায়ের কাছে শুইয়া এই সাত দিনকার দেখা নূতন গল্প মাকে শুনাইতে তার বেশ লাগিত।

চেলী টোপর পরা যে তরুণ লোকটিকে সে লজ্জা য় ভয়ে আকণ্ঠ লাল করিয়া আড়ষ্ট হাতে মালাদান করিয়াছে। এখন বাড়ীর সকলে মিলিয়া তাকে বুঝাইতে লাগিলেন সেই নাকি তার এ জগতে সব চেয়ে বেশী আপন। অলক্ষ্যে তার প্রাণের প্রত্যেক শুভ্র পাতাগুলি অদৃশ্য হাতের আঁকা রঙীন লিপিতে ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

(২)

বছর দুই পরে একদিনকার আকস্মিক রোগে নীলমণি বসু সংসারের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। উপার্জ্জন ভরসায় সংসার যেন একেবারে পথে বসিয়া পড়িল! সুধীর তখনো কলেজে পড়ে।

শ্বশুরের মৃত্যুর পরদিনই ইন্দু শ্বশুর বাড়ী আসিল। বাপের বাড়ী হইতে বোঝাখানিক উপদেশ লইয়া আসিয়াছিল তবু সে শোকময় বাড়ীখানাতে আসিয়া একেবারে অকূল পাথার দেখিল।

সর্ব্বত্র চুপচাপ। শাশুড়ী একেবারে নির্ব্বাক, স্বামীও প্রায় তাই ছোট ছোট ননদগুলি অবধি গম্ভীর এমনি ভাবে শ্রাদ্ধ তো চুকিল। এবার আর ইন্দুকে বাপেরবাড়ী পাঠানো হইল না। বরং নিতান্ত অনভ্যস্ত কাজ কর্ম্মও একেবারেই তার হাতে আসিয়া পড়িল।

কাজগুলি যদি ধীরে সুস্থে একটা একটা করিয়া আসিত, তবে হয় তো সেগুলিকে ইন্দুর অত কঠিন বোধ হইত না, কিন্তু বুদ্ধি ছিল বলিয়া সে তাও বানাইয়া লইল। কিন্তু তবু তার শাশুড়ীর অপ্রসন্ন মন তার কাছে ভয়ানকই হইয়া থাকিল।

দুপুর বেলা রান্না সারিয়া ইন্দু উনুনের কাছেই বসিয়াছিল। ভোর হইতে খাটিয়া খাটিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণায় তার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

ননদেরা খাওয়া দাওয়া সারিয়া বিশ্রাম করিতেছে,—কেবল শাশুড়ী তখনো খান নাই, বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন, তাঁর আহ্নিক শেষ হইলে তাঁকে ভাত দিবার জন্য ইন্দু উঠিয়া দাঁড়াইল, একটু হাসিয়া বলিল "উঃ মাগো কি ক্ষিদেই পেয়েছে!"

শাশুড়ী সে কথাটা যেন শুনিয়াও শুনিলেন না, মুখখানা গম্ভীর করিয়া খাইতে গেলেন। তাঁর খাওয়ার পর আঁচাইবার জল দিয়া ইন্দু নিজে খাইতে যাইতেছিল। এমন সময়ে শাশুড়ী আবার কি একটা ফরমাইস্ করিলেন, যা করিতে গেলে ঘণ্টাখানিক লাগে, ইন্দু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "আগে রান্নাঘরের কাজটা সেরে নেবো না মা?"

শাশুড়ী রাগিয়া উঠিয়া "রান্নাঘরের তো ভারী কাজ,—তোমার খাওয়া তো! তা নয় একটু পরেই খেও!"

ইন্দু তার স্বভাব মত হাসিয়াই বলিল "বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে যে মা,—গা বমি বমি ক'রে উঠ্ছে—"

"কেন, কচি খুকী তো নও; একটু তর্ সয়না—"

ইন্দুর মুখখানা শুকাইয়া গেল। সে শুকনো মুখে রান্নাঘরের শিকল তুলিয়া দিয়া শাশুড়ীর ফরমাইসি কাজ করিতে গেল! কাজ সারিয়া যখন খাইতে গেল তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে!

ইন্দু পিসিমা সুশীলা আসিয়া ডাকিলেন "কই গো বেয়ান, কি করছো?"

গিন্নি খুব সৌজন্য দেখাইয়া বলিলেন "এই ভাই, এস এস,—আঃ কি গরমই পড়েছে ক'দিন!"

সুশীলা এদিক ওদিক চাহিয়া বলিলেন "কই ইন্দু কোথা গেল?"

গিন্নি বলিলেন "খাচ্চে বোধহয়, রান্নাঘরে আছে—"

"এত বেলায় খাচ্চে! ওমা কেন গো, অসুখ করবে যে এমন অসময় করে খেলে।"

গিন্নি চুপ করিয়া রহিলেন। সুশীলা রান্নাঘরে ঢুকিয়া ইন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বারোটার সময় তোর ননদ খুদীকে দেখে জিজ্ঞেস করলুম বল্‌লে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, তবে তুই এত দেরীতে খাচ্চিস কেন রে? মুখ শুকিয়ে গেছে, একেবারে!"

ইন্দু ভাত খাইতেছিল, বলিল "তা কি হবে,—আমার কাজকর্ম্ম সারতে দেরীই হয়ে যায়, যে কুঁড়ে আমি, একটুখানির কাজে আমার ঘণ্টাখানি কাটে।"

একেই তো এই বেয়ানটিকে ইন্দুর শাশুড়ী মোটেই দেখিতে পারিতেন না অন্ততঃ বেয়ান হইয়া অবধি বরং একটু ভয়ই করিতেন, এঁর যখন তখন আসা আর ইন্দুর সঙ্গে গল্প করা, এ সব দেখিয়া তিনি মনে মনে জ্বলিয়া যাইতেন, তবে কিনা মুখ্ ফুটিয়া বলিতে পারিতেন না যে "ওগো তুমি এসোনা" কেন না সুশীলা তার বিশ বছরকার প্রতিবেশিনী।

সেদিন সুশীলা যাইবার সময় বেশ গুটীকতক ঝাঁঝালো কথা মিষ্ট করিয়া বেয়ানকে শুনাইয়া গেলেন। ফলে গিন্নির বাঁকা মন আরো বেশী বাঁকিয়া গেল।

সুশীলা চলিয়া গেলে তিনি ইন্দুকে ধরিয়া ঝাল ঝাড়িলেন,—কিন্তু ইন্দু এত সরল যে শাশুড়ীর কুটিল কথার একেবারে সোজা অর্থ ধরিয়া সে কথা সরল করিয়া লইল, শাশুড়ীর বুকনি নিষ্ফল হইয়া গেল।

বৈকালে সুধীর কলেজ থেকে ফিরিয়া আসিলে, হাত পা ধুইবার পর' মা তাঁর ছোট মেয়েকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে খেঁদী তোর দাদাকে খাবার দিয়ে যা যে।"

ইন্দু তখন শোবার ঘরে বিছানা ঝাড়িতেছিল, সুধীর বাড়ী আসিয়াছে বুঝিতে পারিয়া ইচ্ছা করিয়াই দেরী করিতেছিল। সুধীরের পড়ার সমস্ত খরচই এখন নিমাই মিত্র চালাই-তেছেন, এর জন্য দোষ ত্রুটী করিলে বাপের কাছে যেমন ধমক খাইতে হয়; শশুরের কাছেও

তেমনি সুধী ঃ একটু আধটু ধমক্ খাইত, আর মনে ইন্দুর উপর চটিয়া নিজের উপর চটিয়া পড়া ছাড়িয়াদিবার সংকল্প করিত।

জলখাবার খাইতে খাইতে মায়ের মুখের সত্য মিথ্যা এক ঝুড়ী নালিশ শুনিয়া মুখ ভারী মন ভারী করিয়া সুধীর শুইবার ঘরে আসিয়া ঢুকিল; অন্য দিনের মত স্ত্রীকে দেখিয়াও একটু হাসিয়া তকে আপ্যায়িত করিল না।

ঘরের কোন্ হইতে একগাছা লকলকে বেত লইয়া সে বেড়াইতে যাইবার জন্য সাজিতে বসিল। এই বেতগাছা ছিল তার ভ্রমণ সঙ্গী। সুধীর যখন আয়নার কাছে দাঁড়াইয়া মাথায় চিরুণী চালাইতেছে তখন ইন্দু বলিল "এখনি আবার বেরুবে?"

সুধীর উত্তর দিল না। সে তার মনটাকে ওই বড়লোকের অহঙ্কারী মেয়ের কাছে কিছু শক্ত হইবার জন্য তৈরী করিতেছিল, কিন্তু পাছে আবার গায়ে পড়া ফুলের মত কচি মুখখানা দেখিয়া মন গলিয়া যায়, তাই মুখ ফিরাইয়াছিল।

ইন্দু অত বুঝিল না। সে বেতটা হাতে করিয়া বলিল, "এত রোদ থাকতে বেরিও না গো, মা বলেন এতে অসুখ করে।"

সুধীর রুষ্টমুখে বলিল, "বকোনা তুমি!"

ইন্দু অবাক্ হইয়া স্বামীর মুখপানে চাহিল, নিজের অপরাধ কিছুই তার মনে পড়িল না, তবে এমন রাগ হইল কেন? মাথা নীচু করিয়া সে হাতের বেতগাছা খুঁজিতে লাগিল। বলিবার আর কিছু ভাষা খুঁজিয়া পাইল না।

পাঞ্জাবীর হাতের বোতাম আঁটিতে আঁটিতে সুধীর বলিল, "কই, আমার বেতগাছা দাও!"

ইন্দু বেতটা উঁচু করিয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "কেন, মারবে নাকি?"

হ্যাঁ;—দাও তো এখন!"

বলিয়া সুধীর বেতটা হাতে লইল। কোনো কোনো মানুষ আছে, যারা নূতন যৌবনের অন্ধ মাদকতায় আত্মহারা হইয়া পড়ে, নিজের বিবেচনাকে সকল সময়েই অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করে। তাদের হাতে পাওয়া আর একটী তরুণ জীবন যাহাকে দায়িত্বপূর্ণ স্নেহের ধন সব সময়ে মনে না করিয়া উশৃঙ্খল যাজার মত মস্ত অহঙ্কারে কথায় কথায় দেখাইতে যায়, যে

তাদের যে ক্ষমতা আছে সে কতখানি ! ফলে ক্ষতি বা দুঃখ সব নিজেরাই ভোগ করে ! সুধীর সেই লক্ষ্যকে বেতগাছ পূর্ণ বীরত্বভরে একবার শূন্যে আছড়াইয়া দেখিতে গেল, কিন্তু গ্রহ দোষে বেতটা পড়িল ইন্দুর মোমের মত হাতখানির উপর।

বাপের দেওয়া রত্ন আভরণ ছাড়িয়া সাধ করিয়া সে ননদদের মত রেশমী কাঁচের চুড়ি পরিয়াছিল, চুড়িগুলি চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল, হাতের জ্বালা ভুলিয়া চুড়ির শোকেই ইন্দু কাঁদিয়া ফেলিল।

নিতান্ত অপ্রতিভ সুধীর কি যে বলিবে ঠিক করিতে না পারিয়া বাহির হইয়া গেল। ইন্দুর ননদেরা এই ঘটনা লইয়া কানাকানি করিতে লাগিল। সূর্য্যোস্তের সঙ্গে সঙ্গে ঘটনা সালঙ্কারে নিমাই মিত্রের অন্তঃপুরে গিয়া ঢুকিল !

সুধীর ইচ্ছা করিয়া ইন্দুকে মারে নাই, তবে সে মনের চাপা রাগে উত্তেজিত খুবই হইয়াছিল, কিন্তু নিজের ব্যবহারের লজ্জায়, ক্ষোভে, সে সেদিন অনেকখানি সময় পথে কাটাইয়া তবে বাড়ী আসিল। রাত্রে দম্পতির মধ্যে একটু শান্তি স্থাপিত হইলেও হইতে পারিত কিন্তু সুধীরের লজ্জায় অনুশোচনায় সে ইন্দুর দিকে যেন চাহিতেও পারিতেছিল না ! ইন্দু ভয়ে, অভিমানে, মুখ খুলিল না। মেঘও কাটিল না !

পরদিন সপুত্র নিমাই মিত্র আসিয়া ইন্দুকে লইয়া গেলেন। মনের অশান্তির হাজার রকম কারণ থাকিলেও সে অশান্তিকে ইন্দুর বড় বেশী কিছু করিতে পারিত না, তবে আবাল্যের অভ্যাস মত খাওয়া দাওয়ার বদল হওয়ায় সে কিছু রোগা ও লম্বা হইয়া গিয়াছিল, সেটা তার বাবার চোখে বেশ বিঁধিল ! তিনি স্নেহভরা চোখে মেয়ের দিকে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন এরা দেখ্‌ছি মেরে ফেল্‌বে একে !

যাইবার সময় ইন্দু শাশুড়ীকে একটা প্রণাম করিল, শাশুড়ীও আশীর্ব্বাদ করিলেন। কেন না বুদ্ধিমান নিমাই মিত্র মনে মনে যত গরমই হ'ন না কেন মুখে খুব নরম ভাবেই ইন্দুকে মাত্র দুই একদিনের জন্য লইয়া যাইবার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন !

একটু দূরে মাথা হেঁট করিয়া সুধীর দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু সেদিকে চাহিয়া দেখিবার অবকাশ ইন্দুর হইল না; তার মন অভিমানে ভরা, হাতে কালশিরার দাগে খুব ব্যথাও

হইয়া রহিয়াছে। কাষ্ঠের পুতুলের মত সে গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। কালো রংয়ের প্রকাণ্ড ওলেয়ার ঘোড়া গম্ গম্ শব্দে রাস্তা কাঁপাইয়া মোড়ে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মুখখানাতে শ্রাবণের অমাবস্যা নামাইয়া সুধীর বই লইয়া পড়িতে বসিল; পড়াশুনা তো ছাই হইল, কেবল ইন্দুর কান্নাটাই যেন তার মনটাকেও পিষিতে লাগিল। কাল কি করিলে যে গোলমাল মিটিয়া যাইত সেই কথা সে আজ ভাবিতে বসিল।

(৩)

গাড়ী হইতে নামিয়া নিমাই মিত্রের সঙ্গে ইন্দু বাড়ীতে ঢুকিবামাত্র তার মা আসিয়া সেই কালশিরা পড়া হাতখানা তুলিয়া দেখিয়া মুখ ভারী করিলেন কিন্তু তাকে কিছু বলিলেন না। কিন্তু লজ্জায় ইন্দুর মুখ কালো হইয়া গেল, হাতখানা কাপড়ে লুকাইয়া সে উপরে উঠিল। খানিক বাদে তার বৌদিদি আসিয়া বলিলেন, "দেখি তোর হাতখানা কি হয়েছে?"

ইন্দু বিরক্ত হইয়া বলিল, "কেন, কি হয়েছে আমার হাতে?"

"দেখি না একটু!"

"না,—কি দেখ্‌বে তাই শুনি,—আজ মজা পেয়েছো সবাই তোমরা!"

বৌদিদি জোর করিয়া হাতখানা টানিয়া দেখিল, কথা শুনিল না, ইন্দুও ভয়ানক রাগিয়া শেষটা কাঁদিয়া ফেলিল। বৌদিদি সহানুভূতি দেখাইয়া বলিল, "এমন কেন ক'রলে রে, সে তো এমন ছেলে নয়!"

ইন্দু বলিল, "কি করেছে সে?"

"এই হাতখানায় কালশিরে পাড়িয়ে দিয়েছে।"

"সে কেন দেবে।"

"তবে কি হয়েছে তাই বল্ না, অমন রাগ করিস কেন ভাই, তুই বল্‌বি তবে তো আমরা ঠিক কথা শুনবো।"

"সব কথাই তো তোমাদের শোনা হ'য়ে গিয়েছে, আবার শুনবে কি। আমি কিছু বল্‌তে পারবো না।"

"অস্বীকার ক'রছিস কেন তবে ? বরের নিন্দে বড় লাগে বুঝি ?"

"মিছি মিছি নিন্দে ক'রলে সকলের নিন্দেই লাগে, কারু নিন্দে আমার ভাল লাগে না।"

বাস্তবিক ভালবাসা অন্ধ। অভিমানে মন ভরিয়া আছে, তবু তার দোষ প্রাণে বাজে, তার গুণের কথা ভাবিতেই যে তৃপ্তি পাওয়া যায়, সেই কথা ভাবাই ভাল লাগে! মানুষের দোষ গুণ ওজন করিয়া যদি কেউ ভালবাসিতে চায় তা হইলে বোধহয় ভালবাসা পদার্থটা এতদিনে পৃথিবী হইতে উবিয়া যাইত! যে মায়ের কোল ছাড়িয়া পরের ঘরে যাইতে একদিন তার বুক ফাটিয়া গিয়াছিল, সেই কোলে আসিয়াও তার বুক জুড়াইয়া গেল না।

মেয়ের শরীর মোটেই সারিতেছে না বলিয়া নিমাই মিত্র ডাক্তার ডাকাইয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন, মেয়ে হাসিয়া মাকে বলিল, "আমার তো কিছুই হয় নি মা!"

সকাল বেলা, শীতের মিষ্টি রোদে দোতলার বারান্দা ভরিয়া গিয়াছিল। বড় একটা সোফার উপর বসিয়া ইন্দু তার দাদার ছোট খোকাটীকে খেলা দিতেছিল। বছরখানেক বাপের বাড়ী থাকিলেও ইন্দু তার শশুরবাড়ীর বা স্বামীর কোনও চিঠিপত্র পায় নাই!

সেই ছেলেটির সেদিনই অন্নপ্রাশন ছিল। বাড়ীতে আত্মীয় স্বজন অনেকেই আসিয়াছিলেন, ছেলের মা ঠাকুমা সকলেই সেদিন কাজকর্ম্মে ভয়ানক ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু ইন্দু অবসর পাইয়া রাস্তায় চোখ পাতিয়া বসিয়াছিল, যদি সেই একখানি চেনা মুখ ভুলিয়াও এ পথে আসিয়া পড়ে!

আর পাঁচজন আত্মীয়দের সঙ্গে সুশীলাও সেদিন আসিয়াছিলেন। হাজার কাজের মাঝেও তাঁর তীক্ষ্ণ চোখ ইন্দুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছিল। সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরিবার সময় তিনি বলিলেন, "বউ, ইন্দু অমন শুকিয়ে যাচ্ছে কেন বল দেখি।"

ইন্দুর মা বলিলেন, "কি ক'রব বল, কিছুতেই ও সারছে না!"

"গ্রাদন শাশুড়ীর কাছে পাঠিয়ে দাও না, তাদের মিষ্টি ভাতে মোটা হ'য়ে আসবে, কি বলিস রে ইন্দু?"

ইন্দুর মা বলিলেন "সে কথা আমিও ভাবি কিন্তু উনি বলেন যে তা হ'লে ও একেবারেই

সারবে, আর ফিরতে হবে না,—জান তো ওঁর মেজাজ,—কথার ওপর তো আর কথাটি কইবার যো নেই, ওমনি রেগে যাবেন !"

সুশীলা একটু চুপ করিয়া কি ভাবিয়া বলিলেন "তা আমার সঙ্গেই না হয় দাও, ছুদিন বেড়িয়ে আসুক, তবু ঠাঁইনাড়া হ'য়ে মন ভাল হবে ওর,—কি বল ? যাবি তো ইন্দু ?"

ইন্দু সাগ্রহে বলিল "যাবো পিসিমা !"

মা বলিলেন "তবে দাঁড়া আগে ওঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে আসি, নইলে এরপর আমাকেই দোষী ক'রে বসবেন !"

সুশীলা বলিলেন "এ আর তুমি দোষের কাজ কি ক'রছো, তবে যাও হুকুম নিয়ে এস ; কি বলেন শুনি।"

গিন্নি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "তুমি কেন যাওনা ভাই, তুমি বললে আর না বলতে পারবেন না, আমি গেলে হয় তো ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেবেন ?"

সুশীলা কর্ত্তার মত আনিতে গেলেন। নিমাই মিত্র তখন বিশ্রাম করিতে সবে মাত্র বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়াছেন, প্রথমটা সুশীলাকে হাঁকাইয়া দিতেছিলেন কিন্তু সুশীলার ঘণ্টাখানেক ব্যাপী যুক্তিতর্কে হারিয়া শেষে মত দিলেন। বলিয়া দিলেন "দেখো বুদ্ধি খাটিয়ে আবার ওকে শাশুড়ীর কাছে পাঠিও না যেন !"

সুশীলা বলিলেন "না তা কেন পাঠাতে যাব,—মেয়ে আমাদেরত ভার বোঝা হয়নি এত !"

সুশীলা যখন ইন্দুকে লইয়া নিজের বাড়ীতে আসিলেন তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে ! দিনের আলো নিবিতে না নিবিতে চাঁদের আলোয় চারিদিক ছাইয়া গিয়াছিল। পিসিমার বাড়ীর উঠানের হাসনাহানার ঝাড়টায় এক গাছ ফুল ফুটিয়া মাদক গন্ধে বাড়ী মাতাইয়া দিয়াছিল।

ইন্দু ছাতের উপর গিয়া দাঁড়াইল। সুশীলা কাপড় ছাড়িয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করিয়া আসিয়া বলিলেন "ওমা, তুই ঠাণ্ডা লাগাচ্ছিস বুঝি, অসুখ ক'রলে দাদা আমায় কি ব'লবেন !"

ইন্দু বলিল—"আমার অমন কথায় কথায় অসুখ করে না।"

"না,—বরের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে তুই দেবতা হ'য়ে গেছিস নয় ?"

ইন্দু মুখ লাল করিয়া বলিল "কবে আমি তার সঙ্গে ঝগড়া করেছি, তুমি দেখেছিলে ?"

"খুদীরা ব'লছিল তো, তারা দেখেছে—"

ঘাড় নাড়িয়া ইন্দু বলিল "মিথ্যে কথা ;—একেবারেই মিথ্যে কথা !"

সুশীলা মুখ ঘুরাইয়া একটু হাসিলেন, বলিলেন "আমিও তো তাই বলি, সুধীরের মত ছেলে কি কখনো এমন অমানুষ হ'তে পারে ? রাগ তা ব'লে নেই কারো ?

ইন্দু চুপ করিয়া রহিল, সুশীলা খানিকক্ষণ তার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন "একবার দেখা করবি ইন্দু ?"

ইন্দু একটু হাসিয়া বলিল "য :—!"

কিন্তু তার সারা মুখখানা আনন্দের আভায় লাল হইয়া উঠিল। সুশীলা সে টুকুও লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন। বলিলেন "তবে ব'স্ তুই, আমি যাই রান্নার যোগাড়টা ক'রে দিয়ে আসি।"

ইন্দু বলিল "একা বসে থাক্‌বো কেন, আমিও তোমার সঙ্গে যাই—"

"না, না, আমি এখুনি আস্‌ছি, তুই থাক্," বলিয়া তিনি নামিয়া গেলেন। সুশীলার নিজের কেবল দুটী মেয়ে ছিল, তারা বেশীর ভাগ শ্বশুর বাড়ীতেই থাকিত, ভাল ঘরেই বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া তাদের ভাগ্যে মাতৃদর্শন বড় বেশী ঘটত না। সুশীলা দুটী মা হারা দেওরের ছেলে মানুষ করিতে ছিলেন, তাদের লইয়াই তিনি সংসারী। বড় মন্মথর বিবাহ হইয়াছিল, ছেলে মানুষ বলিয়া বৌ বাপের বাড়ীতেই থাকিত, ছোট সুরথ তখনো স্কুলে পড়ে তার বয়স তের চৌদ্দ বৎসর হইবে।

রাধুনী বামুনকে রান্নার যোগাড় করিয়া দিয়া সুশীলা আবার যখন ইন্দুর কাছে আসিলেন ইন্দু তখনো ছাতে বসিয়াছিল, সুশীলা বলিলেন "ঘরে গিয়ে বস্‌বি ইন্দু, শীত লাগ্‌ছে না ?"

"না, আমি আর একটু ছাতেই থাকি পিসিমা,—আমার তো একটুও শীত মনে হচ্ছে না !"

সুশীলা সেইখানে বসিয়া ঝুলির ভিতর হাত দিয়া নিঃশব্দে হরিনাম জপিতে লাগিলেন; একটু পরে নীচে তলা হইতে তাঁর দেওর পো মন্মথ ডাকিল "বড়মা!"

সুশীলা আলিসার ধারে দাঁড়াইয়া বলিলেন "এই ছাতেই পাঠিয়ে দে বাবা, আর নামতে পারিনে!"

সিঁড়িতে জুতার শব্দ পাইয়া ইন্দু জড় সড় হইয়া বসিল, সুধীর আসিয়া বলিল "আমাকে আপনি ডাকছেন?"

"হ্যাঁ বাবা, ডেকেছি, তুমি দাঁড়াও একটু এইখানে, আমি আসছি।"

সুশীলাকে উঠিতে দেখিয়া সুধীর বলিল "কোনো দরকার আছে কি?"

"ওমা, দরকার নেই তো তোমায় ডাকালুম কি ক'রতে? বড্ড দরকার আছে, একটু দাঁড়াও, আমি ঘুরে এসে বলছি।"

সুশীলা নামিয়া গেলেন। ইন্দু বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল, প্রথমটা চাঁদের আলোয় সুধীর তাকে ঠিক চিনিতে পারে নাই, দাঁড়াইতে দেখিয়া ঠিক চিনিল, তার মুখখানা পলকমাত্র গম্ভীর কালো হইয়া উঠিল, পরক্ষণেই কালো মুখে আলো টানিয়া আনিয়া সে বলিল "এই দরকার? তুমি কখন এলে ইন্দু!"

ইন্দু স্বামীর কাছে আসিয়া মাথা নামাইয়া দাঁড়াইল, বদ্ধ গলায় হঠাৎ কথা ফুটাইতে পারিল না, সুধীর তার ডান হাতখানা বাড়াইয়া দিয়া বলিল "দেখি—তোমার হাতখানা?"

যে হাতখানা এত কাণ্ডর মূল, সেখানাকে কাপড়ে ঢাকিয়া ইন্দু অন্য হাতটাই আগাইয়া দিতেছিল, সুধীর বলিল "এ হাতখানা নয়, ওইখানা!"

ইন্দু মাথা তুলিয়া বলিল "তুমি এখনো রাগ ক'রে আছ?"

সুধীর স্ত্রীকে বক্ষে টানিয়া লইয়া হাসিয়া বলিল "নিশ্চয়! অপরাধ তোমার অনন্ত!—এই তার শাস্তি!"

ইন্দু নিবিড় আবেগে বদন আনত করিয়া কম্পিত ওষ্ঠে বলিল "ছিঃ, কি যে কর!"

শ্রীনীহারবালা দেবী।

নয়নের নহ ঈশ, তুমি হৃদয়ের।

নয়ন ভুলিয়া যায় মুদিলে নয়ন,
মিশে যায় তম মাঝে ছবি মুকুরের,
উন্মাদক লালসার সুতীব্র দহন
নিভে যায় পোড়াইয়া শান্তি মানবের।
প্রবল পিপাসাদগ্ধ স্বার্থপর আঁখ
সমগ্র সৌন্দর্য্যরাশি প্রেম-আস্পদের
পিয়ে তৃপ্ত হ'তে চায়, দূরে ফেলে রাখি'
অধিকার অনাসক্ত ধীর হৃদয়ের।
বিচিত্র বিজলী ভাতি—হেন বিলসন,
হৃদয়বিহীন এই নয়নের খেলা,
চাক্ষুষ প্রণয় বহ্নি—লালস দর্শন,
কতক্ষণ? ক্ষণমাত্র, সব ছাই, ধূলা।
তাই বুঝি হৃদয়েশ! না দাও দর্শন;
নয়নের নহ তুমি, জীবন জীবন।

মিলন।

—:•:—

প্রভাবতীর রূপটা ছিল প্রখর, গুণটা ছিল তার কতখানি তার খবর কেউ বড় রাখিত না কেননা সে ছিল গ্রামের জমীদারের মেয়ে। গ্রামের লোকে তাহাকে যখন তখন 'রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী' এই বাঁধা গৎএ প্রশংসা করিয়া ধন্য হইত। সে অনেক বার অনেককে বলিতে শুনিয়াছে 'এ মেয়ের এত রূপ রাজরাণীরই উপযুক্ত।' বাল্যকাল হইতে লোকের মুখে এই মন্তব্য শুনিতে শুনিতে প্রভাবতীর আপনার প্রতি একটা উচ্চ ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল— সে বাস্তবিকই রাজরাণী হইবে! এই তাহার অদৃষ্ট লিপি, সৌন্দর্য্যের পুরস্কার। যতই বয়স বাড়িতে লাগিল, সে ততই আপনাকে বাহিরের চালচলনে এই উচ্চ পুরস্কারের উপযোগী করিয়া তুলিতেছিল। রাজরাণীর মত গাম্ভীর্য্য, রাজা রাজড়ার ঘরের মত উঁচুদরের কথা এই দিকেই তার ছিল ঝোঁক। তার হাব ভাবে কথায় পাড়ার কোন মেয়ে তাহার সহিত মিশিতে সাহস করিত না।

কিন্তু রাজপুত্র না হইয়া তালপুকুরের জমিদার হরিশ মুখুয্যের ছেলে নির্ম্মলের সহিত তাহার বিবাহের কথাবার্ত্তা প্রায় স্থির হইয়া গেলে, সকল লোকেই বলিল "বেশ হবে, যেমন মেয়ে—তেমনি বর হবে, প্রভার কপাল ভাল।" প্রভা কিন্তু মনে মনে ভাবিল "ছাই কপাল! কোথায় রাজপুত্র—আর কোথায় বি, এ, ফেল্ ক্ষুদ্র জমিদার তনয়।" কিন্তু তাহার মনে যাহাই থাক্ সে মুখে কোন কথা বলিল না।

যথা সময়ে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। ধুম ধামও যথেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু শুভদৃষ্টির সময়ে প্রভার শরীর মন যেন ঘৃণায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল—এত বড় অযোগ্য বিবাহ বুঝি জগতে আর কোন স্থানেই ঘটে নাই। বাসর গৃহে প্রভার সখী মণিমালা পরিহাস করিয়া কহিল "সই তোর কপাল ভাল, তাই এমন বর পেলি।" প্রভা ঘৃণায় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল—"পোড়া কপাল।"

সখী তার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল "ছিঃ, ও কি কথা লো!"

পরদিন শুভলগ্নে প্রভা শ্বশুর বাড়ী আসিল। অন্নপূর্ণা সাদরে বধূকে বরণ করিয়া লইলেন।

অন্নপূর্ণা নির্ম্মলের মাতা নহেন—বিমাতা। তাহা তাঁহার ব্যবহারে কাহারও বুঝিবার যো ছিল না; তিনি বস্তুতঃই নির্ম্মলের গর্ভধারিণীর ন্যায় ছিলেন। নির্ম্মলের মাতা নির্ম্মলকে এক বৎসরের শিশু রাখিয়া পরলোক গমন করেন! শিশু প্রকৃত পক্ষে অন্নপূর্ণা দেবীর ক্রোড়ে তাঁহার আদর যত্নে মানুষ হইয়াছিল। আজ তাঁহার সেই পুত্রের বিবাহ। মাতা বধূ বরণ করিয়া লইলেন। অসামান্যা রূপসী পুত্র বধূর মুখ দেখিয়া অন্নপূর্ণার চোখে আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িল। বধূর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া প্রতিবেশিনীদের কাছে সগর্ব্বে কহিলেন—"বৌ করতে হয় ত এমনি! যেন লক্ষ্মীর প্রতিমা।"

প্রভাবতীর অন্তরে যাহাই থাক্, সে একবারেই যে প্রাণহীনা ছিল তাহা নহে, তাহারও হৃদয়ে ভক্তি ছিল, ভালবাসাও ছিল, কিন্তু অবস্থান্তরে পড়িয়া তাহার হৃদয় বৃত্তিগুলি প্রকাশ পাইয়াও স্থায়ী হইতে পারিত না। আজীবনের সংস্কার ভুলিয়া, নূতন জীবন গঠন করিবার মত শক্তি তাহার না থাকিলেও সে দৃঢ়তার সহিত আপনার বিদ্রোহী, মনটাকে ফিরাইয়া লইতে চেষ্টা করিতেছিল। সে শাশুড়ীর বাক্যে সন্তুষ্ট হইল কিন্তু সৌন্দর্য্যের গর্ব্বে তাহার মনটা কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিল, শ্বশ্রূকে সন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছা হইলেও তার অসংযত হৃদয়টা কেবলই বেঁকিয়া বসিতে ছিল।

দুই এক দিনের মধ্যেই ব্যবহারে কথাবার্ত্তায় তাহার অন্তরটা অন্নপূর্ণাদেবীর নিকট দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া গেল, তিনি দেখিলেন প্রভা যে পরিমাণে সৌন্দর্য্য লইয়া আসিয়াছে, তাহার চতুর্গুণ সঙ্গে আনিয়াছে দেমাক। কিন্তু তিনি নিজে দেখিয়া শুনিয়া বৌ আনিয়াছেন, বধূর আচরণ নিতান্ত বিসদৃশ ঠেকিলেও একথা কাহারও নিকট মুখ ফুটিয়া বলিবার উপায় ছিল না। বড় গিন্নি একদিন তাহাকে নিভৃতে পাইয়া কহিলেন "ছোট বৌ, রূপ দেখে বৌ করলি, কিন্তু এ যে কেউটে সাপের বাচ্ছা!" অন্নপূর্ণ মুখখানা কালি করিয়া একটুখানি ম্লান হাসিয়া "ছেলে মানুষ, বুদ্ধি চাই, একটু বয়স হলেই শুধরে যাবে।" বলিয়া তাঁহাকে দ্বিতীয় প্রশ্নের অবসর না দিয়াই অন্যত্র চলিয়া গেলেন। বড় গিন্নি বিরক্ত হইয়া কহিলেন "তোর মাথা হবে।"

একদিন রাত্রে প্রভা শয়ন কক্ষে শয়ন করিয়াছিল। দূর সম্পর্কীয় ঠানদি, নির্ম্মলকে ঘরে ডাকিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। আজ কয়দিন হইল তাহাদের বিবাহ হইয়াছে,

কিন্তু এ পর্য্যন্ত প্রভা তাহার সহিত বাক্যালাপও করে নাই। প্রথম প্রথম নির্ম্মল ভাবিয়াছিল—বালিকাসুলভ লজ্জা ছাড়া এ আর কিছুই নহে। তাই আজ শয্যায় যাইয়া পত্নীর পার্শ্বে বসিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল "অমন চুপটি করে রয়েচ যে, বাড়ীর জন্যে মন কেমন করচে বুঝি?"

প্রভা কাঁধ হইতে তাহার হাতখানি সরাইয়া দিয়া ভ্রূকুটি কুটিল নেত্রে চাহিয়া কহিল "আঃ, কেন বিরক্ত করচো।"

নির্ম্মল একটুখানি হাসিয়া আবার কহিল "বিরক্ত হচ্চ প্রভা! তুমি কি আমায় ভালবাস না?" স্পষ্ট স্বরে কহিল—"না, অমন করবে ত আমি এখুনি উঠে যাব।" নির্ম্মল গম্ভীর ভাবে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। এই কি নবপরিণীতা পত্নীর প্রথম প্রিয় সম্ভাষণ? ক্ষুব্ধ স্বরে "আর বিরক্ত করবো না প্রভা, তুমি শোও।" বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল। ইহার পর দুইদিনেই নির্ম্মল পত্নীর অন্তরের ভাব বুঝিয়া আপনা হইতেই সে ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িল। সব যেন শেষ হইয়া গেল যত আশা, যত উৎসাহ! অভিমান-ব্যথিত আশাহত প্রাণে নির্ম্মল সেই ভাবে কোনরূপে অষ্টমঙ্গলটা পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিল। বধূ পিত্রালয়ে গেলে সে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

এই সময় সহসা মুখুজ্যে মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন। প্রভা আবার শ্বশুরবাড়ী ফিরিয়া আসিল। স্বামীর সংসারের এই আকস্মিক বিপদে প্রভার মনে স্বামীর প্রতি একটা সহানুভূতির ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। নির্ম্মলও আশা করিয়াছিল পত্নী এ সময়ে ফিরিয়া আসিয়া সমদুঃখীর সমবেদনায় তাহাকে আপ্লুত করিয়া দিবে কিন্তু কার্য্যতঃ উভয় পক্ষের কাহারও ব্যবহারে তাহা প্রকাশ পাইতে পারিল না। দুরন্ত সঙ্কোচ, লজ্জা, সমস্যার বাধা তাহাদের দু'জনের মধ্যে মাথা তুলিয়া এইটা হৃদয় স্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ রুদ্ধ করিয়া দিল, কেহই বুঝিল না কাহারও অন্তর। নির্ম্মল স্থির করিল 'আর না, ক্ষতকে আরও বিদ্ধ করিয়া প্রসারিত করিবার আবশ্যক নাই—যথেষ্ট হইয়াছে। সে অন্তরের শান্তি ফিরিয়া পাইবার অভিলাষে সুদূর পশ্চিমে যাত্রা করিবে স্থির করিল।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর, নির্ম্মল আপনার কক্ষে শয়ন করিয়াছিল। অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "নির্ম্মল, তুমি নাকি কলকাতা যাবে?" নির্ম্মল সসব্যস্তে বিছানায় উঠিয়া

বসিল "তাই ত মনে কচ্চি, শরীরটাও বড় ভাল নেই, একবার ঘুরে আসা যাক্।" অন্নপূর্ণা আতঙ্কিত ভাবে কহিলেন "আর তোমার ঘুরে আসায় কাজ নেই, এইখানেই ওষুধ বিষুদ খাও সেরে যাবে এখন।" ঈষৎ হাসিয়া নির্ম্মল কহিল "চিরকাল কি ঘরের কোণে বোসে থাকা যায় মা! না তাই ভাল লাগে।" অন্নপূর্ণা সস্নেহে পুত্রের পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন "ফিরবে কবে? এই ত সে দিন এসেচ।" নির্ম্মল কহিল "সে কথা এখন বলা কঠিন, যদি ভাল লাগে, কিছুদিন থেকেই আসা যাবে।" তাহার এই বারবার ভাল লাগা কথাটা অন্নপূর্ণার অন্তরে আঘাত করিল। বধূর উপর একটু রাগও হইল—আহা, বাড়ীতে শান্তি পায় না, তাই না বাছা বাহিরে থাকতে চায়! কেমনই বা মেয়ে সে—এত রূপ লইয়াও যদি স্বামীকে সুখী করিতে পারিল না, তবে সে রূপ থাকিলেই বা কি, আর না থাকিলেই বা কি। বিশেষতঃ এমন স্বামী! নির্ম্মল কি তাঁহার তেমন ছেলে! ভাবিয়া ক্ষুন্ন স্বরে তিনি কহিলেন "কেনই যে, বাছা তোমার ঘরে ভাল লাগে না, তা তুমিই জান। এত করে বলি যে, মনটাকে স্থির কর,—তোমার অভাব কিসের?" অন্যমনস্ক ভাবে নির্ম্মল উত্তর দিল "অভাব না থাকলেই কি—আচ্ছা থাক্ মা, আমি ভেবে দেখি।" অন্নপূর্ণা মনে মনে প্রীত হইয়া উঠিয়া গেলেন,—না হবে কেন, এমন রূপ কি বৃথায় যাবে।

বধূর স্বামীবশীকরণে অক্ষমতাই যে নির্ম্মলের মনঃপীড়ার একমাত্র হেতু, এবং সেই জন্যেই যে ছেলে ঘরবাস করিতে চায় না, এ সম্বন্ধে অন্নপূর্ণা দেবীর সন্দেহ মাত্র ছিল না। তাই আজ কাল সুবিধা পাইলেই পাকে প্রকারে ছেলেকে হিতোপদেশ, এবং বধূর সহিত পুত্রের সন্ধি স্থাপনের চেষ্টায় করিতেন। নির্ম্মলের বিষণ্ণ মুখ, সংসারে ছাড়া ছাড়া ভাব, সকল বিষয়ে নির্লিপ্ততা দিবারাত্রি যেন তাঁহার অন্তরে কাঁটার মতই বিঁধিতে থাকিত। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিবার উপায় ছিল না।

একমাসের উপর প্রভা বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছেন, এই সুদীর্ঘ দিনগুলি এক বাড়ীতে বাস করিয়াও স্বামী ত একদিনের জন্যও স্বামীর অধিকারে পত্নীর চিত্তকে ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন না। কোন দিন একটু ভালবাসার চিহ্নমাত্র ত দেখাইলেন না, এতটুকু অনুরাগ, স্নেহ শ্রদ্ধা কিছুই ত না! অনেক স্থলে অনেকের স্ত্রী মনোমত হয় না বটে, তবু সে সব স্বামী ত এমন ভাবে আপনার দাবী ছাড়িয়া দেয় না!

প্রভার মনটাতেও ভাঙ্গন ধরিয়াছিল। প্রতিপদে প্রতিহত হইয়া তাহার গর্ব্বিত হৃদয়টা যে পরিমাণে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল, অলক্ষে তাহার হৃদয়তট ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল ততখানি। সে নোয়াইতে না চাহিলেও মনটা তাহার বার্ত্তার ক্ষোভে পূর্ণ হইয়া তাহাকে স্বামী সম্বন্ধে সজাগ করিয়া তুলিতেছিল। পাশের কক্ষে বসিয়া প্রভা একখানি নভেল হস্তে লইয়া মাতা পুত্রের কথা শুনিতেছিল, মাঝখান হইতে কথা বন্ধ হওয়ায় সে ক্ষুণ্ণ হইল। তাহার উৎকণ্ঠিত মন সর্ব্বদাই যে গোপন তথ্যটী জানিতে চাহিত তাহার সন্ধানের সম্ভাবনা ছিল মাতাপুত্রের বাক্যে; সে বিষয় নিরাশ হইয়া সে আশাহতার শ্বাস ত্যাগ করিল। প্রভা বিরক্ত হইয়া হস্তস্থিত বইখানার পাতা উল্টাইয়া এখান সেখান দেখিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু কি যে পড়িতেছে তাহার একবিন্দুও যখন বোধগম্য হইল না, তখন সেখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। কিন্তু যে চিন্তাটাকে সে আর মনের ভিতর স্থান দিবে না বলিয়া বদ্ধপরিকর হইতেছিল, আজ যেন সেই চিন্তাটাই জোর করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার সমস্ত মনটাকে অধিকার করিয়া বসিতেছিল। সে আবার ভাবিল—যে স্বামী স্বামীর অধিকার লইল না, তাঁহার কাছে কেন বা সে—ভিক্ষা চাহিতে যাইবে; যেখানে এতটুকু স্নেহ মমতার আশা নাই, সেখানে এইটুকু দানেরই বা প্রয়োজন কি? একটা অতৃপ্তির ব্যথা সে অন্তরে অনুভব করিল।

একটা নূতন চিন্তা সহসা তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। সে ত ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ কিছুই পায় নাই, সেই ত ইচ্ছা করিয়া আপনার অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছে এবং অবহেলার তীক্ষ্ণ অস্ত্রগুলা বাছিয়া বাছিয়া প্রয়োগ করিয়া, অহঃরহঃ তাঁহাকে দগ্ধ করিয়াছে। এত অনাদর অবহেলা সহিয়াও ত তিনি কোন দিন একটা কটুক্তি বা বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তিনি ত জোর করিয়া আপনার অধিকার গ্রহণ করিতেও ত পারিতেন! তাহার ত কোন দিন চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু কেন? যখন এই প্রশ্নটা তাহার মনে দ্বিধা জাগাইয়া দিল, তখন স্বামীর ব্যবহার তাহার কাছে একটা জটিল প্রহেলিকা বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। তবুও আপনার স্বার্থপূর্ণ অযৌক্তিকতার লজ্জার শত ধিক্কার দিয়া যেন তাহাকে আজ স্মরণ করাইয়া দিল যে, বাস্তবিক সেই অপরাধিনী। খোলা জানালার বাহিরে মুক্ত

আকাশের পানে সে চাহিয়া দেখিল সূর্য্য ডুবিয়া যাইতে আর বেশী বিলম্ব নাই। তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে নীচে চলিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা নীচে নামিয়া আসিতে আসিতে বার বার এ বিষয়টা আপনার মনে আলোচনা করিয়া দেখিতেছিলেন। বধূর ব্যবহারের কথাটা ভাবিয়া সত্যই আজ তাঁহার অন্তরটা যেন তিক্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। সম্মুখে বড়গিন্নিকে দেখিতে পাইয়া, তিনি সে ভাব চাপা দিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, বড়গিন্নি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বলি ছোট বৌ, সত্যি নির্ম্মল কাল কলকাতা যাবে না কি ?"

অন্নপূর্ণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া "বলছিল তাই" বলিয়া দ্রুত পদে চলিয়া গেলেন। বড়গিন্নি অবাক্ হইয়া খানিকক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া, আপনার মনে বধূর উদ্দেশে বকিয়া মনের ঝাল মিটাইয়া লইতে লাগিলেন "সত্যিই ত, ঘরে না সুখ পেলে বাইরে যাবে, এর আর আশ্চর্য্য কি। বৌমার এ যে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। এমন একগুঁয়ে ব্যাদ্‌ড়া মেয়েও ত দেখিনি।" অন্নপূর্ণা ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন "দিদি চুপ্ করো।"

বড়গিন্নি উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন "চুপ্ করব কেন শুনি ?" অন্নপূর্ণার ভয়ে গলা কাঠ হইয়া গেল, তিনি মৃদুস্বরে কহিলেন, "হাজার হোক্ সে ছেলে মানুষ।" বড়গিন্নি যতই বকিতে ছিলেন, তাঁহার ক্রোধ উত্তরোত্তর ততই বাড়িতে ছিল তিনি পুনরায় চেঁচাইয়া কহিলেন "তোর ওই এক কথা—ছেলে মানুষ, কিন্তু দোষ তার তত নয়, যত তোর্ তুই তাকে দিন দিন বাড়িয়ে তুলছিস্।"

অন্নপূর্ণ ঠিক্ এই আশঙ্কাই করিতে ছিলেন, কথায় কথা বাড়িয়া যাইতেছে, দেখিয়া তিনি মুখখানা অন্ধকার করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন।

রাত্রে অন্ধকার কক্ষে শয্যা গ্রহণ করিয়া নির্ম্মল পত্নীর চিন্তাটাকে মন হইতে সরাইতে পরিতে ছিল না। সে হয় ত তাহাকে মোটেই ভালবাসে না। নহিলে এখন নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকার ঔদাসীন্যে স্বামীর উপরে দাবী দাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে এমন আপনাকে দূরে দূরে রাখিতে চায় ! কোন্ স্ত্রী এমন ভাবে স্বামীর যথেচ্ছাচারে প্রশ্রয় দিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে ? এ পর্য্যন্ত কোনদিনই ত সে তাহার মনের কথা জানিতে এতটুকুও

চেষ্টা করিল না বা নিজের ব্যথা কোনও ছলে সামান্য আভাসেও ত সে কোনদিন তাহাকে জানিতে দেয় নাই। রাগ দুঃখ, অভিমান কিছুই ত না। স্বামী যেন তাহার কেহই নহে, এমনিই উদাসীন। স্বামীর ঔদাসীন্যে যেন প্রভার কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। একটা দারুণ অভিমান তাহার অন্তরটাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। আপনাকে পত্নীর সংস্রব হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া তাহার সহিত সমন্ধ ত্যাগ করিবার জন্য মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সে মনে মনে বলিল "না, স্ত্রীর এত অবহেলা আর সহ্য হয় না।" সে মনে এ কথা বলিল বটে, কিন্তু তাহার অন্তর তাহাতে সায় দিল না। পত্নীর তাচ্ছিল্য মনে করিয়া তাহার অন্তরের অন্তরতম স্থান হইতে একটা তীব্র বেদনার রুদ্ধ নিঃশ্বাস আবারও যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল। সে যাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া মুক্তির আনন্দে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে চাহে, তাহার ব্যাকুল অন্তরটা নিতান্ত ভিক্ষারীর মত সেই হৃদয়হীণা পত্নীর কাছেই একটু স্নেহের প্রার্থী হইয়া তাহারই পানে ছুটিতে চায় কেন? তাহার বিদ্রোহী অন্তরটাকে সে আর কোন মতে বাগে আনিতে না পারিয়া নিতান্ত অসহায় ভাবে দুই চক্ষু মুদ্রিত করিল, এবং দুই নেত্রের কোণ দিয়া অবিশ্রান্ত বিন্দু বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া মাথার বালিশটাকে ভিজাইয়া দিল।

বধূকে নির্জ্জনে পাইলে কেমন করিয়া কোন কথাগুলি কোন বিশেষণে কিরূপে বুঝাইয়া দিবেন তাহারই একটা খসড়া প্রস্তুত করিতে করিতে অন্নপূর্ণা দেবীরও সে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। তবুও সাফল্যের উৎসাহে অনিদ্রাজনিত ক্লান্তি যেন মুহূর্ত্তের মধ্যেই দূর হইয়া গেল। অনেক বুঝাইয়া বলিয়া কহিয়া সে দিনটা তিনি নির্ম্মলকে থামাইয়া রাখিতে পারিলেন বটে, কিন্তু পরদিন নির্ম্মল মায়ের এবং জেঠাইমায়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া নিজেরই সেই স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ করিল।

অন্নপূর্ণার সব উপদেশ তাহাদের অভিমানের মধ্যে পড়িয়া স্রোতের মুখে তৃণ খণ্ডের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া গেল। তাহার প্রবাস গমনের আগ্রহ উৎসাহ না থাকিলেও সে চারিগুণ উৎসাহ দেখাইয়া আপনার কাছে আপনাকে প্রতারিত করিতে চাহিতেছিল। পত্নীর কাছে বিদায় লইবার ইচ্ছা তাহার মনে মুহূর্ত্তের জন্য জাগিয়াছিল, কিন্তু তাহার দুর্ব্বল চিত্তকে আর বেশী প্রশ্রয় দেওয়া উচিৎ নহে,—বিবেচনা করিয়া বার কতক ইতস্ততঃ করিয়া সে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। উপরের শয়ন কক্ষের গবাক্ষ পথে দুইটী সজল চক্ষু তাহারই পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে যে চাহিয়া ছিল তাহা সে টেরও পাইল না। সশব্দে যখন গাড়ী-খানা দৃষ্টির বাহির হইয়া গেলে বেদনা ব্যথিত বক্ষটাকে দুই হস্তে চাপিয়া ধরিয়া প্রভা আবারও শয্যাতলে লুটাইয়া পড়িল। এই বয়সে তাহার একি শাস্তির ব্যবস্থা! এই লঘু পাপে, এমন গুরু দণ্ডের ব্যবস্থা কেন? তার চেয়ে তাহাকেই কেন বিদায় করিয়া দেওয়া হইল না! সে যে এর চেয়ে ঢের ভাল ছিল।

অন্নপূর্ণা অনেকক্ষণ যে পথে নির্ম্মল তাঁহার বক্ষের পাঁজরগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল, সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অঞ্চলে চোখের জল মুছিলেন; ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দোর বন্ধ করিয়া দিয়া মাটীর উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হয় ত পুত্রের এই শাস্তি তাঁহারই স্বকৃত নহিলে যে নির্ম্মলকে তিনি নিজের অন্তরের সমস্ত স্নেহ নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া, এতটুকু হইতে এতবড় করিয়া তুলিয়াছেন, যে নির্ম্মল কোন দিন তাঁহার কথার অবাধ্য হইতে সাহস করে নাই, আজ সে তাঁহারই সমস্ত স্নেহ অনুরোধ এড়াইয়া সব উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া গেল।

প্রভাতের আলো তখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। নির্ম্মলকে বিদায় দিয়া বড়গিন্নি প্রাঙ্গন মধ্যস্থিত তুলসীমঞ্চরটার একটু দূরে আসিয়া ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িলেন। বাড়ীর পুরাতন ঝি ক্ষ্যান্ত, ঠাকুরঘরের চাবি চাহিতে আসিয়া তাঁহার মেঘাচ্ছন্ন মুখের পানে চাহিয়া আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না, ফিরিয়া গেল।

একটুখানি পরে ভৃত্য রাইচরণ কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়া ধমক্ খাইয়া ফিরিয়া গেল। বড়গিন্নি সেইখানেই বসিয়া রহিলেন। এমন সময় মালী-বৌ ফুল লইয়া সেইখানে আসিয়া কহিল "বড় মা, ঠাকুরঘর ত এখনও খোলা হয় নি, ফুল রাখবো কোথা?"

বড়গিন্নী ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলেন "জানি নি, চুলোয় দাও গে।" মালী-বৌ অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। সে এতটুকু বেলা হইতে ফুল যোগাইতেছে, বড়গিন্নির স্বভাব তাহার অবিদিত নাই। একি! বড়গিন্নি চেঁচাইয়া আবার বলিলেন "মালী বৌ তোর কি আক্কেল? ওখানে এখনও জল পড়ে নি তা দেখছিস্ তো।" বলিয়া এক ঘড়া জল হুড়্ হুড়্ করিয়া ঢালিয়া দিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, কেমন করিয়া কাজ করিতে হয়। ভয়ে গিরিবালা কাট হইয়া গেল। মালী-বৌ ফুল রাখিয়া চলিয়া গেল।

একটুক্ষণ পরে পুজারী ঠাকুর আসিয়া কহিলেন "এতখানি বেলা হলো এখনও ঘর খোলা হয় নি, হুঁ বলি বড়মার আজ হয়েছে কি?" বড় গিন্নি উচ্চকণ্ঠে কহিলেন "কেন বাড়ীতে কি আর কেউ নাই, গিন্নিকে বলগে না ঠাকুর।" পুজারী-ঠাকুরের বিস্ময়ের অবধি রহিল না, তিনি চিরকাল দেখিতেছেন, বড়গিন্নিই বাড়ীর সর্ব্বেসর্ব্বা, আজ আবার নূতন গৃহিণী কোথা হইতে আসিল?

ক্রমে বেলা বাড়িয়া যাইতেছে। বড়গিন্নি ততই অস্থির হইয়া এঘর ওঘর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ক্ষ্যান্ত সাহস করিয়া কহিল "তাই চাবিটা দাও না গো বড় মা, ঘরটা খুলে পরিস্কার করে দি।" "বলি চোখের মাথা খেয়েছিস্ না কি? দেখ্‌তে পাস্ না।" বলিয়া চবির গোছাটা লইয়া ঝনাৎ করিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। ক্ষ্যান্ত তাহা উঠাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

প্রভাবতী নীচে নামিয়া আসিতেই, বড়গিন্নি বলিয়া উঠিলেন "বড় মানুষের মেয়ের ঘুম ভাঙ্গলো? হুঁ, গেরস্থর বৌঝি কি আর বলবো, সে পথ কি আছে। নইলে বাড়ীর মধ্যে ওই একটা ছেলে, বংশের দুলাল, সেই কিনা গৃহত্যাগী—"

তিনি ক্রন্দনের বেগ রোধ করিতে করিতে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। অন্নপূর্ণা সসব্যস্তে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিলেন, বধূ যেন আড়ষ্ট কাট হইয়া গেছে। তাহার বিবর্ণ মুখের পানে চাহিতে তাঁহার সাহস হইল না; কহিলেন—"বৌমা দাঁড়িয়ে কেন, যাও মা গা ধুয়ে এস।" বধূ করুণ নেত্রে শাশুড়ীর মুখের পানে চাহিয়া চলিয়া গেল। অন্নপূর্ণা কহিলেন "গিন্নি বৌমাকে জল দিগে যা।"

বড়গিন্নি চেঁচাইয়া বলিলেন "তা নইলে ওর এত বুকের পাটা, তুইই ত ওকে আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছিস্।"

অন্নপূর্ণারও আজ মেজাজটা ঠিক্ ছিল না। তিনি রুক্ষস্বরে বলিয়া ফেলিলেন "কে ? আমি ? বেশ্ দিয়েছি ত দিয়েছি, তার হবে কি ?" বড় গিন্নি জ্বলিয়া উঠিলেন "তা ত দিবিই তুই, কথায় বলে সতীন কাঁটা সয় না, তার যাতে মন্দ হয় তা তুই করবিই ত।" অন্নপূর্ণার আর সহ্য হইল না তাঁহার ওষ্ঠাধর বারম্বার কাঁপিয়া উঠিল, তিনি দাঁত দিয়া অধর চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন "তা বল্‌বে বৈ কি দিদি, নিজের সুখ-সাধে জলাঞ্জলী দিয়ে, যখন বুকের রক্ত দিয়ে নির্ম্মলকে মানুষ করেছিলুম, ওই বারাণ্ডায় তাকে বুকে নিয়ে যখন খাড়া রাত কাটিয়ে দিতুম, তখন দেখ্‌তে পাও নি! সে ত এই সতীন কাঁটাই—না আর কেউ ? থাক্ আর আজ থেকে যদি আমি ওদের কোন কথায় থাকি ত অতি বড় দিব্বি রইল আমাকে। তোমার বৌ, তুমি যে করে পার, ওকে শাস্তি দাও।"

বহ্নিতে আহুতি পড়িল, বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বড় গিন্নি কহিলেন "বয়ে গেছে আমার, চুলোয় যাক্ না সব, বাবা এ বাড়ীতে থাকাও দায়, কথ টি বল্‌বার যো নেই গা ? কি বল্লুম আমি যে এত ? কি করবি,—ফাঁসি দিবি ?" "ঘাট্ হয়েছে আমার দিদি, এ আপদ কালই বিদেয় হবে, থাক তুমি সংসার নিয়ে।" বলিয়া অন্নপূর্ণা দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। বড় গিন্নি কহিলেন "বাস্ রে, মেয়ের তেজ দেখ ;—যাবি কোন্ চুলোয়, তিন কুলে ত ঠাঁই নেই।" বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চোখ দিয়া দর দর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

(৩)

নির্ম্মল কলিকাতায় একখানা ঠিকা গাড়ী ভাড়া করিয়া বন্ধু সতীশচন্দ্রের বাড়ীতে আসিয়া নামিল। সতীশ তখন বাড়ীতেই ছিল, বাহির হইয়া আসিয়া নির্ম্মলকে দেখিয়া "কি হে নির্ম্মল যে, এতদিন পরে কি মনে কোরে ভাই ? বাড়ীর সব ভাল ত ?" বলিতে বলিতে তাহার হাত ধরিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল "মা, কে এসেছে দেখ।" মাতা আনন্দময়ী তখন সবে আহ্নিক সারিয়া উঠিতে ছিলেন, বাহিরে আসিয়া নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া কহিলেন "এস বাবা, এস, বাড়ীর সব ভাল ত বাবা ? তোমার মা, জেঠাইমা, বৌমা

সব—" নির্ম্মল সংক্ষেপে উত্তর দিল "হাঁ-মা সব ভাল।" তাহার ম্লান বিবর্ণ মুখের পানে—ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া তিনি সন্দিগ্ধ মনে আবার—জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার শরীর বেশ্ ভাল ছিল ত বাবা ?" দ্বারের পাশে বধূ রমলা দাঁড়াইয়াছিল, তিনি তাহার দিকে ফিরিয়া কহিলেন "বৌ-মা, নিমুর জন্যে চা জলখাবার নিয়ে এস ত মা, পথের কষ্ট, বাছার মুখ শুকিয়ে গেছে।" নির্ম্মল লজ্জিত হইয়া কহিল "না না, এত ব্যস্ত হবার দরকার নেই মা, আমি জল খেয়ে এসেছি।" "ওমা, সে কি কথা! সতীশ, নিমুকে ঘরে নিয়ে যা, আমি জলখাবার পাঠিয়ে দিচ্চি।" বলিয়া তিনি দ্রুত পদে চলিয়া গেলেন।

একটুখানি পরে রমলা দুইখানি রেকাবীতে মিষ্টান্ন এবং দুই পেয়ালা গরম চা লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল এবং টেবিলের উপরে রাখিয়া, সে বাহির হইতে উদ্যত হইল, সতীশ খপ্ করিয়া তাহার হাত-খানা ধরিয়া মাথার ঘোমটা টানিয়া খুলিয়া দিয়া কহিল "নির্ম্মলকে দেখে আবার লজ্জা!" রমলা তাহার হাত সরাইয়া দিয়া, সপ্রেম দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। সতীশ উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। তাহাদের পতি পত্নীর মধ্যে এই মধুর স্নেহ-প্রীতি, নিজের অন্তরে অনুভব করিয়া, আপনার দুর্ভাগ্যের সহিত তুলনা করিয়া, নির্ম্মলের অন্তরের বেদনা যেন শতগুণ বৃদ্ধি পাইল, একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস তাহার অন্তরের গোপন প্রদেশে যেন ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিল। সে তাহা সযত্নে চাপা দিয়া সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে চেষ্টা করিল।

এমনি করিয়া বন্ধুর ভবনে নির্ম্মল কিছুদিন কাটাইয়া দিল। সে দিন সতীশ আদালত গিয়াছে। বাহিরের কক্ষে, খোলা জানালার কাছে বসিয়া নির্ম্মল মুক্ত আকাশের পানে চাহিয়া ছিল। অনন্ত আকাশের মত একটা কূলহীন চিন্তা আসিয়া তাহার হৃদয়টাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল! এমন সময় রাস্তা দিয়া একখানা মোটর জানালার কাছে আসিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। সচকিত ভাবে নির্ম্মল চাহিয়া দেখিল, মোটরে বসিয়া অমরনাথ। অমর নামিয়া আসিয়া কহিল "কি হে নির্ম্মল যে, অনেক দিন পরে দেখা! বেশ ভাই বড় সুখী হলুম। কিন্তু একলাটি বোসে কি করচো? চলনা একটু ঘুরে আসবে।"

নির্ম্মলেরও মনটা বড় ভাল ছিল না; একটু ঘুরে এলে দোষ কি? ভাবিয়া অমরের হাত ধরিয়া সে মোটরে উঠিয়া বসিল। অমরনাথ বেশ মিষ্টভাষী, সদালাপী;

কিন্তু কুসঙ্গে পড়িয়া তাহার চরিত্রদোষ ঘটিয়াছিল। এক চরিত্রহীনতায় তাহার সকল গুণ ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। নির্ম্মল তাহা শুনিয়াছিল, এবং মনে মনে তাহাকে ঘৃণাও করিত। তবুও আজিকার এই নির্জ্জন বাসটা তার মোটেই ভাল লাগিতে ছিল না। তাই সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ দূরে সরাইয়া দিয়া সে জোর করিয়াই যেন অমরের সঙ্গে মিশিয়া পড়িল।

এ কথা সে কথার পরে অমর হঠাৎ বলিয়া উঠিল "নির্ম্মল তুমিও হয় ত আমাকে ঘৃণা কর, না?" অন্য সময় হইলে নির্ম্মল হয় ত সত্য কথাই বলিয়া বসিত। কিন্তু তাহার সরস গল্পে আজ তাহার অন্তরের ভার যেন অনেকখানি নামিয়া গিয়া মনটা একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল তাই সে একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিল "না না অমর, ঘৃণা করবো কেন ভাই? তবে আমার অনুরোধ, তুমি এ পথটা ত্যাগ কর ভাই।" অমর কহিল "ঠিক্ ঠিক্ নির্ম্মল, সব কথা তোমাকে আমি আর একদিন বলবো।" একটুখানি থামিয়া সে আবার কহিল "আচ্ছা, আমার মনে হয়, তুমিও বেশ সুখী নও, ঠিক্ কিনা?" অমর ঠিক্ বেদনা স্থানেই আঘাত করিয়া নির্ম্মলের মুখের দিকে চাহিল। নির্ম্মলের মুখ যেন একবারে কালীবর্ণ হইয়া গিয়াছে। অমর তাহা লক্ষ করিয়া শান্ত কণ্ঠে কহিল "সে কথা বলতে যদি কোন বাধা থাকে ভাই, তবে বলে কাজ নাই! কিন্তু মনের দুঃখ চেপে রাখলে আরও অন্তরটা জ্বলে যায়, তা আমি নিজের ভাবেই বুঝতে পারি কিনা! আমাকে যদি বন্ধু বিবেচনা কর ভাই, তবে সব ঘটনাটা খুলে বল দিকি, দেখি কোন উপায় বলে দিতে পারি কিনা!" নির্ম্মল শুধু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অমর আপনা হইতেই আবার কহিল "আমি বেশী পিড়াপীড়ি করতে চাই না, ইচ্ছা হয় আর একদিন বলো। এই সতীশের বাড়ী; আসি তবে ভাই, আবার দেখা হবে।" "নিশ্চয়ই" বলিয়া নির্ম্মল নামিয়া পড়িল। সতীশ বাহিরেই বসিয়াছিল, কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কোথা গেছিলি রে? সাবধান ভাই ও লোকটা সুবিধার নয়। বড় মাতাল! নির্ম্মলের মুখ হইতে যেন আপনি বাহির হইল "তবু ত মদে ও সব ভুলে আছে,—সেও সুখ!"

সতীশ চমকিয়া উঠিয়া মনে মনে বলিল 'তবে কি রমলার সন্দেহটা ঠিক।' তাহাদের স্বামী স্ত্রীতে নির্ম্মলের মনের অবস্থা লইয়া অনেক কথা হইয়াছিল। রমলা নির্ম্মলের হাবভাবে বদনে নয়নে এমন একটা ঔদাসীন্যের ভাব আবিষ্কার করিয়াছিল যাহা হইতে কোনও

সন্দেহ হইয়াছিল যে নির্ম্মল কোন কারণে আশাহত, খুব সম্ভবতঃ তার স্ত্রীর ব্যবহারই তাহার মূলে।

সতীশ বমলার যুক্তি এতদিন গ্রাহ্য করে নাই, নির্ম্মল যদি প্রকৃতই অসুখী হইবে তবে তাহার বাল্য বন্ধুর নিকট গোপন করিবে কেন, এই ছিল তার যুক্তি। আজ নির্ম্মলের মন্তব্যে সে শিহরিয়া প্রশ্ন করিল 'বলিস্ কি রে এমন দুঃখ তোর মনে কি হতে পারে যার তুলনায় নিজকে পশুর মত ভুলে থাকাকেই বলছিস্ সুখ। কেন আর ভাই, বাল্য বন্ধুকে বঞ্চনা করছিস বল, কিসে তোকে এমন অসুখী করেছে! তোর দুঃখে দুঃখী হবার ভাগ্য আমার কি নাই নির্ম্মল!

এতদিন যে মর্ম্মন্তুদ কষ্ট সে হৃদয়ের নিভৃত গুহায় লুকাইয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহা এই স্নেহের আঁচে গলিয়া গিয়া সহস্রধারে তাহার দুই চক্ষু দিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সতীশ আর স্থির থাকিতে পারিল না—দুই হস্তে আবেগ ভরে নির্ম্মলের গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া বাষ্প গদগদ কণ্ঠে কহিল "নির্ম্মল তোর কি কষ্ট আমায় বল ভাই।" নির্ম্মল আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া, আজ সে এই প্রকৃত বন্ধুর কাছে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিল। সতীশ স্তব্ধভাবে সমস্ত শুনিয়া কহিল "এই কথা! কিন্তু পত্নীর শত দোষ মার্জ্জনা করবার কথা,—তোর মনে আছে ত! তা ছাড়া মেয়ে মানুষের বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না, তা জানিস্ ত! আর তুই আবাহনের মন্ত্র পাঠ না করেই একবারে বিসর্জ্জনের মন্ত্রটা পড়ে বসে আছিস যে, আশ্চর্য্য!" নির্ম্মল কোন কথা বলিল না। সতীশ আবার আপনা হইতেই কহিল "এই যে তুই বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছিস্, তাতে কি সে খুব সুখে আছে মনে করিস্? তা ছাড়া তুই তোর মা-র কথাটা একবারও ভেবে দেখিস নি,—কি বেইমান তুই রে।" এতক্ষণে নির্ম্মল মাথা তুলিয়া কথা কহিল—"সুখ দুঃখ ত কোনদিনই টের পেলুম না ভাই! মায়ের কথা! তাও ভেবে দেখেছি, কিন্তু দু'জনের এক বাড়ীতে থাকা অসম্ভব।" সতীশ কহিল "অসম্ভব আবার কিসের! ওই যে তোকে এক কথায় বলে দিলুম,—তারা মরবে তবু "ক" বলবে না, এমনি জাত!" নির্ম্মল অভিমানের স্বরে কহিল "তবে কি সমস্ত স্নেহ প্রীতি তার পায়ে ঢেলে দিয়ে শুধু অবহেলা নিতে হবে?" সতীশ কহিল "ওরে গাধা, হিঁদুর ঘরের স্ত্রী কখনও স্বামীর ভালবাসায় অবহেলা করে না।" নির্ম্মল কহিল "করেছে আর করে না।

সতীশ কহিল "নিশ্চয়ই না, ভাল তুই আর একবার চেষ্টা কোরে দেখ্, তারপর তোর যা ইচ্ছে করিস্।" নির্ম্মল কহিল "আমাকে তবে বাড়ী যেতে বল্‌ছ ?" "নিশ্চয়ই, এতদিন আমি জান্‌লে কি তোকে থাক্‌তে দিতুম—সেই দিনেই বিদেয় করতুম। কালই তোকে বাড়ী ফিরে শ্রীচরণে আশ্রয় নিতে হচ্ছে।"

বৈকালে সতীশ একখানা বই হাতে লইয়া পড়িতেছিল। নির্ম্মল খোলা জানালার পথে রাস্তার দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। এমন সময় অমরের মোটর আসিয়া সশব্দে দ্বারের কাছে থামিতেই নির্ম্মল মুখ ঘুরাইয়া লইল। বোধহয় মনে মনে একটু বিরক্তও হইয়াছিল। অমর নামিয়া আসিয়া কহিল "চল হে নির্ম্মল—" নির্ম্মলকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সতীশ কহিল "নির্ম্মল যাবে না ?" অমর বিদ্রূপের স্বরে একটু জোর করিয়াই কহিল "তুই থাম্ রাস্কেল, ওর মুখ আছে।" সতীশ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল "তা থাক্‌লেও আমি বল্‌ছি ও যাবে না। নিজে বয়ে গেছ—তাই যাও, আবার অন্যকে জড়াও কেন!" অমর রাগিয়া কহিল "অন্যের কথার উত্তর দেবার তোর কি অধিকার আছে শুনি ?" ক্রোধে নির্ম্মলের মুখখানা রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সে স্পষ্ট স্বরে কহিল "নিশ্চয়ই আছে! তুমি যেতে পার, আমি যাব না।" "আচ্ছা" বলিয়া অমর মুখখানা ভার করিয়া বাহির হইয়া যেতেই সতীশ কহিল "ছোঁড়া একেবারে জাহান্নামে গেছে।" নির্ম্মল একটুখানি ম্লান হাসিল মাত্র।

রমলা রাত্রে স্বামীর নিকট নির্ম্মলের সম্বন্ধে সমস্ত কথা শুনিয়া কহিল "আগেই ত বলেছি—যত বোকা বল,—মেয়ে মানুষের চোখ—ওটা বুঝতে ভোলে না, যখনি দেখেছি তখনি বুঝেছি—বুকে আগুন জল্‌ছে। পুড়ে পুড়ে সাচ্চা হয়ে থাকেন যদি পাঠিয়ে দাও—আর যদি অন্তরে বিষ আজও থাকে তার ফল জাহান্নম!"

সতীশ হাসিয়া বলিল "বেশ জহুরী ত! নির্ম্মলকে এটা বলতে হবে।" রমলা তাড়াতাড়ি স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিল, বলিল—"ছি ছি! না না আমার কথা কিছু বলো না এখন, উনি আমাদের ভাব বুঝবেন না।" সতীশ বলিল "বন্ধু আমর এমনি অযোগ্য—এত বড় কথা!" রমলা বলিল "নিশ্চয়। যে অভিমানে স্ত্রীকে এমন করে ফেলে আসতে পারে—তার আবার ভালবাসা ?" সতীশ হাসিয়া বলিল "সত্যই!"

(৪)

হরিশ মুখুজ্যের পৈত্রিক সম্পত্তি কিছুই ছিল না। বাবু সেরেস্তায় কার্য্য করিয়া কি কি করিয়া হরিশ মুখুজ্যে এই তাল-পুকুর গ্রামখানি হস্তগত করিয়া ছিলেন। জ্যেষ্ঠ সতীশ মুখুজ্যে বড় একটা কাজ কর্ম্মের ধার দিয়া যাইতেন না, ভ্রাতার এই সম্পত্তিটুকু নাড়া চাড়া করিয়াই তাঁহার দিন কাটিত। সাংসারিক সমস্ত কার্য্য, পৈত্রিক লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা, ইত্যাদি সমস্তই একা বড়গিন্নি সিদ্ধেশ্বরী দেবী দেখা শুনা করিতেন। তিনি নয় বৎসর বয়সে এই সংসারে প্রবেশ করিয়া ছিলেন, অল্প দিন পরেই বালিকা পুত্র বধূর হস্তে এই সমস্ত সংসারের ভার তুলিয়া দিয়া তাঁহার শাশুড়ী ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। সেই হইতে তিনিই এই বাড়ীর গৃহিনী। এই সংসারে খড় কুটোটি পর্যান্ত যেন সিদ্ধেশ্বরী দেবীর অস্থি মজ্জার সহিত চির পরিচিত হইয়া গাঁথা হইয়া গিয়াছে। মাঝখানে নির্ম্মলের মাতা অথিতিরূপে এই সংসারে আসিয়াছিলেন, এবং বড় জা সিদ্ধেশ্বরীর ক্রোড়ে নির্ম্মলকে দান করিয়া অল্পদিন মধ্যে ঠিক অথিতির মতই চলিয়া গিয়াছিলেন। তারপর সিদ্ধেশ্বরীর অনুরোধে পড়িয়া হরিশবাবু অন্নপূর্ণা দেবীকে তাঁহার সাহায্যার্থে আনিয়া দিয়াছিলেন। এবং বড়গিন্নি নির্ম্মলকে অন্নপূর্ণার কোলে বসাইয়া দিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—"দেখ্ ছোট, নির্ম্মল তোরই ছেলে। আর এইটুকু তুই কোনদিন ভুলিস নে যেন বোন্ যে এই ছেলের জন্যে হতভাগী তোকে নিয়ে আসা।"

তারপর কত সুখ দুঃখ, কত রকমের ঝড় ঝাপটা দুটি জা'এর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। তবু দুইটি হৃদয়ের বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই।

অন্নপূর্ণা দেবী এই মাতৃতুল্য বড় জায়ের কথা মত নির্ম্মলের সমস্ত ভার নিজের হস্তে তুলিয়া লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আদেশ ছাড়া কোন কাজ কখনও করিতেন না বা সেরূপ সাহসও তাঁহার ছিল না। তিনি বড়গিন্নিকে যেমন মায়ের মত ভক্তি করিতেন, তেমনি ভয়ও করিতেন! একটি বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া যেমন দুইটি লতা বাড়িয়া উঠে, তেমনি এই দুই মাতাকে আশ্রয় করিয়া, দুই মাতার এক সন্তান বাড়িয়া উঠিয়াছে। কুক্ষণে তিনি পিত্রালয়ে গিয়া এই প্রভাবতীকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, বলিতে পারি না, কিন্তু যেদিন হইতে তাহাকে বাড়ীতে পুত্র বধূরূপে আনিয়াছেন, সেইদিন হইতেই যেন এই তিনটি হৃদয়ের

বাঁধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িতে ছিল। তবু কিন্তু বধূর দোষ ত্রুটি তিনি মোটে খুঁজিয়া পান না।

আজ প্রায় একমাসেরও বেশী নির্ম্মল বাড়ী ছাড়া, এ পর্য্যন্ত একটা সংবাদ নাই। মায়ের মন যেমন ভীত সঙ্কুচিত হইতেছিল, তেমনি বাথিতও হইতেছিল। শূন্য বাড়ীখানা খাঁ খাঁ করিয়া যেন প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহাকে গিলিতে আসিতেছিল। তাহার উপরে বড়গিন্নির তীব্র বাক্য জ্বালা ক্রমেই তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিতে ছিল। পুত্রের উপরে একটু অভিমানও হইতে ছিল, "আমি কি তার কেহই নই ?"

সেদিন সারারাত্রি জাগরণে ক্লান্ত অবসন্ন শরীরটাকে কোন মতে বহিয়া আনিয়া কক্ষের বাহিরে আসিতেই, বড়গিন্নি কঠিন স্বরে বলিয়া উঠিলেন "আজ একমাস ছেলে বাড়ী ছাড়া, তোর মনের সাধপূর্ণ হলো ত ?" অন্নপূর্ণা কহিলেন "কিসের সাধ ? বেটার বিয়ে দিয়েছি— এই তো ? তারই ঘর দোর, এসে আপনার বুঝে নিক্, আমার আর এতজ্বালা সয় না বাপু। আমি কাশী চলে যাব।"

বড়গিন্নি রাগিয়া কহিলেন "তাই যা না দেখি, আমাকে কি ডর দেখাচ্ছিস্ না ? আমারও হাড় জুড়োক। বাবা চিরকাল এক মেয়ে নিয়ে আমার হাড় কালী হয়ে গেল। কথাটি বলবার জো নাই গা। বলি সাধ করে বৌ এনেছ ছেলেকে বনবাস দেবার জন্যে ?" অন্নপূর্ণার আর সহ্য হইল না, "বৌ আনলে যে, ছেলে বনবাসে যায় তা ত জানিনি দিদি ! তা বৌকে কি করতে বলছ ? যে করে পার শাস্তি দাও না তাই—আমাকে বলা কেন ?" বলিয়া তিনি সরিয়া গেলেন।

আজ কাল এরূপ ঘটনা প্রায় নিত্যই ঘটিত। প্রভাবতী সবই বুঝিত। কিন্তু সেই বড়গিন্নির এই স্পষ্ট উক্তিতে সে যেন মরমে মরিয়া যাইতে ছিল। তাহাকে লইয়াই যে, সংসারে অহরহ একটা অশান্তির ঝড় বহিয়া যাইতেছে, সে চলিয়া গেলে ত সে সব বিবাদ মিটিয়া যায় ভাবিয়া সে পিতা আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য পত্র লিখিয়া দিল। এবং শাশুড়ীর মতামত জানিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল।

অন্নপূর্ণা আপনার কক্ষে সমস্ত গুছাইতে ছিলেন। বধূ ধীরে ধীরে যাইয়া শাশুড়ীর কাছে যাইয়া বসিল। অন্নপূর্ণ মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বলছো বৌমা ?" বধূ একটু

ইতস্তত: করিয়া কহিল "মা, বাবা পত্র দিয়েছেন, আমাকে—" বাধা দিয়া অন্নপূর্ণা কহিলেন "তা আমাকে বলা কেন মা! তোমার বড়মাকে বল।" বধূ নড়িল না। অন্নপূর্ণা একটু হাসিয়া কহিলেন "পার্ব্বে না?" বধূ ঘাড় নাড়িয়া কহিল "না—সব, তুমি বল।" অন্নপূর্ণা কহিলেন "সে হয় না বৌমা, আমি আর তোমাদের কোন কথায় থাকবো না। তাতে মন্দ বই ভাল হবে না।" বধূ শাশুড়ীর কথা শুনিয়া বুঝিল—তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার নড়চড় হইবে না। অগত্যা সে উঠিয়া গেল।

বড়গিন্নি আহ্নিক সারিয়া, মালা লইয়া জপ করিতে ছিলেন। বধূ যাইয়া পায়ের কাছে বসিতেই, তিনি পা সরাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বলি নবাবের মেয়ে এখানে কেন গা?" বধূ এক নিঃশ্বাসে সব কথাগুলো বলিয়া ফেলিল। শুনিয়া বড়গিন্নি জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন "তা এখানে কেন! ছোটগিন্নির অনুমতি নেওয়া হয়েছে বুঝি?" বধূ কম্পিত কণ্ঠে কহিল "তিনি বল্লেন—আপনি যা বলবেন, তাই হবে।" "বাপ্‌রে কি বাধ্যতা গা?" স্বর একটু নরম করিয়া আবার কহিলেন "আমার কথায় কি আসে যায় বাছা, আমার শত্রুর মত হলেই হবে।" বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। বধূ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল।

রান্নাঘরের বারাণ্ডায় পদদ্বয় বিস্তার করিয়া বড়গিন্নি বসিয়াছিলেন। গিরিবালা আসিয়া কহিল "বড় মা, বেলা যে তিনটা বাজে, আর কতক্ষণ বোসে থাক্‌বে গা?" রাগিয়া বড়গিন্নি কহিলেন "আমার শত্রুকে ডেকে নে আয়, বল্ বড় মা বল্লে—তারঘাট হয়েছে এস।" গিরিবালা আবার কহিল "না গো তিনি খাবেন না।" বড়গিন্নি কহিলেন "ফের কথা কাটছিস্, যা বলছি।" গিরিবালা চলিয়া গেল। এবং একটুখানি পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল "বলছি ছোট মা আসবে না, তবু যদি বড় মা শুনবে।" বড়গিন্নি ক্রুদ্ধ হইয়া "বয়ে গেছে আমার। আমি হেঁসেল তুলে দে চলে যাচ্ছি। সবাই বোসে থাক্‌বে আমার যেন ভারি গরজ।" বলিয়া তিনি উঠিয়া রন্ধনগৃহের শিকলি টানিয়া দিয়া অন্নপূর্ণার ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন "বলি পায়ে ধরতে হবে কি! বাবা এত রাগ না? আমার ঘাট হয়েছে ছোটগিন্নি—এখন ওঠ, বৌটা এখনও মুখে জল দেয় নি, তা দেখ্‌তে পাস্‌নি?"

পরদিন নীলমণি চাটুজ্যে কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্নপূর্ণা কহিলেন "বৌমাকে পাঠিয়ে দিয়ে, আমিও কাশী যাব।" বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বড় গিন্নি কহিলেন "তা নইলে ষোলকলা পূর্ণ হবে কেন? ছেলেটা এসে দাঁড়াবে কোথায় শুনি?" একটুখানি হাসিয়া অন্নপূর্ণা কহিলেন "কেন তুমি ত আছ?" বড় গিন্নি জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন "তার আর ঠাট্টা কি? এমন দিন ছিল—যেদিন এই বুড়িই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আজও কি রাখ্‌তে পারবো না নাকি?" একটুখানি পরে আবার কহিলেন "কই যাক্ দেখি, কে এ বাড়ী থেকে বার হয় দেখি, বেড়িয়ে পা ভাঙ্গবো তবে আমার নাম সিধু বামণী।" ক্ষ্যান্ত হাসিয়া কহিল "এইবার সোজা কথা বলে দেছে বড় মা, দেখ গো ছোট মা, যদি সাহস থাকে বাপু।" গিরিবালা কহিল "বলি হাঁগা বড় মা,—পার্ব্বে ত গা?" বড় গিন্নি কি বলিতে যাইতেছিলেন অন্নপূর্ণা কহিলেন "গিরি, বাড়ীতে কুটুম্ব এসেছে তা মনে থাকে যেন।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

পরদিন শাশুড়ী এবং জ্যেষ্ঠ শাশুড়ীর পদধূলি মস্তকে তুলিয়া লইয়া প্রভা আর তাঁহাদের মুখের পানে চাহিতে পারিল না তাড়াতাড়ি যাইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। বড় গিন্নি ডাকিয়া বলিলেন "আবার শীগ্‌গীর এস বৌমা।" গাড়ীখানা দরজা ছাড়াইয়া চলিয়া যাইবামাত্র অন্নপূর্ণার হৃদয়ের ভিতর হইতে একটা বুক ভাঙ্গা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। টপ্ টপ্ করিয়া চোখের জলের বড় বড় ফোঁটা তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। বড় গিন্নি কহিলেন "মরণ—তোমার। বাড়ীর বৌ মার কাছে গেল, দুদিন পরে আবার আস্‌বে, তার কান্না কি লা?"

(৫)

পিত্রালয়ে আসিয়া মাতার অসীম স্নেহ যত্নের মধ্যে থাকিয়াও স্বীয় সংসারের দৃঢ় ও প্রশস্ত আশ্রয়ের অভাবে প্রভার হৃদয় যেন দিন দিন শুষ্ক হইয়া মুষড়াইয়া পড়িতেছিল। যে বিবাহের পর একসঙ্গে দশদিন পিত্রালয়ে বাস করে নাই তাহার তথায় বাস করা নিতান্ত অসম্ভব হইলেও আপনার বিদ্রোহী মনকে মায়ের স্নেহরাশির মধ্যে খাড়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু দিন দিন তাহার মনটা আপনা হইতেই ভাঙ্গিয়া নুইয়া পড়িতেছিল। তাহার ম্লান

মুখখানি দিন দিন ম্লান হইতে ম্লানতর হইতে দেখিয়া একদিন তাহার পিসিমা কহিলেন, "আমি তখনি বলেছিলুম যে "বৌ, ও ঘরে মেয়ে দিও না, হাজার হ'ক সৎ-শাশুড়ী ত।" মাতা বিরক্তা দেবী মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন, "না, ওঁর শাশুড়ী ত তেমন লোক নন্ ঠাকুরঝি, কি বলিস, রে প্রভা।" প্রভা একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "আমার শাশুড়ী ত আমাকে খুব ভালবাসেন, পিসিমা।" শোভা আপনা হইতেই "তবে নির্ম্মলের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি?" বলিয়া প্রভার মুখের পানে চাহিয়া মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। তাহার হাসির মধ্যে কি ছিল বলিতে পারি না, কিন্তু প্রভা ইহা শুনিয়া শীর পৃষ্ঠে শত চাবুকের আঘাত অনুভব করিল। সে ব্যথিত হৃদয়কে কোনরূপে দমন করিয়া তথা হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ঘন মেঘপুঞ্জ চতুর্দ্দিকে দৃঢ় হইয়া যেন সন্ধ্যার অন্ধকারটাকে আরও ঘনতর করিয়া তুলিল। প্রভা একটা নির্জ্জন কক্ষে যাইয়া শয্যায় শয়ন করিল। আজ শাশুড়ীর বিষয় পিসিমার মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র, তাঁহার সমস্ত হিতোপদেশ পূর্ণ বাক্যগুলি আবার নতুন করিয়া যেন তাহার অন্তরের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, যেখানে তাঁহার প্রকৃত দাবী, স্বামীর পদপ্রান্তে চির আকাঙ্ক্ষার সিংহাসন, অপরাধী কর্ম্মচারীর মত তাহা সে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া আজ যেন পরের দ্বারে আসিয়া মিথ্যা দাবী করিয়া ভিখারিণীর মত দাঁড়াইয়াছে। শাশুড়ী স্বহস্তে যে লক্ষ্মীর মুকুট মস্তকে তুলিয়া দিয়াছিলেন, সেই সৌভাগ্যবতী বধূর মহা গৌরবের পদ ধীরে ধীরে আজ যেন দূরে বহুদূরে সে ফেলিয়া আসিয়াছে। স্বামীর অবহেলা; এটা যে লোকের কাছে প্রকাশ করা কি ভয়ঙ্কর লজ্জাকর ব্যাপার তাহা আজ প্রথম প্রভা উপলব্ধি করিল।

লজ্জায় তাহার চোখে জল আসিল। শোভার সেই শ্লেষের হাসিটুকু আজ যেন তাহাকে বুঝাইয়া দিতেছিল, লজ্জা ধর্ম্ম, সুখ দুঃখের মহা আবরণ পতি পরিত্যক্তা নারীর স্থান জগতের কত নীচে। লোকের সম্মুখ হইতে নিজকে গোপন করিবার জন্য যখন প্রভার সমস্ত প্রাণটা আকুল হইয়া উঠিতেছিল, সেই সময়ে বধূ সরোজবালা আসিয়া তাহার শয্যার একপাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "সত্যি কি ঠাকুর ঝি, তুমি ঠাকুর জামায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছ? স্বামী দেবতা -তার সঙ্গে বুঝি আবার কারুর ঝগড়া হয়!"

এমনি করে আপনাকে লজ্জার শত আবরণ দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া প্রভার আরো কিছুদিন কাটিয়া গেল। আজ তাহার বড় ভগিনীপতি আসিয়াছে, পার্শ্বের কক্ষ হইতে তাহাকে খাওয়ানো দাওয়ানোর গল্প গুজবের অস্ফুট কলধ্বনি যতই ভাসিয়া আসিতেছিল, ততই যেন একটা কিসের অব্যক্ত লজ্জায় প্রভার সমস্ত হৃদয়টা পূর্ণ হইয়া যাইতেছিল। স্বামীর অবহেলা ত তাহার অঙ্গের আভরণ। তবে আজ আবার নূতন করিয়া সেই কথাটা ঘুরিয়া ফিরিয়া কাঁটার মত তাহার অন্তরে বিঁধিতেছে কেন? তার জন্য এমন করিয়া ত আর কোন দিন ব্যথা অনুভব করে নাই! সে বেদনাব্যথিত বক্ষে মাথার বালিসটাকে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া অসাড়ের মত বিছানায় পড়িয়াছিল। দ্বার ঠেলিয়া সরোজ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার মুখখানা দুই হস্তে জোর করিয়া তুলিয়া ধরিয়া কহিল—"ছিঃ ঠাকুর ঝি, তুমি কাঁদচো ভাই! নিজের দুর্ব্বলতা লোকের কাছে প্রকাশ কল্লে সবাই হাসবে যে।" এইটুকু স্নেহের আঁচে প্রভার হৃদয়ের ব্যথা যেন দ্বিগুণ হইয়া বহুদিনের রুদ্ধ অশ্রুরাশি গলিয়া যেন বন্যার মত ভাসাইয়া দিল। সরোজ তাহার হৃদয়ের ব্যথা আজ ভালরূপেই অনুভব করিল। সহানুভূতিতে তাহারও মন গলিয়া গেল। কতবড় ব্যথা যে সে নীরবে সহ্য করিতেছে, ভাবিয়া সরোজের প্রাণও যেন তাহার দুঃখে কাঁদিয়া উঠিল। শায়িত প্রভার উষ্ণ মস্তকে সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে সে মনে মনে ভাবিল "এই অনাদৃতা উপেক্ষিতা অভাগিনীর অন্তরে শান্তি দাও ভগবান! তাহার এ বেদনা যে, কাহারও কাছে জানাইবার নহে।" এমন সময়ে প্রভার ছোট বোন্ আসিয়া সংবাদ দিল "মেজদি, তোমার খাশুড়ী তত্ত্ব পাঠিয়েচে দেখ্‌বে এস।" বলিতে না বলিতে গিরি আসিয়া প্রণাম করিল। প্রভা একবার মাত্র তাহার মুখপানে চাহিয়া সব ভুলিয়া গেল, ছুটিয়া গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ছেলে মানুষের মত ফুঁপাইয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। গিরি অবাক্ হইয়া শুধু তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিল। একটুখানি পরে আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া প্রভা জিজ্ঞাসা করিল "মা বুঝি আমাকে নিতে পাঠিয়েছেন?" গিরির বিস্ময়ের ভাব কাটিয়া গেলে কহিল "তুমি ভুলে যাচ্ছ বৌ দিদিমণি—এটা যে চৈত্তির মাস! এই কটা দিন বাদেই তোমাকে নিয়ে যাব।" লজ্জিত হইয়া প্রভা কহিল "ওমা সত্যিই ত! কিন্তু ওমাসের প্রথমেই আমাকে নিয়ে যেতে বলিস্।" সরোজ হাসিয়া কহিল "আর তর স[illegible]? যাবে বই কি ভাই, সেই যে তোমার আপনার ঘর।"

প্রভা হাসিয়া গিরিকে কহিল "তুই আজই বাড়ী যাবি বুঝি ?" "হাঁ, মা বলে দেছেন—চিঠি লিখে দিও।" বলিয়া গিরি নীচে চলিয়া গেল। নীলা হাসিয়া কহিল "মেজদির যেন সব বাড়াবাড়ি, শ্বশুর বাড়ী যাবার জন্যে আবার চোখে জল দেখ !" সরোজ বিদ্রূপের স্বরে কহিল তুমিও একদিন কাঁদবে ভাই।" "দূর—বৌদি ভারি দুষ্টু।" বলিয়া সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

(৬)

প্রভার যাওয়ার পরে, শূন্য বাড়ীখানা যেন আরও খালি খাঁ খাঁ করিতেছিল। গিরিকে বধূর তত্ত্বে পাঠাইয়া সেদিন অন্নপূর্ণা শূন্য হৃদয়টা লইয়া অস্থিরভাবে কক্ষের পর কক্ষ ঘুরিয়া বহুদিনের পর স্বামীর পরিত্যক্ত ত্রিতলের ঘরখানা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া রুদ্ধদ্বারে স্বামীর শূন্য শয্যার পাদদেশে লুটাইয়া কাঁদিতেছিলেন। স্বামী আমার, দেবতা তুমি, অন্তর্যামী তুমি ! উপর হইতে সব দেখিতেছ, তোমার নির্দ্দেশিত স্থান হইতে দাসী এক চুলও স্থান ভ্রষ্টা হইয়াছে কিনা। আজ আমার কি অপরাধে সকলেই আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল ? তুমি, প্রভু, বিচারক আমার—তুমি যেন দাসীকে চরণচ্যুত করিও না।" "ছোট মা কোথা গা ? দাদাবাবু যে খুঁজে খুঁজে হায়রান হোল !" বলিয়া ক্ষান্ত তাঁকে খুঁজিতে ছিল অন্নপূর্ণা সসব্যস্তে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে রে ক্ষান্ত, কে এসেছে রে ?" ক্ষান্ত কহিল "আমাদের দাদা বাবুগো, আবার কে।" "নির্ম্মল, কই সে ?" বলিয়া তিনি উঠিতেছিলেন; সম্মুখে নির্ম্মলকে দেখিয়া আবার বসিয়া পড়িলেন। অভিমানাহত স্বরে কহিলেন "আসতে পারলে ত ? এইবার নিজের সংসার দেখে শুনে নাও বাছা, আমি আর পারিনে।" নির্ম্মল সব বুঝিল, একটুখানি হাসিয়া কহিল "বড্ড দেরী হয়ে গেছে, নয় ছোট মা ?" অন্নপূর্ণা কি বলিতে যাইতেছিলেন, সম্মুখে বড় গিন্নিকে আসিতে দেখিয়া চুপ করিলেন। বড় গিন্নি বিরক্তভাবে কহিলেন "এখানেও আবার ওই কথা ! কতদিন পরে ছেলে বাড়ী এল, খেতে দেতে দিবি কিনা ?" অন্নপূর্ণা কহিলেন "এখনও খাওয়া হয় নি, এ কাজটা কি তোমার এতই ভারী লাগে দিদি ? চল্ রে নির্ম্মল।"

বড়গিন্নি কহিলেন "ওই দেখ, উল্টো ছাঁদে গেয়ো ! ছেলে কিছুতে খেলে না,—আর ভারি লাগলো আমার ! দেখ্‌লি ক্ষ্যান্ত ওর কথা শুনলি ?" "তাই ভাল করে বোঝাও ক্ষ্যান্তকে। আয় রে নির্ম্মল।" বলিয়া তিনি নির্ম্মকে লইয়া নীচে নামিয়া গেলে।

এবারে বাড়ী আসিয়া নির্ম্মলের কেমন সব যেন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতেছিল, অথচ মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতেও পারিতে ছিল না। এমন অসময়ে প্রভার পিত্রালয়ে যাইবার কারণটা জানিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছিল, কতবার কথাটা তাহার ওষ্ঠাগ্রে আসিয়া আবার ফিরিয়া যাইতেছিল। পত্নীর সহিত তাহার তেমন ঘনিষ্টতা না থাকিলেও কেমন যেন সব বিশৃঙ্খল ঠেকিতেছিল। হাত বাড়াইবা মাত্র সমস্ত জিনিষগুলো পূর্ব্বের মত যেন আর হাতের কাছে পাওয়া যাইতেছে না, দেখিয়া মনে মনে একটু আশ্চর্য্যও হইতেছিল, কারণ। ঠিক্ বুঝিতে না পারিলেও একটা যে কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, তাহা সে নিঃসংশয়ের অনুভব করিতে পারিল। তবুও একটা চেঁচামেচি গণ্ডগোল বাধাইয়া যেটুকু সন্দেহ ছিল, তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

সেদিন দুই ঘণ্টা হাঙ্গামা করিয়া স্নানান্তে যখন নির্ম্মল আহারের স্থানে আসিয়া বসিল, মিশরজীর রান্না মুখে দিবাই তাহার পিত্তি শুদ্ধ জ্বলিয়া উঠিল। বড়গিন্নি মালাগাছটি হস্তে লইয়া নির্ম্মলে একটু দূরে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এত চেঁচামেচি করছিলি কেন রে নির্ম্মল ?" নির্ম্মল মুখখানাকে অপ্রসন্ন করিয়া কহিল "দেখ ত বড় মা,—কোন জিনিষ যদি ঠিক্ থাকে, তেল পাই ত গামছা পাই না, গামছা পাই ত তোয়ালে পাই না। তারপর মিশরজী যে রান্না শিখেচে মুখে ত দেবারই জো নাই।" বড়গিন্নি স্বরটা একটু কোমল করিয়া লইয়া কহিলেন "ছোটর আজকাল শরীর ভাল নাই, আমি একলা কতই আর দেখ্‌বো, বৌটা ছিল, সে ষ্টোভ জেলে তবু দু একখানা তরকারী রান্না করতো তা সেও নাই।" পরে ক্ষ্যান্তর দিকে ফিরিয়া কহিলেন "তুই ত আর সবগুছিয়ে দিতে পারিস্, তাও ত দিস্‌নে বাছা।" ক্ষ্যান্ত কহিল "আমি একলা আর কত করবো গা বড় মা, গিন্নিও বৌদির তত্ত্ব নিয়ে গেছে, তা ছাড়া ওসব কাজ বৌদিদি-মণি নিজেই করতো, আমাদের অভ্যেস নাই—মনেও থাকে না বাপু।" নির্ম্মলের সম্মুখে যে, একটু সন্দেহের কালোপর্দ্দা দুলিতেছিল, তাহা মুহূর্ত্তে সরিয়া গেল। কাহার সেবা নিরত দুইখানি হস্ত নিরন্তর অন্তরাল হইতে তাহারই

সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তাহার ক্ষুদ্র বৃহৎ অসুবিধাগুলি সর্ব্বদাই মোচন করিয়া দিত, তাহা বুঝিতে নির্ম্মলের দেরী হইল না। আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস তাহার অন্তর হইতে যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া তাহার অন্তর হাল্কা করিয়া দিল! কাহার প্রভায় সমস্ত আঁধার কাটিয়া গেল! কোথায় সে এস, এস!

পরদিন সকালে গিরি আসিয়া বড় গিন্নিকে প্রণাম করিতেই, বড় গিন্নি জিজ্ঞাসা করিলেন "গিরি এলি! বৌমা ভাল আছে ত?" গিরি কহিল "না বড় মা, বৌদির শরীর বেশ ভাল নাই। তাকে নিয়ে আসতে বলেছে। বাপের বাড়ী কি মেয়ে ভাল থাকে! "বড়গিন্নি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন—"বালাই, ষাট্ ষাট্, সে আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘরে ফিরে আসুক, সে নইলে কি ঘর মানায়।"

অন্নপূর্ণা বসিয়া দুইজনের কথা বার্ত্তা শুনিতেছিলেন, গিরি আসিয়া তাঁহার হস্তে প্রভার পত্রখানি প্রদান করিতেই তিনি ক্রন্দনের বেগ রোধ করিয়া উঠিয়া গেলেন। বড়গিন্নি কহিলেন "ছোট, বৌমাকে নিয়ে আয়। ছেলের কষ্ট হচ্চে।"

তারপর আরও কয়টা দিন কাটিয়া গেল। বৈশাখের প্রথমে বধূ আসিয়া আপনার স্থান অধিকার করিয়া বসিল। সে এবারে ইচ্ছা করিয়াই যেন নিজের স্থান একটু উপরে স্থাপিত করিল। তাহা দেখিয়া অন্নপূর্ণা অন্তরে অন্তরে প্রীত হইলেন। এতদিনের সাধ পূর্ণ কর ভগবান!

সূর্য্য তখন অস্ত যাইতেছিল। দূর চক্রবাল প্রান্তে নিবিড় কাল রেখা দৃষ্টির সীমা রুদ্ধ করিয়া দিতেছিল, ঠিক্ গাছের মাথার পাশ দিয়া একটা বৃহৎ সুবর্ণ গোলক যেন ধীরে ধীরে বনানি গর্ভে নামিয়া যাইতেছিল। উপরে একখানা মেঘ সোণালী রং মাখিয়া পশ্চিম আকাশ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। প্রভা ঘরের এদিক ওদিক ঘুরিয়া যে সকল জিনিষ বিশৃঙ্খল হইয়া ছিল, সেই জিনিষগুলিকে সুশৃঙ্খলার সহিত সাজাইয়া রাখিতে লাগিল। কাপড় জামা, তোয়ালে প্রভৃতি ভাঁজ করিয়া কাঠের আলনার উপর রাখিল, টেবিলের উপরে ধূলা জমিয়াছিল, ঝাড়ন দিয়া তাহা পরিষ্কার করিয়া দিল। ছবিগুলার পাশে মাকড়সার জাল

পড়িয়াছিল. একখনা চৌকীর উপরে উঠিয়া সেগুলা ঝাড়িয়া ফেলিল। আলমারীর নীচের রাশিকৃত ধূলা জমিয়াছিল, তাহা পরিস্কার করিতে গিয়া দেখিল আলমারীর কাঁচের উপরে কাহার ছায়া পড়িয়াছে, প্রভা চকিতে ফিরিয়া চাহিল দরজার পাশে নির্ম্মল দাঁড়াইয়া আছে। লজ্জায় তাহার মুখখানা রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল, নির্ম্মল ঘরে ঢুকিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিল, একটুখানি হাসিয়া কহিল "বাঘ নই খেয়ে ফেলবো না, পালাচ্ছ কোথা ?" আশ্চর্য্য হইয়া প্রভা সলজ্জ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চাহিল, তাঁহার মুখ চোখে যেন একটা প্রেমময় ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, স্বামীর এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া পরিপূর্ণ আনন্দে লজ্জায় নত হইয়া সে শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়খানি আজ আবার নূতন করিয়া স্বামীর চরণে নিবেদন করিয়া দিল। আজ আর সে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইবার চেষ্টা করিল না। নির্ম্মল তৃপ্তির আবেশে গভীর অনুরাগভরে তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার নত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া মিলন-চুম্বনে তাহার হৃদয়তল অমৃতে সিক্ত করিয়া দিল।

শ্রীশরদিন্দু সরকার।

শারদা।

—:o:—

এসেছ শারদা কমলা কমল-আসনা,
এসেছ লক্ষ্মী বিশ্ব মনের বাসনা।
পদ্মদলের মত মধুর সুরভি,
নবোন্মেষিত যৌবন-রূপ-গরবী !

শিশির-সিক্ত শষ্প-শ্যামলা ধরণী
তব আগমনে হয়েছে নিবিড় বরণী,
পেলব শেফালি জড়িত সাদায় স্বর্ণে
ফুটে ওঠে নিতি তোমার হাসির বর্ণে !

নীল অম্বর মেঘের বন্ধ টুটিয়া
নীলোৎপলের দল সম ওঠে ফুটিয়া,
বাতাসে সুবাস মাতালের মত অন্ধ
ঘুরে ফিরে আসে তোমার কোলের গন্ধ !

চিরবাঞ্ছিতা এস মা হৃদয় কমলা,
চিরবন্দিতা মধুর হাস্য অমলা !
যুগে যুগে কবি-চিত্ত-পদ্ম-বাসিনী,
মালতী মধুর কুন্দ শুভ্র হাসিনী !

মুক্তি সুখের হরষামৃত বণ্টি'
—নিশির শিশির মুক্তামালার কণ্ঠী !
কল হংসের শুভ্র পক্ষ-শয়না,
অশ্রু-মুক্ত মৃদুল হসিত নয়না !

রৌদ্রোজ্জ্বল স্বর্ণ আঁচল জড়িতা,
উষালোক সম পবিত্র সিত চরিতা,
চির আরাধিতা চির শান্তির সদনা ,
চির বরণীয়া বিশ্ব প্রাণের সাধনা !

জনমে জনমে যুগে যুগে লো কপালিনী,
বরষে বরষে নব সম্পদশালিনী !
এস মা শারদা, ললিত চরণ ভঙ্গে
বিশ্ব পদ্ম আসনে এস মা রঙ্গে !

জড়তা-জলদ বিদারি উঠ গো সবিতা,
শত-গীতে-গাওয়া-অনাদি-কালের-কবিতা
দৈন্য পীড়িত আতুর বিশ্ব রক্ষি'
লক্ষ-জীবন-হৃদয়-পদ্ম-লক্ষ্মী !

চরকার কথা ।

--:*:-

চরকার আন্দোলন আজ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র; কিন্তু ব্যবসা হিসাবে ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তেমন চেষ্টা বাংলাদেশের কোথাও দেখিতেছি না। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া যাহা দেখিয়াছি তাহাতে মনে হয় অনেকেই চরকাকে রাজনৈতিক আন্দোলনের সহায় স্বরূপ মনে করেন। কেহ কেহ আবার চরকাকে বস্ত্রোৎপাদনের একমাত্র উপায় মনে করেন। কিন্তু মিল উঠাইয়া যদি তাহার স্থানে কেবল চরকা ও তাঁত বসাইতে চান, অথবা রাজনৈতিক আন্দোলনে সাফল্য লাভের জন্য যদি সুদর্শনচক্রের মতো চরকা-চক্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহা হইলে এই আন্দোলন বৃথা হইবে। চরকাকে প্রধান-শিল্প রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা না করিয়া সহায়-শিল্প রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলে আমাদের উপকার হইবে। এই কৃষি-প্রধান দেশে কৃষক যখন কৃষিকাজ করিতে পারে না তখন ঘরে বসিয়া চরকায় সূতা কাটিলে তাহার নিজের সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও উপকার হয়। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থা দিন দিন যেরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে তাহাতে প্রত্যেক সংসারের পুরুষের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়া থাকা আর চলে না; মেয়েদের ঘরে বসিয়া অল্প পরিশ্রমে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিবার ব্যবস্থা করা দরকার। চরকা সেই হিসাবেও খুব উপকারে লাগিতে পারে। কিন্তু কেবল সূতা কাটিবার ব্যবস্থা হইলেই হইবে না। সেই সূতা বিক্রয়ের অথবা উহার বিনিময়ে কাপড় বুনাইয়া আনিবার ব্যবস্থা থাকাও প্রয়োজন।

অনেক গ্রামে দেখিয়াছি, অতি বৃদ্ধারাও নবোৎসাহে সূতা কাটিয়া জড় করিয়াছেন ; কিন্তু উহা কোথায় বিক্রয় হইতে পারে সেই সংবাদ তাঁহারা জানেন না। হাতেকাটা সূতা ও অল্প কিছু মজুরি দিলে কাপড় বুনাইয়া দিবে এমন তাঁতীও অনেক গ্রামে নাই। এই রকম অবস্থায় সূতা কাটিবার আগ্রহ কতদিন থাকিবে ? আবার অনেক গ্রামে শুনিতেছি, যে সকল তাঁতী এখনো তাঁত ছাড়িয়া হাল ধরে নাই তাহারা সুযোগ বুঝিয়া মজুরি বাড়াইয়া দিয়া 'দাও' মরিতেছে। এদিকে বাজার তো বিদেশী খদ্দরে বোঝাই হইয়া গেল !

প্রতিযোগিতার কথা অনেকেই ভুলিয়া যাইতেছেন। সস্তায় উপযুক্ত জিনিষ ক্রয় করাই মানুষের স্বভাব। হুজুগে পড়িয়া অথবা স্বদেশের প্রতি ভালবাসার টানে মানুষ কিছুদিন পর্য্যন্ত বেশী দামে দেশী জিনিষ কিনিতে পারে। কিন্তু আবেগে ভাঁটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেও দারিদ্র্যের পেচনে মানুষ আবার সস্তায় বিদেশী জিনিষও কিনিতে রাজী হয়। এখনো বিভিন্ন সহরের বাজার যাচাই করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে হাতেকাটা সূতা দ্বারা তাঁতে বুনা কাপড় অপেক্ষা ম্যাঞ্চেষ্টারের এবং জাপানের কাপড় ঢের সস্তায় বিকাইতেছে। এমন অবস্থায় আমাদের দেশের তিন ভাগ লোক, যাঁহাদের মোটা কাপড় পরিতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু যাঁহারা অর্থাভাবে সস্তায় জিনিষ কিনিতে বাধ্য হন, তাঁহাদের অভাব পূরণের জন্য সময় থাকিতে 'কোমর বাঁধিয়া' চেষ্টা দরকার নয় কি ? আমাদের দেশের যাঁহারা গরীব তাঁহারা রাজনীতি বুঝেন না, ধর্ম্ম বুঝেন না, তাঁহারা চান দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইয়া লজ্জা নিবারণ করিয়া কোনও মতে পৃথিবীতে টিঁকিয়া থাকিতে। আধ্যাত্মিক বা রাজনৈতিক সমস্যা তাঁহাদের মনে জাগিতে পারে না, কারণ মানুষের প্রাথমিক অভাবেই যে তাঁহারা জর্জ্জরিত। সমাধানের সময় এই সব লোকের কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। কারণ ইঁহারাই আমাদের দেশের তিন ভাগ লোক।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

কোজাগর।

—:০:—
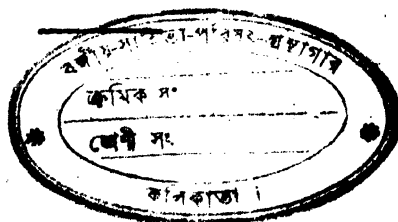
জোছনায় ফিন্ ফোটে পাখী গায় গান গো,
আজ ভোলা প্রিয়জনে বুকে ডেকে আন গো।
হেরি নিশি-গঙ্গায়,
কোন দূরে মন ধায়
আজ শুধু চাঁদ-মুখ চায় বুক প্রাণ গো।

২

আকাশেতে তারা জ্বলে ঘরে জ্বলে দীপ লো,
হৃদে আজ জ্বেলে রাখ না জ্বলে যা নিভলো।
অমৃতের মহাভোজ
হবে নাক রোজ রোজ,
হারাণোর কর খোঁজ হাত ধরে টান গো।

৩

ভাসে ডোবে ওই চাঁদ ওই করে মেঘলা,
আজকে লাগে না ভালো থাকতে যে একলা।
মনে পড়ে বারবার
সেই মুখ ভার ভার
আল্পনা আল্তার জলে ভাসমান গো।

৪

মরণের কোলে যারে করেছিস অর্পণ
স্মরণের সুধা দিযে কর তার তর্পণ।
বুকে আজ ধূপ দে
জাগা আজ সুপ্ত।
নীরবের গীতে আজ হক গীত সাঙ্গ।

———

শ্রী[illegible]